এস. মুজিবউল্লাহ

কাঁঠাল

বিতর্ক

এস, মুজিব উল্লাহ

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশনা ঃ শ্রাবণ ১৩৮৮, মোতাবেক
শাওয়াল, ১৪০১ হিঃ, আগষ্ট ১৯৮১ সাল।
বর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় প্রকাশকাল ঃ আষাঢ় ১৩৯০, মোতাবেক
রমজান, ১৪০৩ হিঃ, জুলাই, ১৯৮৩ ইং সাল।

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
সৈয়দ রহমতউল্লাহ্
৪২, র‍্যানকিন স্ট্রীট, ওয়ারী
ঢাকা-৩
বাংলাদেশ।

All rights reserved by the author permission for reproduction whole or Part should be addressed to the publisher.

Larger Second Edition July, 1983.

মুদ্রণে ঃ
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার
ঢাকা-১৭
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ : শেখ তোফাজ্জল হোসেন

মূল্য : বত্রিশ টাকা মাত্র
ডাক মাশুল আলাদা।
Price : U. S. $ 2·00 only
Postage Seperate

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। উপস্থাপনা—লেখকের কথা—
২। ভূমিকা—খন্দকার আব্দুল হামিদ— i
৩। আলোচনা—দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ— v
৪। বিতণ্ডাবাদ— ১
৫। হরতাল— ১০
৬। ওলট-পালট করে দে-মা-লুটেপুটে খাই ১৭
(রাষ্ট্রীয়করণে আর্ধসামাজিক চিত্র)—
৭। মুসলিম বিশ্বের অনৈক্য বনাম সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন— ৩০
৮। ঈশায়ী মুসলমান সমাচার— ৩৯
৯। ইসলামী সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি— ৪৬
১০। ওরা স্ববশে নাই (ইরান-ইরাক যুদ্ধ)— ৫২
১১। বাংলাদেশ-ভারত রেল চুক্তি— ৫৬
১২। শেরে বাংলার পুণর্মূল্যায়ন— ৫৯
১৩। হোটেল—ডি-পাপ্পা (আমাদের রাজনৈতিক দল)— ৬৫
১৪। ভারতীয় আগ্রাসন— ৭১
১৫। অখণ্ড ভারত— ৭৯
১৬। গৃহযুদ্ধের আগুন যদি লাগেই (জিয়াউর রহমান)— ৮৬
১৭। তরুণদের জন্য চিন্তা— ৯২
১৮। নারী সমাজ— ১০৮
১৯। আমদানী নীতি জাতীয় শিল্পের বিকাশের পরিপন্থী— ১১৬
২০। জাতীয় ঐক্য-পটভূমি (জিয়াউর রহমানের মৃত্যুতে)— ১২৬
২১। পরিশিষ্ট—১ (চিন্তাবিদ আবুল হাশিম)— ১৩৫
২২। আবুল হাশিম ও জীবন দর্শন— ১৩৭
২৩। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা ও সম্প্রসারণবাদী চক্রান্ত— ১৬০
২৪। রাষ্ট্রীয়করণের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি ও প্রশাসন (ব্যাঙ্ক)— ১৭০
২৫। শুধু অবাঞ্ছিতই নয় বিপজ্জনকও (ভারতীয় হাই কমিশনার)— ১৭৮
২৬। ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা— ১৮১
২৭। বাংলাদেশ-ভারত অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রশ্ন— ১৮৬, ২২১
২৮। হিংসা (চার স্তম্ভ)— ১৯৪
২৯। রবীন্দ্রনাথ ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ— ২০০
৩০। যৌথ সার্বভৌমত্ব ও সীমিত স্বাধীনতার তত্ত্ব ২০৪
(আফগানিস্তান প্রসঙ্গে)—
৩১। এ্যাকাউন্টিবিলিটি (পরলোক-বিলোপবাদ)— ২১১
৩২। বস্তুবাদী রাশিয়ায়—ভাববাদী রবীন্দ্রচর্চা— ২১৬
৩৩। 'বাংলাদেশ-ভারত অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রশ্ন' ১৯৩ পৃঃ পর ২২১
৩৪। কলাবরেটর (রবীন্দ্রনাথ, তৎকালীন মুক্তিযুদ্ধ ও ২২৮
হিন্দু-মুসলিম ভূমিকা)—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উপস্থাপনা ঃ

লেখা আমার পেশাও নয় নেশাও নয়—নিতান্ত দরকারে পড়েই কলম ধরতে হয়েছিল অনভ্যস্ত হাতে। মনের মধ্যে অনেক দিন ধরেই একটা ক্ষোভ জমে উঠছিল—জ্বালা ধরানো ক্ষোভ। দেশে পেশাদার আর নানা পেশায় নিযুক্ত এত অসংখ্য লেখক থাকতে আমার মনের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য এই আমাকেই অক্ষম হাতে কলম ধরতে হলো—এই জ্বালাটাই কি কম!

শাস্ত্রে বলে—আত্মনিন্দা আর আত্মস্তুতি ও পরনিন্দা আর পরস্তুতি সমান বর্জনীয়, অপরাধ। কিন্তু নিজের বইয়ের ভূমিকা নিজে লিখতে গিয়েই বুঝতে পারছি শাস্ত্র মেনে চলা কি কঠিন!

দেশের দণ্ড এবং মুণ্ডের কর্তাদের খেয়ালীপনার বিরুদ্ধে একটা কথা মাত্র উচ্চারণ করলে প্রাকৃতজনের ধড় এবং মুণ্ড যখন দু'ভাগ হয়ে যাবার আশংকা, তখনও সত্যি কথা বলার মতো দুঃসাহস কেউ কেউ দেখিয়ে বসেন বৈকি। প্রখ্যাত ধনবিজ্ঞানী মরহুম ডঃ মাহবুবুল হক কাগজে কলমে হিসেব কষে একদিন দেখিয়ে দিলেন এভাবে চললে দেশ অচিরে রসাতলে যাবে! বস্তুতঃ যাচ্ছিলও তাই। দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অগ্রপশ্চাৎ কোন রকম বিবেচনা না করেই সমাজতান্ত্রিক নামের এক কিম্ভূৎকিমাকার অর্থনীতি কায়েম করার বায়না ধরেছিলেন কর্তারা। সমাজতন্ত্রের নিজস্ব দর্শন অনুসারেই সেটা ছিল অসম্ভব। কথিত সমাজতন্ত্রের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে তারা গ্রহণ করেছিলেন রাষ্ট্রীয়করণের নীতি। কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা ও বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসা সব রাতারাতি রাষ্ট্রীয়করণ করা হল এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক হিসেবে বসিয়ে দেয়া হল কারখানা বা ব্যবসায় পরিচালনের ব্যাপারে কোন রকম পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এমন সব পার্টি-কর্মী ও নেতাদের। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর দেশটাকে তারা যথার্থই ভেবে নিয়েছিলেন লুটের মাল। বাংলাদেশ কায়েম হবার পর কয়েকটা বছর না যেতেই দেখা গেল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে। তথাকথিত সমাজতন্ত্র কায়েমের পরিবর্তে দেশে কায়েম হয়েছে একেবারে নির্ভেজাল ফকির তন্ত্র।

এই ফকিরতন্ত্র দেশের তাবৎ অধিবাসীকে মিসকিনে পরিণত করেনি তা বলাই বাহুল্য। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোকের "ওলট-পালট" তন্ত্রের মাধ্যমে

www.pathagar.com

ভাগ্য রাতারাতি এমনভাবেই ফিরে গেছে সমকালীন ইতিহাসে যার কোন দ্বিতীয় নজীর নেই। বাংলাদেশ হবার প্রাক্কালে দেশে যদি এক আধজন কোটি পতি থেকে থাকে কয়েক বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা শ'য়ের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার আশ্রয়ে লালিত এক শ্রেণীর লোকের যখন অতুলনীয় সমৃদ্ধি ঘটছে তখন দেশের সাধারণ মানুষের উঠেছে নাভিশ্বাস। সমাজের একাংশে সম্পদের পুঞ্জীভবণ ঘটছে অন্য অংশে বাড়ছে দারিদ্র্যের হাহাকার। সমাজে যখন এই অবস্থা বিরাজ করে তখন মানুষের সামাজিক মূল্যবোধগুলিও আর অক্ষত থাকে না। ন্যায়নীতি, সততা অন্যের প্রতি মমত্ববোধ প্রভৃতি মানবিক বৃত্তিসমূহের অপমৃত্যু ঘটে, সুকুমারবৃত্তি লোপ পায়, সেখানে দেখা দেয় জীঘাংসা এবং মেরে ধরে কত তাড়াতাড়ি ধনপতি হওয়া যায় তারই উন্মাদ প্রতিযোগিতা।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত একটি গরীব দেশ। লোক সংখ্যার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ খুবই কম। দেশের জনসাধারণের বিপুল অংশ নিরক্ষর। বাংলাদেশ হবার পর দেশের মধ্যবিত্ত অংশের কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটলেও পশ্চাৎপদ জনসাধারণের অবস্থা তুলনামূলকভাবে অনেক খারাপ হয়ে গেছে। ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ ছড়িয়ে দেবার স্লোগানে কর্তৃপক্ষ আরও সোচ্চার হয়েছেন কিন্তু যতদিন গেছে সুশিক্ষার সুযোগ ততই সংকুচিত হয়ে গেছে। বর্তমানে সঙ্গতিবানরা ছাড়া উচ্চশিক্ষার সুযোগ আর কেউ পাচ্ছে না।

অন্যসব অনুন্নত দেশের মত আমাদের দেশেও ছাত্ররাই সমাজের উল্লেখযোগ্য সচেতন অংশ এবং তারুণ্যের ধর্ম তারাই সব চেয়ে প্রতিবাদ মুখর। ঔপনিবেশিক আমল থেকে জাতীয় রাজনীতিতে এই ছাত্র সমাজ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু অধুনা দেখা যাচ্ছে জাতীয় রাজনীতিতে দেশের ছাত্র সমাজের পক্ষে আর কোন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার অবস্থা নেই। ছাত্র সমাজ আজ বহুধাবিভক্ত। দেশে রাজনৈতিক দল যতগুলি, ছাত্রদের সংগঠনের সংখ্যাও প্রায় তত। ফলে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র কিংবা জনসাধারণের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা বা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ছাত্র সমাজ এখন আর ঐক্যবদ্ধভাবে কোন আন্দোলন সংগঠিত করতে সক্ষম নয়।

দেশের সর্বাধিক সচেতন এই ছাত্র সমাজকে শুধু বহু দলে বিভক্তই করা হয় নি, ছাত্র সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ যাতে বিপর্যস্ত হয় তার জন্য চেষ্টারও বিরাম নেই। উন্নত ধনীদেশগুলির সঙ্গে নানা সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

চুক্তির অধীনে বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকা, (যার অধিকাংশ পর্নোগ্রাফী) এবং চোরাপথে আমদানী করা হচ্ছে পর্ণ ছবির ভি, সি, আর এর ক্যাসেট ও অসংখ্য ধরনের মাদক দ্রব্য। এতে করে আমাদের ছাত্র তথা যুব সমাজের যে নৈতিক অধঃপতন ও অবক্ষয় খুব ত্বরান্বিত হয়েছে আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকার পাতা খুললেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে খুব সুপরিকল্পিত-ভাবে একটা প্রবনতাকে লালন-পালন করা হয়; তাহলো ১৯৭১ সালের যুদ্ধে প্রতিবেশী দেশ ভারত বাংলাদেশের পক্ষ সমর্থন করেছিল (কিন্তু কার স্বার্থে করেছিল তা দেখার কারো আজ পর্যন্ত সময় হয়নি।) সুতরাং ভারতের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার কোন শেষ নেই। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা যদি কখনও স্বাধীন সার্বভৌম মর্যাদার স্থলে রাষ্ট্রীয় আনুগত্য দাবী করে বসে, গায়ের জোরে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা ঝুলিয়ে রেখে জাতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিতে চায় এবং তার প্রতিটা আচরণে যদি বুঝিয়ে দিতে থাকে যে তারা বৃহৎ শক্তিশালী দেশ এবং আমরা ক্ষুদ্র, অতএব শক্তিহীন তা কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ খুব ক্ষুদ্র দেশ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আকারে আর লোক সংখ্যায় ক্ষুদ্র হলেই কি একটা দেশের মর্যাদা ক্ষুদ্র হয়ে যায়?

ভারত এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক নয় তা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু ভারতের পক্ষ থেকে আমাদের কানে এই মন্ত্রটি অবিরাম জপিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে, দু'দেশের অর্থনীতি মোটেই প্রতিযোগী নয় পরিপূরক। কথাটা শুনতে আমাদের আপত্তি নেই—নীতির সীমা লংঘন না করলেই হয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের মধ্যেও এ কথা বলার অনেক দালাল জাতীয় লোক আছে, দেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবি ভারতের সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্খার মুখোশ উন্মোচন না করে যথাসাধ্য তাদের গা বাঁচিয়ে চলেন। ব্যাপারটা যত দুঃখজনকই হোক দুর্বোধ্য নয়!

বাংলাদেশের নানা উচ্চ পদে আসীন কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবীর বিশ্বাস দেশে রবীন্দ্র চর্চা যথোচিতভাবে হচ্ছে না বলে জাতি হিসেবে আমাদের আত্মোপলব্ধি বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে। এ বইয়ের একাধিক নিবন্ধে রবীন্দ্র কাব্য সাহিত্যের লোকায়ত সম্ভাবনা বিচার করে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি—আমাদের গুণীজনদের এ মতটি খুবই এক পেশে এবং জাতীয় পর্যায়ে বিপদজনক। আমাদের দেশে মূল্যবোধের নিদারুন বিপর্যয় ঘটেছে—ব্যাপক রবীন্দ্রচর্চার মাধ্যমে এর চিকিৎসা সম্ভব বলে অনেকে

www.pathagar.com

মনে করেন। আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি এই তত্ত্ব গান্ধিজীর 'হৃদয় পরিবর্তন' তত্ত্বের মতই নিষ্ফল আর ভ্রান্ত। মূল্যবোধের উৎস হলো—সমাজ—সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং এর সম্পর্ক।

আমাদের সমাজের অর্থনীতি একভাবে চলতে চলতে হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়েছে—সৃষ্টি হয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্তের। বাংলাদেশ নামের এই ভূখণ্ডটি যখন সাবেক পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল তখন এই অঞ্চলে পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজিপতিদের চাপের মধ্যেও ধীরে ধীরে পুঁজির বিকাশ হচ্ছিল। এদেশের শিল্পোদ্যোক্তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের শিল্পপণ্য বিক্রি করার অবস্থা থেকে আজ বিদেশী শিল্পপতিদের শিল্পপণ্য বিক্রির দালালে অধঃপতিত হয়েছে এবং দালালী লাভের জন্য তাদের নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ীর অন্ত নেই। স্বাধীনতার কী অনবদ্য পুরস্কার!

কথারম্ভে কেন লিখতে বসেছি তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলেছি, কেন বাঁচি তার যেমন কোন জবাব নেই তেমনই কেন লিখি তারও কোন জবাব নেই। সাধ্য নেই বলে সংকোচ যতই থাক কাউকে না কাউকে তো লোক ভয় কাটিয়ে বলতেই হবে যে, ৫৫ হাজার বর্গ মাইলের এই দেশটাকে ঘিরে দেশ-বিদেশের নানা চক্রান্তজাল বিস্তৃত হয়েছে এবং আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম অস্তিত্ব ও মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখতে হলে লড়তে হবে, লড়াই ছাড়া বাঁচার কোন বিকল্প নেই! কিন্তু লড়াই করবো কার বিরুদ্ধে? কাদের বিরুদ্ধে?

বলাই বাহুল্য যে, আমি আমার লেখার মধ্যে সেই শত্রুদেরকেই চেনবার ও চেনাবার চেষ্টা করেছি।

এই পুস্তকে বেশ কিছু ভুল ত্রুটি থেকে গেছে। এজন্য আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। তবে আমার তরফ থেকে কৈফিয়ত হিসেবে এটুকু বলতে চাই যে, কোন ভুলই ইচ্ছাকৃত নয়। সুতরাং আপনাদের সহৃদয়তা এবং সহানুভূতি থেকে আমি বঞ্চিত হবো না—এ বিশ্বাস আমার আছে। সব শেষে পাণ্ডুলিপি ছাপা এবং প্রকাশনার কাজে যাঁরা সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্য রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

—লেখক

www.pathagar.com

ভূমিকা

জুলাই (৮১)-এর শেষ দিকে আমি যখন অত্যন্ত অসুস্থ তখন একদিন বন্ধুবর মুজিবুল্লা সাহেব ও প্রখ্যাত কলামনিষ্ট স্নেহাস্পদ আখতার-উল আলম (লুধক) আমাকে দেখতে আসেন। কথায় কথায় তাঁরা আমাকে জনাব মুজিবুল্লার লেখা "বিতণ্ডা" নামক এই বই-য়ের ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেন। আজকাল আমি বড় একটা লিখি না ; আদৌ কিছু লিখতে হলে ডিক্টেশন দেই। সাংঘাতিক ধরণের সাম্প্রতিক অসুস্থতার পর বসে বসে আমার লেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। তবু একটু ভাল হয়ে উঠে এই বইটির পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করলাম। শারীরিক অসুস্থতার কারণে যদিও পড়তে গেলে চোখে কষ্ট হয় তবু বইয়ের বিষয়বস্তুগুলো এবং বক্তব্যের স্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থহীনতা আমাকে আকর্ষন করে নিয়ে গেল শেষ অবধি।

লেখকের বক্তব্য ও মতবাদের সব কিছুর সঙ্গে ভূমিকা-লেখকের ষোলআনা একমত হতেই হবে, এর কোন মানে নেই। বইয়ের বক্তব্য ও মতবাদ একান্তই লেখকের। তবু আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি, এই বইয়ের বক্তব্য ও মতবাদের অনেক কিছুই আমারও কথা। যেমন, কয়েক বছর আগে একটি কাগজে "এলো মেলো করে দে মা লুটে-পুটে খাই" শিরোনামে আমিও একটি লেখা লিখেছিলাম। এই বইয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তার সঙ্গে এক শ্রেণীর 'বিদগ্ধ' ব্যক্তি একমত হতে না পারেন, কিন্তু এগুলো সর্বসাধারণের মনের কথা। বৈদেশিক সাংস্কৃতিক আধিপত্য-বাদ ও আগ্রাসনের শিকার আজকাল অনেক জাতিই। আমরাও ব্যতিক্রম নই। লেখক এ বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এ বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, ফিজিক্যাল এ্যাগ্রেশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে কালচারাল এ্যাগ্রেশন, আর এই এ্যাগ্রেশন বাইরে

www.pathagar.com

থেকে ভেতরকার সেবাদাসদের মাধ্যমে চালানো হয় অতি সংগোপনে, সূক্ষ্মভাবে, দীর্ঘদিন ধরে। তার পর সেই পথ ধরে এগিয়ে আসে ফিজিক্যাল এ্যাগ্রেশন। কাজেই প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের এ বিষয়ে প্রতি-মুহূর্তে হুশিয়ার থাকা দরকার।—'দি প্রাইস অব ফ্রিডম ইজ ইটারনাল ভিজিল্যান্স'। আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, যে দেশের জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে মুসলিম সে দেশের শুধু সাংস্কৃতিক অঙ্গন কেন, জাতীয় জীবনের সব কিছুতেই ইসলামী চিন্তা ও ভাব-ধারার প্রভাব থাকবেই। আর তাই আমাদের শাসনতন্ত্রের মৌলিক আদর্শের গোড়াতেই "আল্লাহর ওপর পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস" (মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাংবিধানিক সংশোধনীর দওলতে) স্থান পেয়েছে। এটা নিশ্চয় টিকে থাকবে। এটা মুছে দেবার ক্ষমতা কারো নেই। তবে শুধু সংবিধানের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ না রেখে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব কিছুতেই এই মহান মৌল-আদর্শকে ক্রমে ক্রমে রূপায়িত করতে হবে। প্রতিটি সংকটে মুসলমানরা ইসলামকে নয় বরং ইসলামই মুসলমানদেরে রক্ষা করেছে। আমি অবশ্য ইসলামের নামে ফ্যানাটিসিজমের কথা বলছিনা, কারণ সাম্যের ধর্ম ইসলাম কোনরূপ ফ্যানাটিসিজম সমর্থন করে না। ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে দেশে বিদেশে এমন অনেক কিছুই চালানো হচ্ছে যা' ইসলামেরই সৌম্য সুন্দর চেহারা বিকৃত ও মসিলিপ্ত করছে। মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশের সফল ইসলামী বিপ্লবকে মাত্র বছর খানেকের মধ্যেই বিপন্ন করে তুলেছে এক শ্রেণীর কট্টর লোকের ফ্যানাটিসিজম, এটা তো আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি এবং দেখে মর্মাহত হচ্ছি। এই বইয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, বিশেষতঃ রাষ্ট্রায়াত্ব খাতের হাল-হকিকত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা, খাঁটি সত্য। 'ইনস্ট্যান্ট সোস্যালিজম' বলে কোন ক্যাপস্যুল নেই। ইংরেজীতে একটা কথা আছে: 'আইল্যাণ্ডস অব সোস্যালিজম আর নট পসিবল্ ইন দি ওশ্ন্স অব ক্যাপিটালিজম'। এই সত্যকে বেমালুম অস্বীকার করে রাতারাতি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অলীক ভাববাদী চিন্তায় মোহগ্রস্ত হয়ে সরকারী ডিক্রিবলে প্রায় সমস্ত শিল্প-কারখানা, এক কথায় জাতীয় অর্থনীতির বৃহত্তর অংশ রাষ্ট্রায়ত্ব করে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সাধন করা হয়েছিল প্রায় এক দশক আগে, তা' থেকে দেশ কবে মুক্তি পাবে, আল্লাহ মা'লুম। ১৯৭৪ -এর ১৭ই মার্চ 'বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির' সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ডঃ মাযহারুল হক (মরহুম) সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলে-

www.pathagar.com

ছিলেন, "আমরা প্রতিদিন তীব্রবেগে এগিয়ে চলেছি রসাতলে।..... দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ বিপর্যস্ত। এভাবে আর কিছু দিন চললে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে"। আসলে পাইকারী রাষ্ট্রীয়করণের দ্বারা যা করা হয়েছে তা সমাজতন্ত্র মোটেই নয় বরং একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ—যা সাধারণ পুঁজিবাদের চেয়েও অনেক বেশী শোষণ-মূলক। এর পেছনে থাকে শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক কায়েমীস্বার্থীরা—যাদের একেকজন বড়কর্তা হচ্ছেন বৃটিশ আমলের দেশীয় নৃপতিদের মতো। এই আমলাতান্ত্রিক একচেটিয়া পুঁজিবাদ উপরোক্ত 'সমাজতন্ত্র' কে 'ফকিরতন্ত্রে' পরিণত করেছে। এ বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, অনেক লেখালেখি হয়েছে। এই অর্থনৈতিক অবক্ষয় রোধের জন্য পরবর্তীকালে কিছু কিছু প্যাচ-ওয়ার্ক করা হয়ে থাকলেও যে বলিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত ছিল তা' করা হয়নি, বরং বিপুল ভর্তুকির হ্যালা বা ঠিকা দিয়ে এবং বার বার রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পপণ্যের মূল্য বাড়িয়ে আঁখ মাড়াইয়ের কেঁকড়িতে জনগণরূপী আখের রস নিংড়ে এই নিমজ্জ-মান স্টেট-ক্যাপিটালিজমকে খাড়া রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে। 'হিস্ট্রি হ্যাজ অলওয়েজ বিন্ এ গুড টিচার এ্যাণ্ড ইট পানিশেস ব্যাড স্টুডেন্টস'। কিন্তু দার্শনিক হেগেলের ভাষায়, 'ইতিহাসের বড় শিক্ষা এই যে, ইতিহাসের শিক্ষা কেউ গ্রহণ করে না'। এই বইয়ের লেখক এই অর্থনৈতিক অবক্ষয় সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে প্র্যাগমেটিক বা বাস্তববাদী নীতি অবলম্বন করতে বলেছেন। কিন্তু যাঁরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তাঁরা কি এসব কথা শুনবেন? ইতিহাস থেকে কি তাঁরা, সময় থাকতে, শিক্ষা গ্রহণ করবেন? এই যে গাধাও না, ঘোড়াও না—খচ্চর অর্থনীতি, এতে যে আর চলবে না, এটা কি তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করবেন?

'শেরে বাংলার পুনর্মূল্যায়ন' নিবন্ধে বলা হয়েছে, সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিশিয়ে হক সাহেবের জীবনের ঘটনাবলীকে বিকৃত করা হয়েছে, একেই বলে বুদ্ধিবৃত্তিক জোচ্চুরি'। এ বিষয়ে আমি কোন মতামত দেব না। তবে সত্যকে বিকৃত করা যেমন অন্যায় তেমনি ভক্তির আতিশয্যে তেল, ফুল, মালা, অর্চনার দ্বারা মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়ে যাঁর যা সত্যিসত্যি প্রাপ্য নয় তার উপর তাই আরোপ করে তাঁকে স্বাভাবিক সাইজের চেয়ে অনেক বেশী বড় করে তোলাও

www.pathagar.com

অন্যায়। সেটাও এক ধরণের বিকৃতি।

এর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। একথা অনস্বীকার্য সত্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (যাকে এক বিশেষ মহলের লোকেরা বিদ্রুপ করে বলতো "মক্কা ইউনিভার্সিটি") প্রতিষ্ঠার মূলে সবচেয়ে বেশী কার্যকর অবদান ছিল বিভাগপূর্ব সাবেক বাংলার গভর্ণরের অন্যতম এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর ধনবাড়ীর নওয়াব নওয়াব আলী চৌধুরীর (মরহুম)। অথচ পরবর্তীকালে ব্যক্তি বা দলের রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডার স্বপে এই সত্যটি চাপা পড়ে যায়। আসলে এই অকাট্য সত্যটিকে যেন ইচ্ছে করে চাপা দেওয়া হয়েছে। এটা শুধু সত্যের বিকৃতিসাধনই নয়, ইতিহাসের প্রতি গুরুতর অন্যায়ও বটে। ইতিহাস কোন অসত্য বা অন্যায় বরদাস্ত করে না।

যাহোক, জনাব মুজিবুল্লা যেসব বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন তাতে চিন্তার যথেষ্ট খোরাক রয়েছে। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি এবং, আশা করি, তাঁর চিন্তার ফসল দিয়ে তিনি জাতিকে আরও সমৃদ্ধিশালী করবেন।

"মালঞ্চ" — খোন্দকার আবদুল হামিদ
১৮-বি, ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা — (স্পষ্টভাষী)
১৫ই আগস্ট—১৯৮১

www.pathagar.com

আলোচনা

জনাব সৈয়দ মুজিবউল্লাহ প্রনীত 'বিতণ্ডা' একখানা অভিনব পুস্তক। এতে লেখকের এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সাম্প্রতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতি-নীতি, সমাজ জীবনে সে সবের প্রতিফলন এবং পরিনতি সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যে চিন্তা করেছেন, তাই স্পষ্টভাষায় এ পুস্তকে ব্যক্ত করেছেন। সমাজ জীবনের একটা বিশেষ ধাত এই যে, তা সবসময় সচেতন নয়। চলার পথে একদিকে স্বকীয় অন্তর্দৃষ্টির আলোকে, কখনও অপর কর্তৃক প্রদর্শিত আলোকে অগ্রসর হয়। যখন যে সমাজ হোঁচট খেতে আরম্ভ করে, তখনই সে সংবিত ফিরে পায় এবং আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এ পুস্তকের লেখক কোন ধারকরা আলোকের মাধ্যমে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ গ্রহণ করতে রাজি নন। তাই স্বাধীনভাবে সমাজ জীবনের নানাবিধ ভাব ও কর্মধারার আলোচনা করেছেন। তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল হওয়ায় এ বইটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য হয়েছে। উদ্দেশ্য মহৎ থাকায় ভাষা কোন কোন স্থলে ডাক্তারের অস্ত্রোপাচারের মত প্রতিভাত হলেও, তার সহানুভূতিশীল অন্তরের প্রকাশ বলে অবশ্যই সহনীয়।

বাংলা ভাষায় এ জাতীয় পদক্ষেপ সম্পূর্ণ অভিনব বলে লেখককে আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—মোহাম্মদ আজরফ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিতণ্ডাবাদ

আমেরিকার একটা লোক প্রবাদ হলো, যাকে পছন্দ কর না তাকে ভুলে যাও। প্রবাদটির ব্যবহারিক মূল্য অসামান্য তা অস্বীকার করা যায় না। যাকে পছন্দ করিনে তাকে ভুলে যেতে পারলে বা ভুলে থাকতে পারলে সব দিক দিয়ে ভালই হয়, অন্ততঃ মনের শান্তি বজায় থাকে কিন্তু অপছন্দনীয় সকলকে কি ভুলে থাকা যায়? সমাজে এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে উপর থেকে দেখলে তেমন ক্ষতিকর মনে হয় না। কিন্তু আসলে এদের ক্ষতিকর ভূমিকা অত্যন্ত গভীর আর সুদূরপ্রসারী। সমাজদেহের অভ্যন্তরে ক্ষয়রোগের মত সমাজকে এরা ভেতর থেকে কুরে-কুরে খায়, যে মূল্যবোধের উপর সমাজটা দাঁড়িয়ে আছে এরা সেটাকেই আঘাত করে ভেতর থেকে। কাজেই এদের সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকা কিংবা এদের ক্ষতিকর কার্যকলাপ অবাধে চালাতে দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। আমার মনে হয়, দেশের সচেতন ও বিবেকবান মানুষদের উচিত এই মহলকে অবিলম্বে চিহ্নিত করা।

বেশ কিছু দিন আগে এই রাজধানী শহর ঢাকাতে নাস্তিক্যবাদী-দের একাডেমী প্রতিষ্ঠার খবর শুনেছিলাম। শহরের একজন খ্যাত-নামা পণ্ডিত ব্যক্তির ঘরোয়া আড্ডাকে নাকি একাডেমী হিসেবে রূপদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এবং এও শুনেছিলাম, সেই আড্ডার অধ্যক্ষই নাকি হবেন সেই একাডেমীরও প্রিন্সিপ্যাল ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক। জানিনা, নাস্তিক্যবাদের সেই একাডেমী যথাথই গঠিত হয়েছিল কিনা, তবে নানা মুখে এরকম শুনেছি যে, খ্যাতনামা সেই প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের বৈঠকখানায় যে ঘরোয়া অড্ডাটি নিয়মিত বসে থাকে সেখানকার প্রধান ও মজাদার আলোচ্য বিষয় হলো প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা এবং তথাকথিত 'ঋণং কৃত্যা ঘৃত পিবেত' জাতীয় সস্তা চার্বাক মত প্রচার করা।

www.pathagar.com

ঐ আড্ডায় আমার জনৈক বন্ধুর যাতায়াত ছিল। মুখরোচক নানা আলোচনার আকর্ষণে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন। একটা তিক্ত ও মর্মপীড়াদায়ক ঘটনার পর থেকে তিনি সেই অড্ডায় যাওয়া-আসা ছেড়ে দিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছিল একটা নাম নিয়ে। কোন এক দিনের আড্ডার আলোচ্য বিষয় ছিল বাঙ্গালী মুসলমানের নাম। আড্ডায় উপস্থিত এক ভদ্রলোকের নাম ছিল আবুবকর ছিদ্দিকী। হয়তো বিষয়টা প্রিন্সিপালের গোচরে ছিল না। অন্যান্য দিন যেমন হয়ে থাকে সেদিনও নানা কথার তোড়ে প্রিন্সিপালের বাঙালী মুসলমানদের আরবী নামের অর্থ ও ব্যঞ্জনা ব্যাখ্যা করতে করতে "আবু বকর" এই নামটির অর্থ উদ্ধারে মেতে উঠলেন। আবুবকর শব্দের অর্থ বকনা বাছুরের পিতা। প্রিন্সিপালের মুখ থেকে কথাটা নির্গত হওয়া মাত্র আড্ডা প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লো। বকনা বাছুরের পিতা অর্থাৎ ষাঁড়! মানে ষণ্ড! কি আশ্চর্য, মানুষের নাম হলো কিনা ষণ্ড! আমার বন্ধুটি চিঁ চিঁ করে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলেন—পিতা অর্থে জন্মদাতা না হয়ে 'প্রতিপালকও' তো হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে তা দোষের কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু কথাটা পানি পেল না। প্রিন্সিপাল 'বাঙালী কুত্তার ইংরেজী নাম'—এমত তুলনা দিয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের আরবী-ফারসীর স্থলে বাংলা ভাষার নাম রাখার যৌক্তিকতা নিমিত্তক জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা শুরু করলেন। আড্ডায় যে ভদ্রলোকের নাম ছিল আবুবকর সিদ্দিকী, তিনি মুখ চুন করে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই বন্ধুটিও। তারা আর যাননি। তবে এ ধরনের আড্ডা সম্পর্কে আমার বন্ধুটির মন্তব্য হলো, যে প্রধান ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই ধরণের আড্ডা গড়ে ওঠে তার আকর্ষণ হয়ে থাকে যাদুকরী। কথাটা মিথ্যা নয়। এধরণের অভিজ্ঞতা আমার নিজেরও আছে। আমি জানি এ ধরণের লোকের মানুষ আকর্ষণ করার ক্ষমতা খুবই প্রবল হয়ে থাকে। তবে এও ঠিক যে, চলকপ্রদ কথার ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেলে এদের প্রতি আকর্ষণ একদম থাকে না। তত্রাচ এ ধরনের বিদ্বান লোকেরা (বিদ্যান না বলে বিদ্যা ব্যবসায়ী বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত) তাদের জীবৎ কালব্যাপী সমাজের অনিষ্টকর কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারেন।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য, আমাদের সমাজে এ ধরণের বাক্যবাগিস লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সাধারণতঃ এদের বাচনভঙ্গি হয় অত্যন্ত চমৎকার এবং তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে এরা বেশ খোঁজ-খবর রাখেন। অনুকূল পরিবেশ পেলে ঘন্টার পর ঘন্টা এরা আলাপ চালিয়ে যেতে পারেন। কাজেই সাধারণ বুদ্ধির কোন লোক একবার এদের সাহচর্যে এসে পড়লে আর সহজে এড়িয়ে যেতে পারেন না। পূর্বোক্ত প্রিন্সিপালের কথাই ধরা যাক, প্রতিটা সামাজিক অনুষ্ঠান ও লোকাচার সম্পর্কেই তিনিই অত্যন্ত উন্নাসিক ও কঠোর মতামত ব্যক্ত করে থাকেন এবং সব ব্যাপারেই এমন ভঙ্গি করেন যাতে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিত্ব একেবারে ধুলায় লুটিয়ে পড়ে। যতদূর জানি, আমাদের আলোচ্য প্রিন্সিপাল কোন একক স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তার মত হলো, (তাঁর ভাষায়) আল্লাহর বা ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই শুধু তাই নয়, আল্লাহর বা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন বাস্তব সম্ভাবনাও নেই। যদি কেউ স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দেখাতে আসমানী গ্রন্থের উল্লেখ করেন তখন প্রিন্সিপাল ঐ সব ধর্মাগ্রন্থসমূহের অপৌরুষেয় ভিত্তিকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসেন। যাই হোক স্রষ্টার অস্তিত্ব নস্যাৎ করতে তিনি কি ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করেন তা আমাদের বিস্তারিত জানা নেই। এ সম্পর্কে তিনি সাহস করে কোন গ্রন্থ রচনা করেননি। তবে আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকার করি যে, যে কোন লোকের যে কোন ধর্মে বা আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করার, আদৌ বিশ্বাস না করার কিংবা এক ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু এই ধর্মান্তর বা আদর্শান্তর গ্রহণ ব্যাপারটা প্রকাশ্য এবং সামাজিক-ভাবে হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। আমাদের আলোচ্য প্রিন্সি-পাল জন্ম গ্রহণ করেছেন মুসলমান পরিবারে এবং বসবাসও করছেন মুসলমান সমাজে অথচ মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে আঘাত করতে তিনি একটুও ইতস্ততঃ করেন না। তার একটা প্রিয় অভ্যাস হলো, যখন-তখন কারণে-অকারণে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর প্রতি ছিঃ ছিক্কার করা এবং সাধারণ মানুষের অনুভূতিতে আঘাত করা। আমাদের পরামর্শ হলো ভাল না লাগলে এ সমাজ ত্যাগ করুন,

www.pathagar.com

এ সমাজের সামাজিক সুবিধা গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন, কিন্তু যতদূর জানি সে রকম পাত্তর তিনি নন। এরা গাছেরটাও খাবেন তলারটাও কুড়াবেন।

আমরা জানি সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার সঙ্গে এদেশে এই প্রকার ধ্যান-ধারণার আমদানী হয়েছে যে, ধর্ম বিশ্বাস একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা মৌলিকভাবে এ বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা জানি, এটা অত্যন্ত নগ্ন সুবিধাবাদ। কারণ কমিউনিষ্ট সমাজেও ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় বলে স্বীকার করা হয় না। বরং এই ধরনের বক্তব্যকে তারা দক্ষিনপন্থী বিচ্যুতি বলে মনে করে এবং কঠোরভাবে সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের নাস্তিক্যবাদী ভদ্রলোকেরা ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তিগত ব্যাপার—এই মত অনুসরণ করে সমাজে পাশ্চাত্যের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ক্ষেত্র তৈরী করেন এবং জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের সম্ভাবনাকে বস্তুতঃ অসম্ভব করে তোলেন।

এই বার এই সম্প্রদায়ের বক্তব্য ও আচার-আচরণের ভিত্তিতে এদের স্বরূপ অন্বেষণের চেষ্টা করা যাক। আমরা জানি, পরম সত্ত্বার অস্তিত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে মতবাদ প্রচলিত আছে তাকে বলা হয় বস্তুবাদ।

বস্তুবাদ অনুসারে জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ বস্তু—কোন অপৌরুষের সত্ত্বার ইচ্ছা নয়। পক্ষান্তরে অস্তিত্ববাদীরা বিশ্বাস করেন, পরম স্বত্ত্বার ইচ্ছাই হলো জগৎকারণ। বলাবাহুল্য, এই মতবাদের বিতর্ক আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। আমরা জানি, বস্তুবাদী বা নাস্তিক্য-বাদীদের একটা সুদির্দিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য আছে; কিন্তু আমাদের দেশের এই নিছক ধর্মবিদ্বেষীদের কোন রাজনৈতিক বক্তব্য আছে বলে আমরা শুনিনি। তারা বিরুদ্ধমত খণ্ডন করার জন্য ভাসা ভাসা-ভাবে চেষ্টা করেন। আপাততঃতীক্ষ্ণ অনেক যুক্তিরও অবতারণা করেন কিন্তু বিশেষ কোন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন না। দার্শনিকভাবে এই সম্প্রদায়কে বলা চলে বিতণ্ডাবাদী। কারণ কোন সুনির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এরা তর্কে প্রবৃত্ত হয় না। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, দুটি মতবাদের দ্বন্দ্বে যে মতাদর্শটি সমাজ প্রগতির

www.pathagar.com

সহায়ক সেটিই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়। কাজেই মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের ফলাফলের ব্যাপারে আমাদের কোন স্পর্শকাতরতা নেই। আমাদের দেশের এই বিতণ্ডাবাদী সম্প্রদায় যদি সমাজ প্রগতির স্বার্থে কোন সুনির্দিষ্ট মতবাদ প্রচারের জন্য অনুরূপ তর্কে প্রবৃত্ত হতেন, আমাদের কোন আপত্তি থাকতো না; কিন্তু তারা উদ্দেশ্যহীন বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে এবং তর্কস্থলে যা-তা মন্তব্য প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মূল্যবোধের উপর আঘাত হানছেন, ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সমাজ।

একথা স্বতঃস্পষ্ট যে, আমাদের সমাজে এখন পর্যন্ত যে সব মানবিক মূল্যবোধ বিদ্যমান, তার ভিত্তি ঐকান্তিকভাবেই ধর্ম। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, অপরকে ঠকানো, ইত্যাকার সমুদয় নিষেধমূলক অনুশাসনই এসেছে ধর্ম থেকে এবং জীবে দয়া, মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে সহমর্মিতা, সৌভ্রাতৃত্ব, সবার উপরে মানুষ সত্য ইত্যাকার বোধাদির উৎসও ধর্ম অথচ বিকল্প কোন মূল্যবোধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে ধর্মের উপর আঘাত হেনে এই বিতণ্ডাবাদী সম্প্রদায় নিজেদেরকে মানববিদ্বেষী হিসাবেই চিহ্নিত করছেন। এই সম্প্রদায়ের জনৈক অধ্যাপকের কথা শোনা যায়, যিনি তার নিজের নামের শেষে বিশেষ সামাজিক আভিজাত্য জ্ঞাপক একটি শব্দ যোগ করে থাকেন। আজানের শব্দ শুনে ছাত্রীদের কেউ মাথায় কাপড় দিলে তিনি এমত উক্তি করেন যে, আল্লাহ কি তোমার ভাশুর যে·····ইত্যাদি। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর বিদ্বানরা যে সমাজের সাধারণ মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে কত অজ্ঞ, এ তারই প্রমাণ।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের উচুঁতলার সমাজের মধ্যে শিক্ষিত ও বিত্তমান শ্রেণীর ইদানিং মানবীয় মূল্য বোধের নিদারুণ বিপর্যয় ঘটেছে। দেশের শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বুর্জোয়া বিপ্লব এখনও হয়নি, অথচ বিশেষ আর্থসামাজিক সুবিধার দৌলতে শিল্পোন্নত বুর্জোয়া জীবনের সমুদয় সুখ এদের করায়ত্ত, ফলে, অতীতের যা কিছু ভাল সব কিছুকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এদের একটা প্রিয় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই এ সমাজের মেয়েদের কাছে লজ্জা শ্লীলতা ইত্যাদি ভীরুতারই নামান্তর। বয়োঃজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এদের কাছে অহেতুক এবং সমাজের বেশী ভাগ মানুষের আচরিত বিশ্বাসের উপরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এদের কাছে ছোট লোকী। এই সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

লোকেরা দৈহিক পরিশ্রমকে বিশেষ ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। কারণ এদের মতে শ্রমসাধ্য কাজ করলে ফিগার নষ্ট হয়ে যায়। অথচ ধর্ম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই শিক্ষা প্রচার করে যে, শ্রমার্জিত অন্ন ছাড়া অন্য সমুদয় পন্থায় অর্জিত অন্নগ্রহণ হারাম! কাজেই ধর্ম এদের এদের দু'চোখের বিষ। ধর্ম যেহেতু আরও এই শিক্ষা প্রচার করে যে, যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই, অথচ এই পরজীবি সম্প্রদায়ের ভোগের সুধাপাত্র অপচয়ের অনাচারের মধ্য দিয়েই পূর্ণ হয়ে উঠে। ফলে ধর্মাচরণ এবং তৎসক্রান্ত মূল্যবোধকে এরা ন্যাণ্টি না মনে করে পারে না। বলা বাহুল্য, এই পরজীবী সম্প্রদায়েরই দার্শনিক গুরু হলো পূর্বোক্ত বিতণ্ডাবাদী সম্প্রদায় অথবা বলা যায় ঐ বিতণ্ডাবাদী সম্প্রদায়ের দ্বায়িত্বহীন উক্তিসমূহ এই পরজীবি সম্প্রদায়েরই সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি মাত্র। এই সম্প্রদায় বৃহত্তর জনগণ থেকে কতটা বিচ্ছিন্ন তার আর একটা প্রমাণ পাওয়া যায়, এদের নাম গ্রহণ ও সংস্কারের রকমারি কার্যকলাপ দেখে। দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু উদ্ভট নাম ছাপা হতে দেখা যাচ্ছে ইদানিং। এসব নাম দেখে বুঝার উপায় নেই, এরা নির্ভেজাল মুসলমান না হিন্দু, বৌদ্ধ না খৃষ্টান। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। অনুপম হারুন, আরেফিন কাঞ্চন, অমল নাসির, ময়ূখ সামস্, শুভ রায়হান ইত্যাদি। এই নামগুলি ছদ্মনাম হলে বলবার কিছু ছিল না; কেননা লেখক-সাংবাদিকরা ছদ্মনামের আড়ালে থেকেও অনেক সময় কলম চালিয়ে থাকেন। কিন্তু উপরে যে সব ইংরেজী, বাংলা, আরবী, ফারসী শব্দের জগাখিচুড়ী বানিয়ে নাম রচনা করা হয়েছে এগুলো ছদ্ম নাম নয়। বাপ-মার দেয়া নাম যথেষ্ট রকম আধুনিক তথা উদ্ভট নয় বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের নাম ঐ ভাবে সংস্কার করে নিয়েছেন। হয়ত অত্যাধুনিক কোন পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের নাম ঐ ভাবে রাখতেও পারেন। (অবশ্য সে সম্ভাবনা একান্ত কম)। আমরা জানি নাম একটা শব্দমাত্র যা দিয়ে বহুর মধ্য থেকে একজনকে বিশেষ ভাবে চেনা যায়। তবু নামকে মানুষ ভালোবাসে এবং সন্তানের নাম রাখার সময় প্রত্যেক পিতা-মাতাই যথাসাধ্য চিন্তা-ভাবনা ও যত্ন সহ-কারেই কাজটা সম্পন্ন করেন। এই নাম রাখার ব্যাপারটা একটা জন-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির অঙ্গও বটে! কিন্তু এইভাবে নাম সংস্কারের মধ্য যে, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এরা প্রকাশ করছেন তাতে কোন অবস্থাতেই

www.pathagar.com

কোন বিশেষ জাতি বা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সাংস্কৃতি হিসাবে একে আর আর চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কোন রকম প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করেই বলা যায়, ঐ সংস্কৃতি হলো নির্ভেজাল খচ্চর সংস্কৃতি এবং যারা এ সংস্কৃতির নির্মাতা ও পৃষ্ঠপোষক ধর্ম সম্পর্কে তাদের মনোভাব বিতণ্ডাবাদীদেরই অনুরূপ। অথবা বিতণ্ডাবাদী স্কুলেরই ছাত্র এরা! বলাবাহুল্য, এই নাম সংস্কারকারীদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সচ-রাচর তারা যে উত্তর দিয়ে থাকেন তাহলো এটা তাদের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য যে, নাম রাখা বা ইচ্ছামতো সংস্কার করা ব্যক্তিগত অভিরুচির ব্যাপার কিন্তু ব্যক্তির রুচি যদি সমাজের রুচিকে পীড়ণ করে তবে তাকে কি কোনভাবেই সমর্থ করা যায়? আসলে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণাকে অবজ্ঞা করে চলাটাই এরা প্রগতির লক্ষণ মনে করে। একথা স্বীকার করা সম্ভব নয় যে, বস্তুবাদকে জীবনাদর্শ হিসেবে যারা গ্রহণ করেছেন, তারা অবশ্যই বৃহত্তর জনগণের সাধারণ মূল্যবোধে আঘাত লাগে এমন কাজ তাদের রাজনৈতিক স্বার্থেই করবেন না। তা করতে গেলে রাজনৈতিক ভাবে তাদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হবে। পক্ষান্তরে, বস্তুবাদী নয় অথচ বস্তুবাদের আলখেল্লা পরে যারা বস্তুবাদীদের মত ভাবভঙ্গি করে তারাই এ ধরণের অসংযত কথাবার্তা বলে সাধারণ মানুষের মূল্যবোধে আঘাত করতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে এদেরকে বলতে হয় অধঃপতিত। এদের হাবভাবমাত্র দেখে বস্তুবাদীদের সাথে এদের দার্শনিক স্বজাতিত্ব অনুমান করা আমার মতে প্রচণ্ড ভুল। এই অধঃপতিত এবং দার্শনিক দিক দিয়ে ভয়ানক রকম সংশয়াচ্ছন্ন লোকগুলো বাস করে সমাজের পরগাছা হিসেবে। ঈশ্বর, আল্লাহ, ভগবান এদের কাছে একটা নিদারুণ তামাসার ব্যাপার। যে ব্যক্তি একক কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তার তামাসা করা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা কি শোভা পায়? মনে হয় এদের দার্শনিক জাতিত্ব বাস্তবাদীর পরিবর্তে সংশয়বাদী (এগনস্টিক) দের সঙ্গেই হওয়া সম্ভব। জানিনে আসলে এরা কি। তবে জনগণের সাধারণ মূল্যবোধের উপর এরা যেমন অবলীলায় আঘাত করতে পারে তাতে এক কথায় এদেরকে জঘন্য রকম গণবিরোধী লোক বলা ছাড়া উপায় নেই। ধর্ম ভিত্তিক নীতিবোধের বালাই নেই বলে (আইন বাচিয়ে)

www.pathagar.com

যে কোন নীতি বিগর্হিত কাজ করতে এরা ভয় পায় না। কথায় কথায় এই মহাশয়েরা হাতের তুড়ি মেরে পরলোক বিলোপ করে থাকেন। অথচ ইহলোকে মানুষের মহত্ত্বর সম্ভাবনাকে কার্যকরী করার প্রয়াস থেকে নিজেদেরকে এরা শত যোজন দূরে সরিয়ে রাখেন। অবিশ্বাসের গুহায় বসবাসকারী এই মহাশয়েরা যদি এখনও রসনা সংযত করেন তাহলে গণমানুষের পক্ষে একান্ত অপ্রিয় কাজগুলো আর করতে হয় না। আমরা সবাই জানি বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সমাজে এক সাংঘাতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজ নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করেন— তারা জানেন এই শূন্যতা অমূলক ছিল না। মূল্যবোধের একটা ভিত্তি ধ্বসে যাবার সংগে সংগে উন্নততর কোন মূল্যবোধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হলে এই শূন্যতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এক শ্রমসাধ্য রক্তক্ষয় যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর এদেশের তরুণ সমাজ যেমন ব্যাপক-ভাবে অধঃপতিত হয়েছিলো পৃথিবীর অন্য দেশে তার নজির নেই। বলাবাহুল্য, এটা আকাশ থেকে পড়া কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এরও কারণ সমাজের গর্ভেই নিহিত। একাত্তরের যুদ্ধের নয় মাসে কথিত আছে, এদেশের কয়েক লাখ তরুণ সহ প্রায় এক কোটি লোক ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতীয় সমাজে তখন বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্য ও তজ্জনিত দারিদ্র্য অত্যন্ত প্রকটভাবে বিরাজ করছিলো। পশ্চিমবঙ্গের তরুণদের একটা বিরাট অংশ কর্ম সংস্থানের অভাবে বেকার জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলো। এ রকম অবস্থায় যা হয়ে থাকে, বিপুল সংখ্যক তরুণ যুবক অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে হতাশায় মুহ্য-মান হয়ে শুরু করেছিলো নানা রকম অসামাজিক কাজকর্ম। চরম উচ্ছৃংখলতা সমাজ বিপ্লবের নামে বোমা বাজী ইত্যাদি ছিলো তাদের নিত্যকর্মের অন্তর্গত। এদের সংস্পর্শে আসে বাংলাদেশের জনগণের বিশেষ করে তরুণদের এক ব্যাপক অংশ। যুদ্ধের নয় মাসের চরম নিষ্ঠুরতার মধ্যে এরা স্বভাবতঃই দয়া মায়া স্নেহ প্রেম ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তি হারায়। তার উপর পশ্চিমবঙ্গের হতাশাগ্রস্থ তরুণদের সংস্পর্শে এসে বহু দিনের অর্জিত মূল্যবোধেও চিড় ধরে। বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে সাড়ম্বরে কায়েম করে লুটপাটতন্ত্র। ফলে তরুণদের মধ্যে হতাশা আরও

www.pathagar.com

বাড়ে। দেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে অন্যতম যে মূল নীতিটি গৃহীত হয়েছিল তা ছিল ধর্মহীনতারই নামান্তর। একেতো মা মনসা আবার তার উপর ধুনোর গন্ধ—মূল্যবোধ এমনতিতেই ভেঙ্গে পড়েছিলো, পরলোক, শেষ বিচার ইত্যাদি লোকবিশ্বাসগুলো কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানো হলো, আধুনিক বিদ্বানদের তথাকথিত প্রগতিশীল অংশ সংস্কার মুক্তির নামে প্রকাশ্যে পরলোকবিলোপবাদ প্রচার করতে লাগলেন। ফলে, যা হবার তাই হলো—আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে পরলোকের ভয়ও নেই কাজেই তখন ইহলোকের সুখের জন্য ব্যাঙ্ক লুট করতেই বা দোষ কি, পিস্তল দেখিয়ে হাইজাক করতেই বা বাধা কোথায়। সমাজের একাংশের এই অধপতনের জন্য আর্থ সামাজিক কারণগুলোর সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক দিক থেকে সংশয়াচ্ছন্ন বিতণ্ডাবাদীদের ভূমিকাও তাই কম উল্লেখযোগ্যে নয়। যদিও সে ভূমিকা মোটের উপর নেতিবাচকই।

বাংলাদেশে এই বিভ্রান্তিকর বিতণ্ডাবাদীদের কোন স্বীকৃত সম্প্রদায় না থাকলেও বিভিন্ন শিক্ষক, শিক্ষাবিধ, সাংবাদিক ও আমলা বুদ্ধিজীবি-দের ঘরোয়া আড্ডাকে কেন্দ্র করে এই বিতণ্ডাবাদীরা প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়া আছে। অন্যতম যে বৈশিষ্ট্যের জন্য এদের ধিক্কার দেয়া উচিত তা হলো, এরা কাজ করে না কেবল কথা বলে। বস্তুতঃ কথা বলাই এদের কাজ। মতবাদ আকারে যেসব বিষয়ে এরা অনুশীলন করে তাকে এরা গ্রন্থাকারে সূত্রবদ্ধ করতে চায় না, তার একমাত্র কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সে বিষয়টির উপরেই এদের বিশ্বাসের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। এই সম্প্রদায়ের একটা প্রধান প্রবণতা হলো কোন কিছুর গভীরে না যাওয়া, উপরে উপরে সমালোচনা করা এবং সে সমা-লোচনাও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সমালোচনার নীতি না মেনে গালাগালি আর ঠাট্টা তামাশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা। সামাজিক মূল্যবোধের বিপর্যয় দেখে এরা ব্যথিত হয় কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে সেই ব্যথিত হওয়া একটা শোচনীয় নাকি কান্না ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ যে ধর্মীয় শিক্ষাকে সামাজিক মূল্যবোধের বিপর্যয়ের নিমিত্ত বলে এরা প্রচার করে প্রকৃতপক্ষে তা যে ধর্মীয় শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য আর্থ সামাজিক কারণে বিপরীতে পর্যবসিত হবারই এক অনিবার্য পরিণাম—এই বাস্তব সত্যকে এরা বুঝতে পারে না। এই মুখরোচক বিতণ্ডাবদী সম্প্রদায় যত তাড়াতাড়ি তাদের সংশয়ের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে ততই সমাজের মঙ্গল। মঙ্গল যেমন সমাজের জন্য তেমনি তাদের নিজের জন্যও বটে।

www.pathagar.com

হরতাল

জনসভা, মিছিল, ঘেরাও প্রভৃতির মত ধর্মঘট বা বন্দ্ হলো রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপায়। ক্ষমতাসীন শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষমতা লাভেচ্ছু বিরোধীদল বা মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার বা দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য এই উপায়টি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। উপায়টি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু আন্দোলনের এই উপায়টির প্রান্তে আন্দোলনের আরেকটি রূপ আছে, যাকে বলা হয় হরতাল। এটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পর্যায়ে পড়লেও প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তিপূর্ণ ও জঙ্গী এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এর অবস্থান এবং প্রায়শঃ এটি শান্তিপূর্ণ অবস্থার প্রান্ত অতিক্রম করে যায় এবং প্রতিপক্ষের লাঠিচার্জ টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ বা গুলি চালনার মত ঘটনার সূচনা করে। একটি সফল হরতালের পর দেখা যায়, একাধিক প্রাণ, জাতীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের সম্পদের বিস্তর ক্ষতি-সাধিত হয়েছে। এই ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে সমাজ রাজনৈতিক চরিতার্থতার দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু ক্ষয়-ক্ষতির তুলনায় এর সাফল্য থাকে খুবই অকিঞ্চিতকর।

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের যুগে কাজের ঘন্টা কমানো এবং মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনের চরম পর্যায়গুলিতে ধর্মঘট বা বন্দ্ পালন করা হতো। এখনো হয়ে থাকে। কিন্তু যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে হরতালের জন্ম, সেই অস্থিতিশীলতা বা অস্থিরতা শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এখন তেমন নেই বললে চলে। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি যে সব দেশে পর্যুদস্ত হয়েছে, আন্দোলনের উপায় হিসাবে 'হরতাল' সেই সব দেশেই প্রধানতঃ সংগ্রামের পদ্ধতি হিসেবে অনুসৃত হয়ে থাকে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রান্তিক এই উপায়টি আমাদের মত অস্থিতিশীল দেশগুলিতে তাই ঘন ঘন অনুসৃত হতে দেখা যায়। আইনের শাসনের অভাবের সঙ্গে এই উপায়টির সম্পর্ক ওতপ্রোত।

আমাদের দেশে সাম্প্রতিক কালে সংঘটিত একটি হরতালের (৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০) কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখবো, এর উৎসে

www.pathagar.com

রয়েছে আইন শৃংখলার চরম অভাব। রাজশাহী জেলে কয়েদীদের মধ্যে বিশৃংখলা দমনের উদ্দেশ্যে গুলি নিক্ষেপ করা হয় এবং এরই পরিণতিতে আহুত হয় হরতাল। এই হরতালে বিস্তর সরকারী ও ব্যক্তিগত পর্য্যায়ের সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয়। সঙ্গে দুটি অমূল্য প্রাণও বিনষ্ট হয়। সরকারের পুলিশ প্রায় বিনা উস্কানিতে জেল খানায় গুলি চালনা করে প্রতিষ্ঠিত আইনের প্রতি চরম অমর্যাদা প্রদর্শনের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো তাই সঞ্চারিত হলো জনগণের মনে এবং পরিণামে আইন হাতে তুলে নেবার মত একাধিক ঘটনা ঘটলো বা এখনো ঘটছে। কাজেই আইন শৃংখলার প্রতি সরকারী অমর্যাদার পথ ধরেই আইন শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ার প্রসঙ্গ ঘটে। অর্থাৎ আইন শৃংখলাজনিত সামাজিক অস্থিরতা হরতালের মত প্রাণ ও সম্পদ সংহারী আন্দোলনের জন্ম দেয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই জাতীয় হরতাল উৎপাদন ক্ষেত্রে দারুণ বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে। একদিন বা এক বেলার উৎপাদন বন্ধের জন্য যে ক্ষতি হয়, তার পরিমাণ জাতীয় উৎপাদনের অনুপাতে তেমন ভয়ংকর কিছু না হলেও আইন শৃংখলাজনিত পরিস্থিতির অবনতি উৎপাদনক্ষেত্রে প্রায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এবং পুনশ্চ কাজের পরিবেশ ফিরে আসতে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া বিপর্যস্ত সামাজিক জীবন পুনর্বিন্যস্ত হতে যে অবাঞ্ছিত সময় ব্যয় হয়, তার ক্ষতিপূরণ হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এর অপব্যবহার

হরতালের ফলে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ের সম্পত্তি ও প্রাণ বিনষ্ট তো হয়ই, হরতালের ফলে সবচেয়ে বেশী বেশী ক্ষতি হয় শিক্ষাক্ষেত্রের। স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হয় এবং শিক্ষাঙ্গনের যে পবিত্রতা রক্ষিত না হলে শিক্ষাদান ও গ্রহণের প্রক্রিয়াটাই বস্তুতঃ বানচাল হয়ে যায়; তাই হয়ে পড়ে হুমকীর সম্মুখীন এবং বাস্তবক্ষেত্রে একবার শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা বিনষ্ট হলে তা ফিরে আসতে বহুদিন লেগে যায়।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের মত অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলিতে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা নষ্ট করা তথা শিক্ষাদান ও

www.pathagar.com

গ্রহণের পরিবেশ ভেঙ্গে দেবার বৈদেশিক চক্রান্তের জাল পাতা রয়েছে সর্বত্র এবং একটু অনুসন্ধান করলেই আমরা দেখবো যে, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বলতে গেলে বৈদেশিক ষড়যন্ত্রের এক একটি লীলাক্ষেত্র। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই চক্রান্তের জালে ধরা পড়েছে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র ছাড়াও অনেক খ্যাতনামা শিক্ষক-শিক্ষাবিদ। এটা জানা কথা যে, শিল্পোন্নত দেশগুলি চায় না অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক মেরুদণ্ড শক্ত হয়ে গড়ে উঠুক। ছাত্র সমাজকে বলা হয় জাতির মেরুদণ্ড। এই ছাত্র সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করতে পারলে সহজেই চক্রান্তকারীদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। এই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বিজাতীয় ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা চালানো হয়। সমাজের আইন শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারলে ছাত্র সমাজকে কব্জা করা হয় সহজ। দেশের তরুণরা অন্যায় ও দেশী-বিদেশী নানা প্রকার শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে শরিক হয়, কিন্তু প্রায়শঃ দেখা যায় এই প্রক্রিয়ায় অনুষঙ্গ হিসেবে তারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সচেতন বা অচেতনভাবে ছাত্র সমাজের এই বিভক্তির দ্বারা লাভবান হয় বিদেশী শোষকরাই। কারণ, ছাত্র সমাজ যেহেতু জনতার সবচেয়ে সচেতন অংশ, কাজেই ছাত্র সমাজকে নানা পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করতে পারলে লাভ হয় তাদেরই, যারা ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের জন্য জাল পেতে রেখেছে।

দেশের সক্রিয় রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, এ নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। তবে, যেহেতু উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর প্রধান অংশই ছাত্র। কাজেই দেশের ভালমন্দের ব্যাপারে দেশের ছাত্রসমাজ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক নিরাশক্ত বা নিস্পৃহ থাকতে পারে না। দেশের ভালমন্দ তাদের চেতনাকে দোলা দেবেই। ঠিক এই সুবিধাটাই গ্রহণ করে বিদেশী চক্রান্তকারীরা। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যখন হরতাল বা এই ধরনের আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে, তখন বিভক্ত ছাত্রসমাজে কেউ হরতালের বিপক্ষে কেউ স্বপক্ষে প্রমত্ত হয়ে ওঠে। খুনজখম রক্তারক্তিতে শিক্ষাঙ্গন কলুষিত হয়ে যায়। পরিণতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষায়তন

www.pathagar.com

বন্ধ হয়ে যায়, পরীক্ষা পিছিয়ে যায়, অভিভাবকদের আর্থিক ক্ষতির মাত্রা বাড়তে থাকে এবং সামগ্রিকভাবে ক্ষতি হয় জাতির।

দেশের সচেতন অভিভাবকরা হরতাল জাতীয় আন্দোলন থেকে শিক্ষায়তনগুলিকে মুক্ত রাখার অনেক আবেদন নিবেদন জানিয়েও কোন ফল পাননি। কারণ নীতিগতভাবে এর অপকারী প্রভাব সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন শাসকরা এবং ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের নিজ নিজ রাজনৈতিক স্বার্থেই শিক্ষায়তনগুলিকে হরতালের প্রভাবের আওতার বাইরে রাখতে পারেননি। আমাদের দেশের রাজনীতির ইতিহাসে এইটাই একটা সাধারণ এবং নিয়মিত ঘটনা। কিন্তু এর ফল কি হয়েছে? অভিভাবকদের আর্থিক ক্ষতি, ছাত্রদের জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট ইত্যাদিকে জাতীয় ক্ষতি হিসাবে বিবেচনা করলে, প্রশ্ন ওঠে এর বিপরীতে লাভটা কি হয়েছে?

এই প্রশ্নের সবচেয়ে প্রচলিত জবাব হলো ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিল বলেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়ে ছিল। বস্তুত: আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামে ছাত্র সমাজের অগ্রণী ভূমিকার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখেছি; কোন আন্দোলনের সময়েই ছাত্র সমাজ কখনো ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেনি, দ্বিধা, ত্রিধা বা বহুধা বিভক্ত হয়ে কেউ আন্দোলনের স্বপক্ষে, কেউ বিপক্ষে, কেউ তৃতীয় পক্ষে থেকে শক্তির ভারসাম্যে দোলায়িত হয়েছে, প্রাণ দেওয়া আর নেয়ার তাণ্ডবে হয়ে উঠেছে প্রমত্ত। সুতরাং সামগ্রিক কর্মকাণ্ড থেকে ছাত্র সমাজের এই ভূমিকাকে বাদ দিলে নেট্ ফলের যে কি হেরফের হতো তা মনে হয় না।

কিন্তু মূল প্রশ্নটা ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা না করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়. বরং আমাদের মত অনুন্নত দেশের শিক্ষায়তনগুলি যে বিদেশী আদিপত্যবাদী পরাশক্তিগুলির চক্রান্তের পীঠস্থান এবং এই সব চক্রান্তের জালে আবদ্ধ ছাত্র ও শিক্ষক-শিক্ষাবিদদেরকে এই চক্রান্ত জাল থেকে মুক্ত করার সমস্যা পর্যন্ত এই প্রশ্নটি বিস্তৃত। আমাদের দেশের অনেক প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি শিক্ষাঙ্গনে বিদেশী চক্রান্তের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এ রকম অভিযোগ রয়েছে যে, পশ্চিমা

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের অনুচর শুধুমাত্র এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেই রয়েছে তাই নয়, বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারের আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন দফতরে অনেক সম্মানিত ও ক্ষমতাশালী পদে অধিষ্ঠিত থেকে বিদেশী স্বার্থের তাবেদারী করে চলেছেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে বিদেশী তাবেদার থাকার কুফল অবশ্যই সুদূরপ্রসারী। তবে, শিক্ষাঙ্গনে এই পরিস্থিতির কুফল সবচেয়ে মারাত্মক। কেননা, ছাত্রসমাজের মধ্যে এই চেতনাকে অত্যন্ত কৌশলে তারা বিজাতীয় ভাবধার-য় আচ্ছন্ন করতে সক্ষম হয়, যার পরিণাম সহজেই অনুমেয়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কিছু সংখ্যক সম্মানিত অধ্যাপক আছেন, যারা সামাজিক গবেষণার নাম করে এই দেশের নানা উপাত্ত বিদেশীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। দেশের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনেক বিষয়ের উপর গবেষণা চালানো হয়, যার সমুদয় ব্যয়ই নির্বাহ হয় বিদেশী নানা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা। এইসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রায়শঃ বহুজাতিক কর্পোরেশনের আওতাধীন। এইসব গবেষণা প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়ে থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রসেসিং এর কাজ করা হয় এবং গবেষণা কর্মের পরিচালনায় থাকেন এক বা একাধিক অধ্যাপক। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গবেষক ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠানো হয়, এবং পুষ্টি জরীপ, বনজ সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহের ছদ্মাবরণে দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রসেস করে বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়া হয়। এমন কি বিদেশী কোম্পানীর 'রাজা' ও 'মায়া' বড়ীর বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যেও নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

হিন্দু পুরাণে কথিত আছে, দেবগুরু বৃহস্পতি অসুরদের নৈতিক অধঃপতন ঘটানোর জন্য অসুর সমাজে এক বিকৃত দর্শনের প্রচার করেন। সেই দর্শনের প্রভাবে পুরুষার্থ হিসেবে তারা ধর্ম ও মোক্ষের পরিবর্তে অর্থ ও কামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং পরিনামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমাদের ছাত্র সমাজের তেমনি বিজাতীয় ভাবধারার অনুপ্রবেশ এমন সুকৌশলে ঘটানো হচ্ছে যে, তাৎক্ষনিক লাভের লোভে প্রকৃত পুরুষার্থ ভুলে তারা শনৈঃ শনৈঃ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচেছ এবং

www.pathagar.com

পরিতাপের বিষয় হলো, দেশের অনেক অগ্রণী বিদ্বানও নগদ অর্থ, বিদেশ ভ্রমণ, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণা ও চাকুরীর সুযোগ ইত্যাদির বিনিময়ে এই মহাঅপকর্মে শরিক হচ্ছেন।

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাশ্রয়ী অনেক রাজনৈতিক নেতা রয়েছেন, যাঁরা অত্যন্ত সচেতনভাবে ছাত্র সমাজ তথা দেশের মেরুদণ্ডকে বিদেশী স্বার্থের অনুকূলে ভেঙ্গে দেবার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছেন। এঁরাই ছাত্রদের সমস্ত রকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশ গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করে ছাত্র-সমাজকে আগামী দিনের জাতীয় রাজনীতির আকাঙ্খিত সুস্থ ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অসুস্থ আবর্তে নিক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। তরুণ ছাত্র সমাজ যেহেতু যে কোন প্রকার অন্যায়ের প্রতি স্বভাবতঃ প্রতিবাদী হয়ে থাকে, কাজেই এই তরুণদের প্রতিবাদী মনমানসকে কায়েমী স্বার্থবাদীদের হীন স্বার্থের পক্ষে ব্যবহার করার চক্রান্ত চালানো হয়। আমাদের সমাজে এই চক্রান্তের গভীরতা ও ব্যাপ্তি এত বেশী এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে এত আলোচনা করা হয়েছে যে, এ সম্পর্কে বস্তুতঃ নতুন করে বলবার আর কিছুই নেই।

যাই হোক, বর্তমান আলোচনা শেষ করবার আগে হরতাল প্রসঙ্গে শেষ এই কথাটা বলা দরকার যে, অন্ততঃ শিক্ষাঙ্গনকে আইন প্রণয়ন করে হরতাল জাতীয় আন্দোলনের বাহিরে রাখা উচিত। কারণ, দেশী-বিদেশী যে চক্রান্ত আমাদের দেশের Intellectual Gap সৃষ্টি করতে চায় হরতাল এবং তৎসহ আনুসঙ্গিক তৎপরতা চালাতে দিলে তাদের হীন উদ্দেশ্যই সফল হবে এবং শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা স্থায়ীভাবে বিনষ্ট হবে,—পরিণামে শিক্ষাঙ্গনকে বিদেশী চক্রান্তের কবল থেকে আর কখনই মুক্ত করা যাবে না। আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলির তুলনায়ও খুবই নীচু। দেশের শিক্ষাঙ্গন সমূহে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাতে এমন দিন আসতে পারে, যখন আমাদের শিক্ষা

www.pathagar.com

ব্যবস্থার মূল কাঠামোই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এবং পরিণামে এমনও হতে পারে যে, প্রশাসন ও শিল্প ক্ষেত্রে সাধারণ টেকনিশিয়ানও বিদেশ থেকে আমদানী না করলে চলবে না। আমাদের মনে রাখা দরকার আমাদের শিক্ষ ঙ্গনে রাজনীতির নামে এই 'হরেক তাল' যারা আমদানী করছে, তাদের এ প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যেহেতু শুভ নয়, কাজেই জাতির সচেতন বিবেককে এই মুহূর্তেই এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার এবং এই বাবদে যতবেশী সময় নষ্ট হবে, জাতির জন্য তা ততই বেশী ক্ষতি বয়ে আনবে।

www.pathagar.com

'ওলট-পালট করে দে মা—লুটেপুটে খাই'

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) বস্ত্রকল ছিল মাত্র পাঁচটি। ঢাকা জেলায় চিত্তরঞ্জন কটন মিলস, লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস, ঢাকেশ্বরী কটন মিলস ও আদর্শ কটন মিলস এবং কুষ্টিয়া জেলায় মোহিনী মিলস। এ ছাড়া চারটি মাত্র ছিল চিনিকল। রাজশাহী জেলার গোপালপুরে উত্তরবঙ্গ সুগার মিলস, দিনাজপুর জেলায় মহিমাগঞ্জ সুগার মিলস ও সেতাবগঞ্জে ইস্ট বেঙ্গল সুগার মিলস, এবং কুষ্টিয়ার দর্শনায় কেরু কোম্পানী। সবেধন নীলমণি এই ক'টি মাত্র মিল ছাড়া এ অঞ্চলে কোন উল্লেখযোগ্য শিল্পকারখানা ছিল না। এদিকে যদিও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পাট উৎপাৎদনকারী অঞ্চল বলে বাংলাদেশের খ্যাতি ছিল, কিন্তু একটাও পাটকল ছিল না এ অঞ্চলে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত মোট ২৪ বছরে এ অঞ্চলে পাটকল স্থাপিত হয় ৭৬টি, বস্ত্রকল স্থাপিত হয় ৫৯টি এবং চিনিকলের সংখ্যা দাঁড়ায় আগের ৪টি সহ মোট ১৫টি। এ ছাড়া বহু ইস্পাত কারখানা, রাসায়নিক কারখানা, কাগজকল, ঔষধের কারখানা, চামড়া ও জুতার কারখানা স্থাপিত হয়। শিল্পায়নের এই ধারাকে মোটামুটিভাবে সন্তোজনক বলা চলে। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর এই ধারা আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং এই স্তব্ধতা এখনও চলছে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলে তৎকালীন শাসকদের সামনে একটা সমস্যা অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয়। সমস্যা হলো,—পরিত্যক্ত (বিশেষতঃ পাকিস্তানী) কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, বীমা ব্যবসায় প্রভৃতি কিভাবে পরিচালিত হবে। '৭১-এর পাক-ভারত যুদ্ধের শেষের দিকে পরিত্যক্ত মালিকরা আত্মরক্ষার জন্য কলকারখানা ও ব্যবসাপাতি ফেলে রেখে এ দেশ ত্যাগ করে বা করতে বাধ্য হয়। ফলে অনুপস্থিত মালিকদের ব্যবসাপাতি পরিচালনার জন্য নব্য শাসক-

www.pathagar.com

গোষ্ঠী গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয়করণের নীতি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নতুন শাসকরা ক্ষমতারোহণের পূর্বে ব্যাংক, বীমা ব্যবসায় ও কল-কারখানা ইত্যাদি কোনদিন জাতীয়করণ করা হবে এমন দাবী তোলেননি কিংবা তৎকালীন শাসক দলের ম্যানিফেস্টোতেও জাতীয়-করণের কোন কথা কোনদিন ছিল না। এমনকি '৭০-এর নির্বাচনেও তারা রাষ্ট্রীয়করণের প্রোগ্রাম ঘোষণা করেনি। তথাপি পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবেলা করার নামে তারা কল-কারখানা, ব্যাংক ও বীমা ব্যবসায় ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়করণ করার নীতি গ্রহণ করে। সংগে সংগে মুসলমান বাঙ্গালী মালিকদের কারখানাগুলিও এই নীতির আওতায় নিয়ে আসা হয়, বলা হয় এরা পাকিস্তানপন্থী।

পরবর্তী পরিস্থিতি দৃষ্টে একথা বলা আদৌ অযৌক্তিক হবে না যে, এই রাষ্ট্রীয়করণ যথার্থ অর্থে পার্টিকরণ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এতে দুটি কাজ একসঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল।

প্রথমতঃ ক্ষমতাসীন দল লুট-পাটের মাধ্যমে দলীয় তহবিল গঠন করতে সমর্থ হয় এবং ব্যক্তিগত পর্যায়েও দলীয় নেতারা প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ কল-কারখানাগুলি লোকসানের কারবারে পরিণত করে ও ভারতে বিভিন্ন কাঁচামাল বিশেষতঃ পাট রপ্তানির ব্যবস্থা (প্রকাশ্যে ও চোরাই পথে) পাকাপোক্ত করে। তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠী প্রথম যে পাঁচসালা পরিকল্পনাটি (১৯৭৩-৭৮) গ্রহণ করে, তাকে তারা অভিহিত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সোপান হিসেবে। আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো, তথাকথিত এই সমাজতান্ত্রিক সোপান বেয়ে জাতি ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে এগিয়ে গেছে না অধঃপাতের দিকে নেমে গেছে।

যা হোক ইতিপূর্বে এদেশের কোন কোন দল ও দলীয় নেতা দেশবাসীকে এই ধারণা দেবার চেষ্টা করতো যে, পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের দৌরাত্ম্যে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) এ অঞ্চলে পুঁজিগঠন সম্ভব নয়। কেননা, পূর্ব পাকিস্তানীদের ভাগ্যের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে আছে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজি। কথাটার সত্যটা কতটুকু, তা আওয়ামী-বাকশালীদের শাসনামলে এ

www.pathagar.com

দেশে পুঁজি গঠনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। মিথ্যা নয় যে, এ অঞ্চলের বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ, কাঁচামাল ও অপেক্ষাকৃত সস্তা শ্রমশক্তি পাকিস্তানী পুঁজিপাতিদের দৌলৎ বৃদ্ধিতে যতটা সহায়তা করেছিল সেই তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানী (বর্তমান বাংলাদেশী) ব্যবসায়ীদের পুঁজি গঠনে অতটা সহায়তা করেনি। তার জন্য অবশ্য বাংলাদেশের মুসলমান ব্যবসায়ীদের আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রথমদিকে না বোঝা, প্রাথমিক পুঁজির অভাব ইত্যাদি কম দায়ী ছিল না।

একথা সুবিদিত যে, মুসলিম ব্যবসায়ীদের পুঁজি গঠনের এক বিরাট সম্ভাবনা নিয়েই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল এবং আমরা দেখেছি প্রথম দিকে পশ্চিমা মুসলিম ব্যবসায়ীরা সামান্য কয়েক লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই বেশ ভাল অংকের পুঁজি গঠন করতে সক্ষম হয়। এদের সাহায্য করেছিল আমলা গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন ব্যাংক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতের টাটা আটপুরুষ ধরে নানা ধরনের ব্যবসা করে যে পরিমাণ পুঁজি গঠন করতে সক্ষম হয়েছে, পাকিস্তানী পুঁজিপাতিদের অনেকেই মাত্র এক পুরুষেই প্রায় টাটার সমান মূলধন গঠন করতে সমর্থ হয়। বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের ধারণা ছিল, পাকিস্তানী পুঁজিপাতিদের প্রতিযোগীতা না থাকলে অর্থাৎ বাংলাদেশ সৃষ্টি হলে তারাও অল্প-দিনের মধ্যেই আশানুরূপ মূল ধন গঠন করতে সক্ষম হবে। হয়ত তা হতেও পারত; কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল, বাংলাদেশের শাসক-গোষ্ঠীর ভুলনীতির দরুন বাংলাদেশে পুঁজি গড়ে তো উঠলোই না, অন্যপক্ষে কল-কারখানা আর খেত-খামারে সম্পদ যা সৃষ্টি হলো, তা পুঁজিতে রূপান্তরিত হবার পরিবর্তে কোন্ গহবরে যে তলিয়ে গেল তার হদিসই পাওয়া গেল না।

বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর দেশে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হলো, যাতে অভিজ্ঞ ও বুনিয়াদী ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার পরিবেশ রইল না, পক্ষান্তরে দেশে এমন এক অব্যবসায়ী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটলো যাদের ব্যবসা করার কোন অতীত অভিজ্ঞতা ছিল না। এক একটা ব্রীফকেস মাত্র সম্বল করে শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায় এই নব্য ভুঁইফোড় শ্রেণী দুই হাতে টাকা কামাতে লাগলো। কিন্তু সেই টাকা পুঁজিতে

www.pathagar.com

পরিণত হবার পরিবর্তে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে সহায়তা করলো সাংঘাতিকভাবে।

বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর দেশে যে পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে হিসাব করলে দেখা যাবে তার সামান্য অংশই পুঁজিতে পরিনত হয়েছে। পক্ষান্তরে সৃষ্ট সম্পদের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছে ক্ষুদ্র একটা শ্রেণীর ব্যক্তিগত ভোগে। ইউরোপে শিল্প বিকাশের যুগে যেমন দেখা গেছে—ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণী জাতীয় পুঁজি গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে; বাংলাদেশে এই নব্য ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে সেই ভূমিকার লেশমাত্র দেখা যায়নি। বরং কল-কারখানা, ব্যাংক-বীমা প্রভৃতি জাতীয়করণের মাধ্যমে সমাজ নির্মাণের যে স্লোগান চালু হয়েছিল, সময়ে দেখা গেল, সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে দেশে কায়েম হয়েছে লুটপাটতন্ত্র, যে তন্ত্রের একটা মাত্রই মূলনীতি,—"ওলট-পালট করে দে মা—লুটেপুটে খাই"। এই লুটে নেবার মূলমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণকারী বিপুল সংখ্যক অব্যবসায়ী শ্রেণী দেশের লাভজনক শিল্পগুলোকে অলাভ-জনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে এবং দেখা যায়, জনগণের টাকায় গড়ে উঠা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সমূহ কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েও শিল্পগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না।

এইবার নীতিগতভাবে আমরা একটা মূল প্রশ্নের সমাধান করে নিতে চাই। 'রাষ্ট্রীয়করণ মানেই কি সমাজতন্ত্র?' সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যার প্রাথমিক ধারণা আছে তিনিই স্বীকার করবেন যে, রাষ্ট্রীয়করণ মানেই সমাজতন্ত্র নয়। এ বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক দর্শনের প্রবক্তা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিনের এত দ্ব্যর্থহীন উক্তি রয়েছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই তাকে সমাজতন্ত্র ভাববার কোন অবকাশ নেই। আমরা জানি, এ দেশীয় জনগণকে ভাওতা দেবার জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মানের সস্তা স্লোগান দিয়ে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী ও ক্ষমতার আশ্রয়ে লালিত ও পুষ্ট কিছু ভুঁইফোড়ের দল রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ব্যবসার প্রশাসক-পরিচালক বনে যায়। কিন্তু প্রশাসক-পরিচালক হয়ে তারা কি করে? মা তো ওলট-পালট করে দিল আর তারা শুরু করল লুটপাট। খুব সামান্য দুই একটা ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকটা শিল্প-কারখানায় ঘটল ব্যাপক উৎপাদন হ্রাস। বাংলাদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই উৎপাদন হ্রাসের

www.pathagar.com

নেপথ্য কাহিনী খুব সীমাবদ্ধ সুযোগের মধ্যেও (প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনের কালাকানুন বাঁচিয়ে) এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় যে, এ সংক্রান্ত কোন তথ্যই আর জনসাধারণের অগোচর রইল না। (এবারেও জুট সেক্টর ৯০ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে ঃ ইত্তেফাক) শাসক গোষ্ঠীর তরফ থেকে উৎপাদন হ্রাসের যে সব অজুহাত তোলা হতো তার মধ্যে প্রধান হলো—নয় মাসের যুদ্ধ ও তজ্জনিত ধ্বংস। অথচ কে না জানেন যে, '৭১-এর যুদ্ধের বছর নানা প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে তেমন কোন শিল্পপ্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বা উৎপাদন ব্যাহত হয়নি। মরহুম ডঃ মাজহারুল হকও একই বক্তব্য রেখে গেছেন। আসলে যুদ্ধটা একটা অজুহাত মাত্র। তাছাড়া জাতিসংঘের ত্রাণকমিটির এক হিসাব থেকেও জানা যায়, বাংলাদেশের যুদ্ধজনিত সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে বাংলাদেশে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল তের গুণ বেশী।

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎসও হচ্ছে এই পাট। এই পাট নিয়েই চল্‌ল ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতি। আমরা লক্ষ্য না করে পারিনে যে, ১৯৫১ সালে এই দেশে প্রথম চটকল স্থাপিত হবার পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই কুড়ি বছর সময়টি ছিল পাট শিল্পের অগ্রগতির কাল। অথচ এই পাট শিল্পই রাষ্ট্রীয়করণ নীতির জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সব থেকে বেশী। আমরা লক্ষ্য করছি, ১৯৫৮-৫৯ সালে এই শিল্পে তাঁতের সম্প্রাসারণ ঘটেছিল ৮,০০০। তারপর '৬৪-৬৫ সালে তাঁতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১১,০০০-এ এবং '৬৯-৭০ সালে ২১,৪০০। বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) এই ২১,৪০০ তাঁত থেকে উৎপাদন হয়েছিল ৫,৬০,০০০ টন পাটজাত দ্রব্য। বর্তমানে তাঁতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৫,৭০০ ; কিন্তু উৎপাদন রয়ে গেছে ১৯৬৯-৭০ সালেরও নীচে।

বাংলাদেশের পাটকলগুলি রাষ্ট্রীয়করণের পর তৎকালীন পাটমন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য এক নয়া পাটনীতি উদ্ভাবন করেন। তৎকালীন শাসকদের অতি উৎসাহী অংশ আহলাদ করে এই পাটনীতির নাম দেয় 'সমাজতান্ত্রিক পাটনীতি।' তথাকথিত এই সমাজতান্ত্রিক পাটনীতির দৌলতে বাংলাদেশে পাটশিল্পে নেমে আসে ধ্বংসের কালো ছায়া। পাটমন্ত্রী আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের পাটের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী

www.pathagar.com

ভারতের সংগে এমন চুক্তিতে দেশকে আবদ্ধ করেন, যাতে আমাদের পাটের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। একদিকে বাংলাদেশের কাঁচা পাট বিক্রির ক্ষেত্রে দেখা দেয় সংকট, অন্যদিকে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ প্রশাসনের হাতে পড়ে পাটকলগুলিতে চলে উৎপাদনের নামে নৈরাজ্য। সাবেক পাকিস্তান সরকারের ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় এটা ধারণা করা হয়েছিল যে, ১৯৭৫ সাল নাগাদ পাট শিল্পে তাঁত সংখ্যা বাড়ানো হবে ১৫,০০০ এবং তাঁতের মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৪০,০০০। পাকিস্তানী আমলের পাট শিল্পের বিকাশের ধারা অনুসরণ করলে এটা অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকে না যে, এই লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চয়ই অর্জিত হতো। বলাবাহুল্য, এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে, আমাদের দেশেই কাঁচা পাট ব্যবহৃত হতো ৬০ লাখ বেলেরও বেশী। ফলে কাঁচাপাটের মূল্যে স্থিতিশীলতা বিরাজ করা ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ ১৯৬৯-৭০ সালের ৩৭৪ কোটি টাকা থেকে ১৯৭৭-৭৮ সাল নাগাদ ১১০০ কোটি টাকায় উন্নীত হতো, সঙ্গে সঙ্গে পাটকল শ্রমিকের সংখ্যা বর্তমানের ১ লক্ষ ৯০ হাজার থেকে বেড়ে প্রায় ৩ লক্ষে দাঁড়াতো। কিন্তু সরকারের ভ্রান্ত রাষ্ট্রায়ত্ত নীতির দরুনই তা হয় নাই,—হতে পারে নাই। (ঐ সময় US $ 1 = মূল্য ছিল ৪·৩০ টাকা এখন $ 1 এর মূল্য = ১৭·১০ টাকা)

বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত অন্যান্য শিল্পের অবস্থা, বলাবাহুল্য, পাট-শিল্পের চেয়ে একটুও ভাল নয়। তবু পাট শিল্পের দিকে আমরা বেশী লক্ষ্য করছি এই কারণে যে, এটাই এখন পর্যন্ত প্রধান শিল্পখাত। আমাদের অর্থনীতির প্রাণ-ভোমরার অবস্থানটা মূলতঃ এখানেই। বলা বাহুল্য যে, বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক কৃষকের প্রধান অর্থকরী ফসল এই পাট। এই পাট বিক্রি করেই কৃষকের ঘাটতিপড়া খাদ্য, সারা বছরের কাপড়-চোপড়, ছেলের পড়ার খরচ, মেয়ের বিয়ে ইত্যাদি তাবৎ খরচ সম্পন্ন হয়। কাজেই বাংলাদেশের জাতীয় অর্থ-নীতির অনন্য এই খাতটির প্রতি আমরা একাগ্রমনোযোগ না দিয়ে পারি না। অথচ স্বাধীনতা-উত্তর সরকারের ভ্রান্তনীতির ফলে বাংলা-দেশে এই পাট (কৃষি উৎপাদন ও শিল্প উৎপাদনসহ) তার সমস্ত সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলেছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রথম থেকেই বাংলাদেশের পাটের টাকায় ডানডি, কলকাতা, বোম্বাই, পিণ্ডি ইসলামাবাদসহ অনেক

www.pathagar.com

আধুনিক শহর ও বন্দর গড়ে উঠেছে। পাকিস্তানী শাসনমুক্ত এই বাংলাদেশে পাটের যে কি বিপুল সম্ভাবনা ছিল তা ধারণা করা যায় না। পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পাটকলগুলিতে ৪০ হাজার তাঁত বৃদ্ধির সম্ভাবনা আশা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পাটশিল্পে তাঁত সংখ্যা বৃদ্ধির পাকিস্তানী পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কারণ, 'পর-শাসনের' কাল থেকে 'স্ব-শাসনের' কালে উপনীত হবার পর এই আকাঙ্খা করা আদৌ অস্বাভাবিক ছিলনা যে, আমাদের শিল্পখাত অনেক বেশী প্রাধান্য পাবে।

অবশ্য রাজনৈতিক ভাষণাদিতে যথেষ্ট প্রাধান্য দেয়াও হয়েছিল। কিন্তু কার্যতঃ আমরা এর উল্টো চিত্রটাই দেখতে পেয়েছি। আমরা লক্ষ্য করি যে, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত প্রথম থেকেই বিদেশে কাঁচা পাট রপ্তানির নীতি ত্যাগ করে ক্রমাগত সমস্ত কাঁচা পাট দেশীয় কারখানায় ব্যবহারের নীতি গ্রহণ করে। এবং ক্রমে ক্রমে ভারতীয় কারখানাগুলি এই নীতির অনুকূলে এতদূর বিকশিত হয় যে, তাদের কাঁচা পাট রপ্তানির আর কোন প্রয়োজনই থাকে না। পাকিস্তানী আমলের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশে কাঁচা পাটের উৎপাদন হতো ৭০ থেকে ৭৫ লক্ষ বেল। পাকিস্তানী আমলের পাট শিল্পের বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশে এই ১৯৮০ সাল নাগাদ অর্জিত পাট শিল্পে মোট তাঁতের সংখ্যা দাঁড়াতো প্রায় ৫০ হাজার এবং ৭০-৭৫ লাখ বেল পাটই দেশীয় কারখানায় ব্যবহৃত হতে পারতো। ফলে বাংলাদেশকেও বিদেশে কাঁচা পাট রপ্তানী করতে হতো না। কিন্তু একটা মাত্র ভুল নীতির জন্যে এই সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অথচ অত্যন্ত বাস্তব ভাবেই আশা করা যায় যে, বাংলাদেশের সমুদয় কাঁচা পাট দেশীয় পাটকলগুলিতে ব্যবহার করা সম্ভব হলে জাতীয় অর্থনীতিতে একটা বিপুল তেজী ভাবের আবির্ভাব ঘটতো। বললে উপকথার মত শোনাবে, এই একটা মাত্র খাত থেকে বছরে সাড়ে ১৩ শত কোটি টাকার বৈদেশীক মুদ্রা অর্জন করাও সম্ভব হতো এবং শিল্প বিকাশের ধারায় একটা বিপুল দক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটতো। কিন্তু এ সব কিছুই হয়নি। ৬৯-৭০ সালের উৎপাদনের পর্যায় এই দশ বছরেও আমরা অতিক্রম করতে পারিনি।

www.pathagar.com

পাকিস্তানে প্রথম চটকল স্থাপিত হয় ১৯৫১ সালে। ১৯৭১ পর্যন্ত এই শিল্প বিকাশের ধারায় আমরা যে বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করি, সেই তুলনায় এই '৮০ সাল পর্যন্ত এই শিল্পে বস্তুতঃ কোন বিকাশই ঘটেনি। ১৯৬৯-৭০ সালে একটি তাঁত থেকে যেখানে গড়ে বার্ষিক সাড়ে ১৬ টন উৎপাদন হতো, তা কমে গিয়ে ১১'৫৮ টনে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ চটকল সমিতির প্রতিবেদনে জানা যায়, চট তৈরীর ক্ষেত্রে ১৯৬৯-৭০ সালে গড়পড়তা বার্ষিক ৪১'২২ টন উৎপাদনের স্থলে ১৯৭৭-৭৮ সালে উৎপাদিত হয়েছিল মাত্র ৩১'০০ টন। কার্পেটের অনুকূলে যে অংক তাও হতাশাব্যঞ্জক। ১৯৬৯-৭০ সালে ৪২'১০ টনের স্থলে উৎপাদন হয়েছে মাত্র ৩৩'২৮ টন। তুলনামূলক অংক থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, সরকার হাতে নেওয়ার পর থেকে মিলগুলোতে যদি ১৯৬৯-৭০ সালে অর্জিত দক্ষতার সাথে কাজ চলতো তা হলে তারা প্রকৃত উৎপাদন ৫,৪৬,০০০ টনের স্থলে ১৯৭৭-৭৮ সালে ৭,১০,০০০ টন এ উন্নীত করতে পারতো। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে ঘটেছে উৎপাদন হ্রাস এবং এভাবে উৎপাদনের বার্ষিক ঘাটতি ২৫% এসে দাঁড়িয়েছে। এই উৎপাদন হ্রাসের কারণ কি? এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, কাঁচামালের অভাব এর কারণ নয়, এর একমাত্র কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত পরিচালনা ব্যবস্থাই।

আমরা জানি, পৃথিবীর কোন কোন দেশে শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রীয় করণ করার পরই উৎপাদনের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। তাহলে নিছক রাষ্ট্রীয়করণই যে এর একমাত্র কারণ নয় তাও বুঝা যাচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করি যে, রাষ্ট্রীয়কৃত অন্যান্য দেশের শিল্পে যেখানে পরিচালন বিভাগে অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখা গেছে, সেখানে আমাদের দেশে দেখছি সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। একজন বৃদ্ধ শ্রমিক আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন যে, আদৌ কোন পরিচালন ব্যবস্থা না থাকলে উৎপাদন ঘাটতি হতো অনেক কম। অর্থাৎ বাংলাদেশী রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলির পরিচালন ব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করার পরিবর্তে গ্রহণ করেছে বিপরীত ভূমিকা। কিন্তু এর কারণ কি? এবং এর জন্য দায়ী কে?

বস্তুতঃ এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানই আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর দেখা গেল, বাংলাদেশের চটকলগুলির অধিকাংশের মালিক পাকিস্তানী।

www.pathagar.com

আর দেশীয় মালিকরাও ঘটনাচক্রে অধিকাংশই পাকিস্তান পন্থী। এই পাকিস্তানী ও পাকিস্তানপন্থীদের বিরুদ্ধে ৯ মাসের সংগ্রামের পরই বাংলাদেশ অর্জিত হয়েছে। কাজেই অনুপস্থিত ও বাংগালী মালিকদের কল-কারখানাগুলি পরিচালনার জন্যই সরকার রাষ্ট্রীয়করণের নীতি গ্রহণ করেন এবং বাঙ্গালী মালিকদেরকে অখ্যা দেন 'বৈরী মালিক।' এটা যে কেবল মাত্র ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও কর্মীদের ভোগ করার জন্য তা বলাই বাহুল্য।

রাষ্ট্রীয়করণ নীতি গ্রহণ করার পর মিল কল-কারখানাগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে এক আজব ব্যাপার দেখা গেল। আজব এ অর্থে যে, পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণের জন্য ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাশ্রয়ী রাজনৈতিক মহলে এক নগ্ন প্রতিযোগীতা শুরু হলো। প্রশাসক নির্বাচনের ব্যাপারে কোন সুষ্ঠু পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হলো না। যে যেমন পারলো মিলগুলি দখল করলো, ভারত আক্রমণকারী আলেকজাণ্ডারের চেয়েও আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায়। দখল করার পর কি হলো? আমরা দেখলাম, অল্পদিনের মধ্যেই কারখানাগুলিতে উৎপাদন ও পরিচালনে ভয়াবহ নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। কারখানাগুলিতে 'শ্রমিক অসন্তোষ' একটা নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কারখানাগুলিতে যেটুকু শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষিত না হলে বস্তুতঃ উৎপাদনই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, এখানে সেটুকুও রক্ষা করা হলো না, শ্রমিকদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা বাধানো হতে লাগলো। গুম, খুন আর জখম হয়ে দাঁড়ালো নিত্যকার ঘটনা। এরকম অজস্র অভিযোগ আছে যে, ক্ষমতাশ্রয়ী শ্রমিক নেতারা ভুয়া শ্রমিকের তালিকা দাখিল করে লক্ষ লক্ষ টাকার বিল উঠাতো এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতো। প্রকৃত দেশপ্রেমিক শ্রমিকরা এই ঘৃণ্য তৎপরতায় বাধা দিলে তাদের উপর রাতের আঁধারে এমনকি প্রকাশ্যে দিনের বেলায় গুণ্ডা লেলিয়ে দেয়া হতো। এই প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে দেখা যায়, শ্রমিক জনগণের এক বিপুল অংশের চরিত্রহনন কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে আর প্রকৃত শ্রমিকদের মধ্যে নেমে এসেছে হতাশা। এই অবস্থায় বর্ধিত উৎপাদন সম্ভব নয়। এমনকি উৎপাদনের পূর্বের মান রক্ষাও অসম্ভব।

www.pathagar.com

তৎকালীন পাট প্রতিমন্ত্রীকে ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে সাপ্তাহিক বিচিত্রার পক্ষ থেকে সেক্টর করপোরেশনের পরিচালনাধীন পাটকলগুলির উপর্যুপরি লোকসানের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন তা যথার্থই প্রণিধানযোগ্য। তিনি স্বীকার করেছিলেন, লোকসানের জন্য বিশেষভাবে দুর্নীতি ও অদক্ষতাই দায়ী এবং এ ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ, দুর্বল প্রশাসনও একটি সমস্যা।

পাট প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল, পাটকলসমূহের লোকসানের পরিমাণ ১৯৭১-৭২ সালে ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা, ৭২-৭৩ সালে ২৫ কোটি টাকা এবং ৭৩-৭৪ সালে (৭৪-এর মার্চ পর্যন্ত) ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ব্যাংকের কাছে জুট মিলের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ওভার ড্রাফট ৩৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা আর ডিবেঞ্চার ২৯ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ ঋণ ও লোকসানের জন্য পাটমন্ত্রী দায়ী করেছিলেন দুর্নীতি ও অদক্ষতাকে এবং সেক্টর কর্পোরেশনের পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ ও দুর্বল প্রশাসনকে।

আমরা জানি, কোন শিল্পে লোকসান ঘটবার পেছনে সচরাচর যেসব কারণ বর্তমান থাকে সেগুলি হলো কাঁচামালের অভাব, বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতার দরুণ পণ্যের মূল্য হ্রাস, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভ্রাট কিংবা শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘটজনিত কারণে উৎপাদন হ্রাস। কিন্তু এক্ষেত্রে এসব কারণকে চিহ্নিত করা হয়নি। কাঁচামালের কোন অভাব ছিল না, বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা থাকলেও তাকে লোকসনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়নি এবং সমস্যা হিসেবে যা যা চিহ্নিত হয়েছে তা ক্ষমতাসীন শাসকদেরই সৃষ্ট। একটা প্রশ্ন বিবেচনা করা যাক ঃ কারখানায় অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল কেন? তৎকালীন পাট প্রতিমন্ত্রী এর কোন জবাব দেননি। কিন্তু জবাবটি কি দেশবাসীর অজানা? আদৌ নয়। তৎকালীন ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব তাদের রজনৈতিক স্বার্থে বিভিন্ন রকম বাহিনী পুষতো। এবং এইসব বেসরকারী বাহিনীর লোকদের মালিকবিহীন

www.pathagar.com

কারখানাগুলির খাতায় নাম লিখানো হতো শ্রমিক হিসেবে। যেখানে মিলের প্রয়োজন ৫ হাজার শ্রমিকের সেখানে এইভাবে বাহিনীর লোক নিয়োগ করতে করতে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াতো ৮ হাজার, ১০ হাজার। ফলে অনিবার্যভাবেই মিলগুলিতে লোকসান হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। যে ধরণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকলে ব্যক্তি-মালিকানার বিপরীতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় উৎপাদন লাভজনক পর্যায়ে হওয়া সম্ভব এখানে তার কিছুই ছিল না এবং এখনো নেই। 'লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন' এমনই একটা মনোভঙ্গি ছিল সর্বত্র বিরাজিত। এই অবস্থায় ব্যক্তি স্বার্থের কারণে সুযোগ থাকলে লুট-পাট অবশ্যম্ভাবী। তৎকালীন পাটমন্ত্রী স্বীকার করেছিলেন, জাহাজে মাল উঠানোর ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের বেলায় জাহাজে জায়গা নেই অথচ প্রাইভেট পাটের বেলায় জায়গার অভাব নেই।

ব্যক্তি-মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা এই দু'য়ের কোনটা ভাল তার জবাব স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নিরপেক্ষভাবে দেয়া সম্ভব নয়। যে দেশে সম্পত্তির উপরে ব্যক্তির অধিকার পবিত্র বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় উৎপাদনে নৈরাজ্য দেখা দেয়াই স্বাভাবিক। বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ার পৌরহিত্যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে অধন-বাদী বিকাশের তত্ত্ব ফেরী করা হচ্ছে তা যে সমাজতন্ত্রের পথ নয় তা অভিজ্ঞতা থেকে ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বি, আর, টি, সি, রাষ্ট্র পরিচালিত একটি পরিবহণ সংস্থা। এই সংস্থাটি জন্মের পর থেকে এ যাবৎ প্রায় আড়াই শত কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। অথচ আমরা জানি, কোন ব্যক্তিমালিক যদি একখানা বাস রাস্তায় নামাতে পারে তার সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়েও সে পরের বছর আরেকখানা বাস কিনতে পারবে। এইভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার অনেক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীই দুই এক খানা বাস দিয়ে শুরু করে ২৫/৩০ খানা গাড়ীর মালিক হয়েছে। এরকম উদাহরণের অভাব নেই।

বি, আর, টি, সি, এমনি একটা অলাভজনক লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়েছে কেমন করে খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, অন্যান্য সেক্টর কর্পোরেশনের মত এখনেও যে তন্ত্রটা কায়েম করা হয়েছে, সেটি নির্ভেজাল লুটপাট তন্ত্র। তেল চুরি, মবিল চুরি, যন্ত্রাংশ চুরি শুধু চুরি আর চুরি। এই চুরি ঠেকাতে গিয়ে লোকের পরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে, কিন্তু চুরি

www.pathagar.com

বন্ধ হচ্ছে না। জানা গেছে, বি, অর, টি, সি'র প্রতিটি গাড়ীর পেছনে চোর আর চোরধরা মিলিয়ে কর্মচারীর সংখ্যা নাকি দাঁড়িয়েছে ৩১ জন করে! শুধু পাটকল বা বি, আর, টি, সি নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টর করপোরেশনের আওতাধীন সমুদয় খাতেই কর্তব্যে অবহেলা, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, জনগণের সম্পদের অপচয় ও চুরি একটা সাধারণ ঘটনা। পরিমাণগত তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু ঘটনা সর্বত্র একই। বস্তুতঃ একটা সত্য সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে—আর তা হলো, রাষ্ট্রায়ত্ত খাত আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ব্যর্থ। ভিন্ন রকম আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি যদি কখনও সৃষ্টি হয় তখন হয়তো রাষ্ট্রায়ত্ত খাত সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজে আর সব উপাদান ঠিক ঠিক আগের অবস্থানে বিদ্যমান থাকা অবস্থায়, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ভিন্ন রকম ফল দেবে, তা হতে পারে না। 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না।' ভিন্ন রকম পরিবেশে হয়তো এ প্রবাদ বচন মিথ্যে হয়ে যেতে পারে তবে আমাদের দেশের বর্তমান আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে এখনও এ প্রবচন যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। ভুল বুঝবার অবকাশ থাকতে পারে বলে পুনশ্চ উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, কঠোরভাবে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ব্যর্থ হতে বাধ্য, এটা আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই ভালভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা যদি রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকলগুলির গোডাউন থেকে প্রথম দিকের অগ্নিকাণ্ড ও তজ্জনিত মোট ক্ষয়ক্ষতির হিসাবটা পর্যবেক্ষন করি তা'হলে এই ব্যবস্থার ব্যর্থতার আর একটা নজীর আমরা দেখতে পারো। বাংলাদেশ হবার পর থেকে ২৫শে জুন, ১৯৭৪ পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১৮ লক্ষ ৭০৭ মণ পাট পুড়ে গেছে। এতে করপোরেশনের ক্ষতির পরিমাণ ৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা এবং পাটকলের ক্ষতির পরিমাণ ৩৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা—মোট ৮ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। 'সরকারী মালদরিয়া মে ঢাল্' এর একটি অনবদ্য উদাহরণ হলো এই কগ্নিকাণ্ড।

যাইহোক, উপরের আলোচনার সারসংকলন করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশের শিল্পবিপ্লব সম্ভব করে তুলতে হলে দুই-একটি ভারী শিল্পখাত ছাড়া সাধারণ শিল্পখাতগুলি ব্যক্তি-মালিকানায় আনতে হবে, অন্যথায় রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানায় পরিচালিত করতে গেলে ব্যর্থতা আসবেই। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের

www.pathagar.com

পুঁজি যেহেতু কোন একক ব্যক্তির নয়, কাজেই জনগণের সম্পদ লুট করে ব্যক্তিগত বিলাসের ভোগে অপচয় করা থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিরত থাকবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। দেশকে শিল্পায়িত করতে হলে প্রথমে সম্পদের অপচয় রোধ করতে হবে। আমাদের বর্তমান সমাজ কাঠামোয় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগসমূহে অপচয়রোধ অসম্ভব। পক্ষান্তরে সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ছাড়া পুঁজি গঠন আদৌ সম্ভব হতে পারে না। শিল্পোন্নয়নের আরেকটি প্রধান শর্ত শ্রমিক শ্রেণীর ধারাবাহিক দক্ষতা অর্জন কিন্তু আমরা দেখেছি '৬৯-৭০ সাল পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দক্ষতা অর্জনের যে ধারা বিদ্যমান ছিল পরবর্তীকালে সে ধারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এর পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। পরিশেষে শিল্পায়নের পক্ষে অপরিহার্য পূর্বশর্তসমূহ পুঁজি ও শ্রমশক্তির বিকাশের স্বার্থে আমাদের মোহমুক্ত মন নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। চিন্তা করে দেখতে হবে যে, একটা ভ্রান্ত নীতি আঁকড়ে থেকে আমরা উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহের কাঁচামালের যোগানদার আর শিল্পপণ্যের বাজার হয়েই থাকবো, নাকি সঠিক নীতি গ্রহণ করে আমাদের সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে শিল্পায়িত করে তুলবো। বিষয়টি জাতীয় স্বার্থের বিচারে এতই জরুরী যে, এই নিয়ে বৃথা সময় ক্ষেপণ করা আর উচিত হবে না।

সরকারের বিনিয়োগ সিডিউলে বলা হয়েছে, ব্যক্তিমালিকানার কল-কারখানা আর রাষ্ট্রীয়করণ করা হবে না, করলেও মালিককে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। কিন্তু যেসব দেশীয় মালিকের শিল্প অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের আজো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। দেশে পুঁজি লগ্নির আইন পাশ হয়েছে। বিদেশী পুঁজি মালিকদের আহবানও জানানো হচ্ছে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য। ফল কি হবে রাষ্ট্রনায়করাই জানেন। দেশীয় মালিকদের মন থেকে ভীতি কিন্তু এখনো কাটেনি। বিদেশীদের মধ্যেও ইতস্ততঃ ভাব রয়েছে। পরিস্থিতিটি এক কথায় খুবই নাজুক তাতে সন্দেহ নেই। দেশবাসী চায় সরকার অতিসত্বর এই বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। কারণ, শিল্পের বিকাশ ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও সম্প্রসারিত হওয়া অসম্ভব।

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বের অনৈক্য

বনাম

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে বিধ্বস্ত শ্মশানভূমির উপর দাঁড়িয়ে শোকাতুর মানবতা সেদিন যে আকাঙ্খা উচ্চারণ করেছিল—আর যুদ্ধ নয়, সেই আকাঙ্খা পূরণ হয় নি। হিরোসিমার বিভীষিকা ছাড়াও জলে-স্থলে অন্তঃরীক্ষের সমুদয় ধ্বংসলীলা, যার পরিমাপ করতে গেলে—পৃথিবীর ৭০টি দেশের পাঁচ কোটিরও বেশী লোক হারিয়েছে প্রাণ ও সহায়-সম্পত্তি, এবং ক্ষয়-ক্ষতির কোন পরিমাপ করাই বোধকরি সম্ভব নয়। অথচ পুনর্বার সেই যুদ্ধ সংঘটিত না হবার মত অবস্থা পৃথিবীর বুকে রচিত হয় নি। অন্যপক্ষে বিশ্ববিবেকের সমুদয় আর্তি উপেক্ষা করে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ১৯'৩৯ সাল থেকে ৪৫ সালের মধ্যে দু'কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার স্থান জুড়ে চলেছিল সে যুদ্ধের তাণ্ডব, অথচ ভালভাবে একটি দশকও পার হয় নি, পৃথিবীর নানাস্থানে শুরু হয়ে গেছে খণ্ডখণ্ড যুদ্ধ এবং প্রতিটি খণ্ডখণ্ড যুদ্ধ এক মহা ভয়াবহ যুদ্ধের আতঙ্ক নিয়ে শেষ হচ্ছে কিংবা আদৌ শেষ হচ্ছে না, চরাচরব্যাপী প্রাণ ও সম্পদের পরিণাম শাসনকারী এক মহাধ্বংসের দিকেই যেন দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই গ্রহ। সচেতন বিবেক আজ ভাবতে বাধ্য হচ্ছে, সত্যি কি ধ্বংস হয়ে যাচেছ, আমাদের এই অত্যন্ত ভালবাসা আর আদরে গড়ে তোলা দুনিয়াটা? সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও আমাদের মনে উঠছে—কেন এই ধ্বংস? এবং কার স্বার্থে শুরু হচেছ এই ধ্বংসলীলা?

বস্তুতঃ চারিদিকের ঘটনাবলীর দিকে চোখ বুলালে চোখে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর প্রতিযোগীতায় কি সাংঘাতিকভাবে ক্ষিপ্ত। একাধারে তারা নিজেরা যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত হচেছ এবং সঙ্গে সঙ্গে এক জঘন্য উৎসাহে তারা পৃথিবীকেও নানা মারণাস্ত্রে সজ্জিত করে তুলছে। জাতীয় অর্থনীতিতে সমরোপকরণ তৈরীর কারখানা উৎপাদন উল্লেখিত পরাশক্তিদ্বয়ের জাতীয় উৎপাদনের

www.pathagar.com

এক বৃহদাংশ অধিকার করে আছে! তাই অর্থনীতি অনিবার্যভাবে হয়ে উঠেছে ওয়ার ইকনমী—মারণযন্ত্রে উৎপাদনই অন্যান্য সব উৎপাদনকে করছে নিয়ন্ত্রণ।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চক্রান্ত

এই দুটি মহাশক্তিশালী দেশ অত্যন্ত কৌশলে সারা পৃথিবীর সব সম্পদের সিংহভাগ লুট করছে শুধু মারণাস্ত্র বিক্রি করে।—একটা দেশের বিরুদ্ধে অন্য একটা দেশকে লেলিয়ে দিচ্ছে, একটা দেশকে লুণ্ঠনের স্বার্থে দুটি অংশে ভাগ করে এক অংশের বিরুদ্ধে লাগাচ্ছে অন্য অংশকে। অর্থাৎ যেখানে যুদ্ধ আর ধ্বংস, সেখানেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সেখানেই সোভিয়েত ইউনিয়ন। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দরিদ্র অথচ বিপুল রকম প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী দেশগুলি একেবারে মূঢ়ের মত এই দুই পরাশক্তির হাতে তুলে দিচ্ছে দেশের সব সম্পদ, বিনিময়ে নিচ্ছে মারণাস্ত্র,-যা দিয়ে সে তার প্রতিবেশী দেশটির ভ্রাতৃপ্রতীম মানুষগুলিকে একদিন মারবে।

সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় অন্ততঃ আমাদের জন্য হলো এই যে, এই দুই পরাশক্তির জালে সর্বাপেক্ষা কঠিনভাবে ধরা পড়েছে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলি। প্রত্যেকটি দেশই মারণাস্ত্র কিনতে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ প্রতিনিয়ত তুলে দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে। ভাবতে গেলে পরিতাপের আর সীমা থাকে না যে, পৃথিবীর প্রায় একশ কোটিরও বেশী হলো মুসলমান এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতেই রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের সিংহভাগ। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ দিয়ে এসব দেশের জনগণের বৈষয়িক উন্নতির আকাঙ্খিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অন্যপক্ষে, পরাশক্তিদ্বয় একটি মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে লেলিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করেছে যুদ্ধের আতংক, ফলে ভ্রাতৃপ্রতীম প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হবার জন্য পরাশক্তিদ্বয়ের আধিপত্যবাদী আকাঙ্খার যূপকাষ্ঠে বলি দিচ্ছে নিজেদের সম্পদের সিংহভাগ।

হাদিস শরীফে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সে মুমিন নয় সে মুমিন নয়, সে মুসলিম নয়, যার থেকে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়।

www.pathagar.com

ইসলামের এই শিক্ষা ভুলে পৃথিবীর সব মুসলমান দেশগুলি সৌহার্দ্য-মূলকভাবে বসবাস করতে ব্যর্থ হচ্ছে শুধু মাত্র পরাশক্তিদ্বয়ের কোন না কোন এক শক্তির হীন প্ররোচনায়। দুঃখের বিষয়, এই হীন প্ররোচনা সম্পর্কে ক্ষেত্র-বিশেষে সম্যক অবহিত থেকেও জাতীয় অদেশের প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ মানবতার প্রতি বিশ্বাসঘাতক বিজাতীয় জীবনব্যবস্থার দিকে মৃতপতঙ্গের মতছুটে চলেছে দুনিয়াব্যাপি মুসলিম-সমাজ। জানি না এই ছুটে চলার শেষ কোথায়।

এটা জানা কথা যে, পৃথিবী সব দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিকাশ সমান তালে হয় না। সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে কেউ যখন একেবারে নীচের ধাপে আটকে থাকে তখন কেউ উঠে যায় অনেক উপরে। ইউরোপ, আমেরিকার দেশগুলির শিল্পের বিকাশ যখন অনেক উপরের স্তরে উন্নীত তখন বাকী দুনিয়ার শিল্পের ক্ষেত্রে কোন বিকাশই হয় নি। বর্তমানে বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলি চায় না অনুন্নত দেশগুলি শিল্পোন্নত হোক। বরং তারা চারা এসব দেশগুলি যেমন অনুন্নত স্তরে আটকে আছে তেমনি থাকুক এবং চিরকাল ধরে শিল্পোন্নত দেশগুলির কাঁচামালের যোগান্দার আর শিল্প পণ্যের বাজার হয়েই থাকুক। বলতে বাধা নেই, এই দুরভিসন্ধিই পৃথিবীর তবৎ অশান্তির কারণ।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানকার অধিবাসীদের প্রায় ৯০ ভাগ মুসলমান। এই মুসলমান প্রধান দেশটির কাঁচামাল, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিপুল শ্রমশক্তিকে লুণ্ঠন করার জন্য এক সুগভীর চক্রান্ত কাজ করে চলেছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশগুলির বিরুদ্ধে রচিত যে সুগভীর চক্রান্ত রয়েছে এটা তারই অংশ বিশেষ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই দুনিয়া জোড়া আধিপত্যবাদী পরাশক্তিদ্বয় তাদের সমর অর্থনীতি টিকিয়ে রাখার জন্য আজ বেশী রকম নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে মুসলিম দেশগুলির খনিজ-সম্পদ—বিশেষ করে তৈল-সম্পদের উপর। ১৯৫১ সালের ১লা মে ইরানের তেলক্ষেত্রগুলি ছিল এ্যাংলো-মার্কিন তেল কোম্পানীর সম্পত্তি। এই তেল নিয়ে ইরানের রাজ-নীতিতে বিদেশী আধিপত্যবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইরানের শাহের পতনের পূর্ব পর্যন্ত ইরানের তেলের উপর বিদেশী খবরদারী ছিল বলতে গেলে অবাধ। ইরানের জনগণের শাহ বিরোধী আন্দোলনের

www.pathagar.com

মূল কারণ যে ইরানের খনিজ-সম্পদের উপর জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ও স্বার্থ প্রতিষ্ঠা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সউদী আরব একটি অন্যতম প্রধান মুসলিম দেশ। বিশ্বের তাবৎ মুসলমানের পবিত্র অনুভূতি এই দেশটির শুভাশুভের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দেশটিতে রয়েছে বিশ্বের তেল সম্পদের এক বিশাল ভাণ্ডার। সউদী আরবের তেলকূপগুলি পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় অবস্থিত এবং এই তেলকূপ থেকে তেল উত্তোলন করে আরব-আমেরিকান তেল কোম্পানী। ১৯৪৮ সালে এই কোম্পানীর পূর্বতন মালিকানা পরিবর্তিত হয়ে যায়। স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়েল অব ক্যালিফোর্নিয়া, স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল অব নিউজার্সী এবং দি টেকসাস কোম্পানী প্রত্যেকে পায় ৩০% করে এবং এস, ভ্যাকুয়াম ওয়েল কোম্পানীর ভাগে পড়ে ১০%। এরপর ১৯৫০ সালে সউদী আরবের সরকার ও আরব-আমেরিকান তেল কোম্পানীর মধ্যে-কার এক চুক্তিবলে তেল উত্তোলনসহ সমুদয় খরচবাদে লভ্যাংশের আধাআধি ভাগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে। এরপর শুল্ক ইত্যাদি বাদে আরব সরকারকে একটা রয়ালটী দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সউদী আরবের জাওহার তেলক্ষেত্রটি হলো পৃথিবীর বৃহত্তম তেল-ক্ষেত্র। বিশ্বাস করা হয়, এই তেল ক্ষেত্রের বিশাল সঞ্চয় আমেরিকার জানা সমস্ত তেল সঞ্চয়ের চেয়েও বেশী। প্রায় ২৮ হাজার বিলিয়ন ব্যারেল। এছাড়া পৃথিবীর বৃহত্তম উপকূলীয় তেলক্ষেত্র সাকানেয়া তৈলকূপসমূহ থেকে উত্তোলিত হয় আরবের মোট উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশ। এসব কূপ এবং অন্যান্য তেলকূপ থেকে ট্রান্স আমেরিকান কোম্পানীর পাইপ লাইন বেয়ে এই তেল যায় ভূমধ্যসাগরীয় তেল শোধনাগারে এবং সেখান থেকে কিছু শোধিত হয় অথবা শর্ট পাইপ লাইন বেয়ে যায় বাহ্‌রায়নে সেখান থেকে ভরা হয় তৈলবাহী বিশাল বিশাল জাহাজে।

এছাড়াও সউদী আরবে ব্যবসারত (বলা উচিত লুণ্ঠনরত) আরো কয়েকটা কোম্পানী রয়েছে Getty oil Company, Arabian oil Company এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনের অন্যতম Joint Soudi-Japanese Company. এটা একটা প্রমাণিত সত্য যে, পৃথিবীর

www.pathagar.com

তাবৎ তেল সঞ্চয়ের শতকরা ১৮ ভাগ তেল অর্থাৎ প্রায় ৬০ হাজার মিলিয়ন ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয় সউদী আরব থেকে।

এরপর বলতে হয় কুয়েতের কথা। কুয়েত সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, একটা বিশাল তেল সাগরের উপর ভাসছে এই দেশটি। এর সঞ্চয়ের পরিমাণ সউদী আরবের চেয়েও বেশী এবং লক্ষ্যনীয় যে, এই অঞ্চলের সমুদয় তেল যায় পারশিয়ান গ্যাল্‌ফ্‌ বন্দর হয়ে বিদেশে। আরব-আমেরিকান তেল কোম্পানীর নিজস্ব ট্যাংকার বহরভর্তি হয়ে তেল যায় বিদেশে আর বিদেশ থেকে আসে জাহাজ ভর্তি মোটর গাড়ী সিমেন্ট, চা, চিনি, লোহার বার আর নানা রকম বিলাসদ্রব্য।

আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট কার্টার বলেছেন, 'রুশবাহিনী যদি পারশ্য উপসাগরীয় অঞ্চলের দিকে পা বাড়ায় তাহলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য।' কার্টারের এই উক্তি থেকে বোঝা যায়—উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থ কত গভীর।

একটা কথা আমাদের কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর কোন অঞ্চলই বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির আধিপত্যের বাইরে ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে জার্মান, জাপান ও ইটালীর পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পর পৃথিবীটাকে নতুন করে ভাগাভাগি করার প্রয়োজন দেখা দিলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী আবার ভাগ হয় এবং এখন দুই পরাক্তির সাম্রাজ্যবাদী বিকাশের এক পর্যায়ে পৃথিবীটাকে আবার ভাগ করে নেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার বিশাল সমর অর্থনীতি আজ এত বিপুলাকার ধারণ করেছে যে, সে তার নিজস্ব অবয়বের মধ্যে আর নিজেকে ধারণ করতে পারছে না। পৃথিবীটাকে তিনশ' বার বিধ্বস্ত করার মত সামরিক সম্ভার গড়ে তোলার পরও সে আরো মারণাস্ত্র উৎপাদনের কাজ দ্রুতগতিতে চালিয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই মারণাস্ত্র তৈরীর অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ কারখানা গড়ে উঠেছে, কাজ করছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। কারখানায় উৎপাদন হ্রাস করলে বা বন্ধ করলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক যাবে বেকার হয়ে। বেকার হলেই তাদের ক্রয়ক্ষমতা থাকবে না। তারা বিদ্রোহ করবে। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন নতুন জারদের জন্য সে হবে এক বিভীষিকা। কাজেই অস্ত্র বিক্রি আর সম্পদ লুণ্ঠনের

www.pathagar.com

প্রক্রিয়া সে বন্ধ করতে পারে না। কিন্তু সে জানে, বিশ্বকে নতুন করে ভাগ করে নেবার প্রধান বাধা হলো, উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশগুলির জাতীয় বিকাশ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার আকাঙ্খা।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

আজ অর্থনৈতিকভাবে মুসলিম দেশগুলি একটা বিপুল শক্তি। এ শক্তিকে অবহেলা করা কারো পক্ষেই আর সম্ভব হচ্ছে না। আবার সহ্য করাও সম্ভব নয়। সুতরাং মুসলিম দেশগুলির সম্পদ লুণ্ঠন ও একদেশের সঙ্গে অন্যদেশের যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবার হীন প্ররোচনার সঙ্গে-সঙ্গে দেশগুলির অভ্যন্তরে নিজস্ব তাবেদারবাহিনী-ও দল সৃষ্টি করে অরাজকতা অশান্তি সৃষ্টি, বিকৃত ও ক্ষতিকর সংস্কৃতি আমদানী করে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়ে একেবারে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া এসবই তারা করে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে। এসব হীন পরিকল্পনার প্রাথমিক অংশে থাকে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর আক্রমণ অর্থাৎ সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। অনুন্নত দেশগুলিতে ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের অনিবার্যতা প্রচার করে এরা নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূলে ছাত্র-সংগঠন গড়ে তোলে। বিভিন্ন রকম বৃত্তির লোভ দেখিয়ে কিছু তাবেদার ছাত্রকে নিজেদের দেশে নিয়ে যায় এবং বৃত্তির মাকাল ফলটা যেহেতু ঝুলিয়ে রাখা হয় নাকের ডগার উপর, কাজেই দলে দলে ছাত্ররা ঐ লোভের ফাঁদে ধরা দিয়ে জাতীয় স্বার্থবিরোধী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে একেবারে বিদেশী হয়ে যায়। দেশে বাস করেও দেশের মাটির সঙ্গে তাদের শেকড় আর প্রোথিত থাকে না।

উদাহরণ হিসেবে যদি আমরা বাংলাদেশের কথা ধরি, তাহলে দেখবো এদেশে রাজনৈতিক দল যেমন অসংখ্য তেমনি রয়েছে অসংখ্য ছাত্র-সংগঠন। জাতীয় রাজনীতিতে এদের প্রভাব ব্যাপক। কিন্তু তাসত্ত্বেও শিক্ষাঙ্গণে এরা যে অরাজকতার সৃষ্টি করেছে তা এক-কথায় বলতে গেলে ভয়াবহ। বাংলাদেশে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় আছে প্রকৃত প্রস্তাবে তার কোনটিতেও শিক্ষার পরিবেশ নেই। সর্বত্র ছাত্র-সমাজ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় লিপ্ত। এই দাঙ্গা জাতীয় রাজনীতিতে যেমন গণতন্ত্রের পরিবেশ বিনষ্ট করছে অন্যদিকে তেমনি শিক্ষা-ব্যবস্থা হচ্ছে ভেঙ্গে

www.pathagar.com

পড়ার উপক্রম। আমাদের দেশের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলার এ যে এক গভীর চক্রান্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠনগুলি বিদেশী আধিপত্যবাদ সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী যেসব বক্তব্য হাজির করে সাধারণ ছাত্রদেরকে বিভ্রান্ত করে তাতেই এই চক্রান্তের মূল যে বিদেশের মাটিতে প্রোথিত তা বুঝতে দেরী হয় না।

এটা প্রমাণিত সত্য যে, একটা দেশকে যতদিন প্রধানতঃ অশিক্ষিত করে রাখা যায় ততদিনই আধ্যিপত্যবাদী দেশটির পক্ষে সুবিধা। অথচ আমাদের দেশের ছাত্র-সমাজ ভ্রাতৃঘাতী বিভেদের পংকে এতদূর নিমজ্জিত যে, এর সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল গ্যাপ দেখা দিতে পারে এই আশঙ্কা তাদের মনেও আসে না। তাছাড়া শিক্ষার নামে কুশিক্ষার যে বীজ বপন করা হচ্ছে এবং সেই বিষবৃক্ষের গোড়ায় জাতীয় সম্পদের অনেকখানিই যে সিঞ্চন করা হচ্ছে এর পরিণামও আমাদের মাথায় আসছে না। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কাঠামোটা বিজাতীয় এবং অন্তর্বস্তুর দিক দিয়েও তা জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী। সমাজের উপরতলায় যারা বাস করেন তারা জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী এই ভাবধারার প্রধান প্রবর্তক এবং বাহক। বিদেশী আধিপত্যবাদ এদের উপর নির্ভর করেই মূলতঃ টিকে আছে। প্রত্যেকটি উন্নয়নশীল দেশেই রয়েছে বিভিন্ন আধিপত্য-বাদী শক্তির তাবেদার বাহিনী। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর একটা অংশ যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তখন অপর অংশ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং এভাবে জাতীয় রাজনীতির নেতৃত্ব দখল করে রাখে এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিকরা যাতে ক্ষমতার ধারে-কাছে না আসতে পারে সযত্নে সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। বিদেশী তাবেদাররা সব সময় তাদের স্ব-স্ব প্রভুর গুণকীর্তন করে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে (!) তাদের অবদানের কথা, তারস্বরে প্রচার করে চলে।

সাম্রাজ্যবাদী লগ্নীপুঁজির পক্ষে প্রচারের জন্য অনুন্নত দেশগুলিতে বিভিন্ন মিশনও কাজ করে। এদের প্রকাশ্য কাজ-কর্ম জনকল্যাণমূলক হলেও এসব বিদেশী সংস্থার একটা প্রধান কাজ হলো গুপ্তচরবৃত্তি চালানো। বাংলাদেশে বর্তমানে একশ'টিরও বেশী এ জাতীয় বিদেশী মিশন ও পরামর্শদাতা রয়েছে। গতবছর পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে

www.pathagar.com

জানা গিয়েছিল, প্রায় দুই লক্ষ গরীব মুসলমান জীবিকার তাড়নায় এসব মিশনারীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে। কথাটা সত্য হলে স্বীকার করতেই হবে এরচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নেই। অথচ আশ্চর্য এই যে, আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মূলতঃ গুপ্তচরবৃত্তির কাজে নিয়োজিত এসব পরামর্শদাতাদের মিশনগুলোর খরচ-পত্র চলে এদেশেরই টাকায়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অনেক সময় ঋণ-গ্রহীতা দেশটির প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ঋণের সুদ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করার অনুমতি দিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ঐ টাকা দিয়েই বিদেশী মিশনগুলির খরচ-পত্র চলে। দেশীয় তাবেদারদের সহায়তায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মাধ্যম তথা বই, চলচ্চিত্র, ফ্যাসন, গান এবং ড্রাগের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী ম্লো পয়জনিং করা হয় অবাধে। সামুদ্রিক এলাকায় সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে অঞ্চলগত চাপ সৃষ্টি করা হয়। যেহেতু এশিয়া আফ্রিকার বিশাল অঞ্চলব্যাপী মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলিতে রয়েছে খনিজ তেল ও গ্যাসসহ নানা রকম প্রাকৃতিক সম্পদ, এই সম্পদের দিকে আগ্রাসী থাবা বিস্তার করে আছে দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়ন। এদিকে শোষিত দেশগুলির শাসকগোষ্ঠী প্রায়শঃ নিজেদের জাতীয় স্বার্থ-পরিপন্থী পদক্ষেপ হিসেবে বিপুল পরিমাণ খনিজ-সম্পদ তুলে দিচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। যে খনিজ তেল শক্তির প্রধানতম উৎস তাই দেয়া হচ্ছে আদর্শগতভাবে যারা সবচেয়ে বৈরী তাদেরই হাতে। আজ অঞ্চল ভাগাভাগি করে নেবার এক পর্যায়ে সোভিয়েত রাশিয়া একটি মুসলিম দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে। আফগানিস্তান দখল করার পর শ্বেত-ভল্লুকের থাবা বিস্তারিত হয়েছে উপসাগরীয় অঞ্চলগুলির দিকে। এই এই উপসাগরীয় অঞ্চলেই বিশ্বের বৃহৎ তেল সম্পদ সঞ্চিত। সোভিয়েত রাশিয়ার আগ্রাসী আকাঙ্খা আজ এতদূর উদগ্র যে একটা সাংঘাতিক বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিয়েও সে এই পথে এগিয়ে চলেছে। এদিকে আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানকে নতুন করে অস্ত্র-সজ্জিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিদিন সোভিয়েত আগ্রাসনের শিকার হয়ে হাজার হাজার মুসলমান পাঠান উদ্বাস্তু আশ্রয় নিচ্ছে পাকিস্তানে। ফলে পাকিস্তান ও সোভিয়েত আশ্রিত আফগানিস্তান

www.pathagar.com

প্রতিদিন অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে এক ব্যাপক সংঘর্ষের দিকে। সম্ভাব্য এই সংঘর্ষ বিশ্বযুদ্ধকে দ্রুত ডেকে আনছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সবাই স্বীকার করবেন, মুসলিম দেশগুলির মধ্যে ঐক্যের প্রবনতার পাশাপাশি অনৈক্যের একটা গভীর প্রবনতাও রয়েছে ভেতরে ভেতরে। দুই পরাশক্তি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে এই প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ারই অঙ্গ হিসেবে কোটি কোটি টাকার মারণাস্ত্র বিক্রি করছে এই দেশগুলিতে, বিনিময়ে এসব দেশের অর্থনীতির প্রাণ-ভোমরা খনিজ তেলের ভাণ্ডার উজাড় করে নিয়ে যাচ্ছে নিজ নিজ দেশে।

আজ মুসলিম দেশগুলির বুকের উপর একখানা সুতীক্ষ্ণ ছোরার মতো বিঁধে আছে ইসরায়েল। প্যালেস্টাইনী মুক্তি সংগ্রামীদের সংগ্রামে মুসলিম বিশ্বের নৈতিক সমর্থন যতই থাক দুই পরাশক্তির বিভক্তিকর এবং শোষণকর এই নীতির স্বীকার হবার দরুন মুক্তি সংগ্রাম ব্যাপ্তী লাভ করতে পারছে না, প্যালেস্টাইনী মুসলমানদের সমস্যাও মিটছে না। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি লোকই আজ অনুভব করে এই ব্যর্থতার একমাত্র কারণ মুসলিম বিশ্বের অনৈক্য। অথচ অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস মুসলমানের আদর্শগত শিক্ষাই হলো, **'ঐক্যবদ্ধ হও বিভক্ত হয়ো না।'**

www.pathagar.com

'ঈশায়ী মুসলমান' সমাচার

বিশ্বব্যাপী মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধে চক্রান্তের শেষ নেই। এ চক্রান্ত আগেও ছিল এখনো আছে, হয়তো খেয়াল না করলে ভবিষ্যতেও থাকবে। বিশ্বের দেশে দেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতা-হীন করার জন্য, অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার জন্য এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে দেউলিয়া বানাবার জন্য শুধু একেশ্বরবাদ বিরোধীরাই নয়, কোরআন পূর্ব অন্য প্রধান তিন আসমানী কেতাবের অনুসারীরাও সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রকৃতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্প্রতি এ দেশীয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান ধ্বংস করার এক খৃষ্টীয় চক্রান্তের সূত্র আমাদের হস্তগত হয়েছে।

প্রায় দু'বছর আগে মরহুম মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'হক কথা' পত্রিকায় বিভিন্ন মিশনারীদের দ্বারা এ দেশের লক্ষাধিক গরীব মুসলমানের ধর্মান্তর গ্রহণের এক খবর ছাপা হয়েছিল। ঐ খবর প্রকাশিত হবার পর এ পর্যন্ত কেউ কোন প্রতিবাদ করেননি বিধায় ধারণা করা যায়, ঐ খবর ভিত্তিহীন ছিল না। প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছিল, বিদেশী মিশনারীরা গরীব ও সর্বহারা মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্মের প্রচার করে এবং ইহলৌকিক স্বার্থের আশা দিয়ে প্রতারণা করে তাদের ধর্মান্তরিত হতে প্রলুব্ধ করে। এক একজন মিশনারী সাহেব অশেষ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সংগে তাদের প্রচার কর্ম চালিয়ে থাকে।

বাংলাদেশে বর্তমানে শতাধিক বিদেশী সেবামূলক মিশন কর্মরত রয়েছে। আপাততঃ দৃষ্টিতে এদের কাজের মধ্যে কোন অন্যায় খুজে পাওয়া যায় না। এরা আর্তমানবতার সেবা করে। সেবার নামের ফাঁকে ফাঁকে তারা অনেকেই প্রচার কর্ম চালায়। এদের আচারে-ও স্বভাব মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা দিনে দিনে তাদের ঈমান হারাচ্ছে। ঈশায়ী সংখ্যা বাড়ছে—এর চেয়ে দুঃখজনক

www.pathagar.com

ঘটনা আর কিছু নেই। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইংরাজ ঈশায়ী বণিকেরা (গাবরিল বাউটন) সেবার নামে সম্রাট শাহজাহানের নিকট থেকে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার নিয়েই রাজ্য স্থাপন করেছিল। হজরত রসুলে মকবুল (সঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর অত্যন্ত ধৈর্য ও কষ্ট-সাহিষ্ণুতার সঙ্গে যখন ইসলাম প্রচার করছিলেন, সে সময় এক-জন অবিশ্বাসী দলপতি বিস্ময় ও উষ্মাভরে জিজ্ঞেস করছিল কারা আবদুল্লাহর ব্যাটা মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করছে? তার উত্তরে বলা হয়েছিল, যারা গরীব বিশ্বাসী এবং যারা ইনসাফ পায়নি তারাই দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। কি অদ্ভুত পরিহাস, আজ ইসলাম ত্যাগ করে যারা ঈশায়ী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করছে তারাও গরীব ও বিশ্বাসী এবং হয়তো বা তারাও ইনসাফ বঞ্চিত। বলাবাহুল্য এটা একান্তই আমাদের ঘরের কথা, নিজেদের দুঃখ নিজেদের মধ্যে বলা-বলি করার কথা। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে আমাদের বলবার কথা হলো, এই ধরণের চক্রান্ত আদৌ চলতে দেওয়া হচ্ছে কেন? কেন এর প্রতিবিধান করা হচ্ছে না?

ধর্ম হিসাবে এ যাবত পৃথিবীতে যত ধর্ম এসেছে তার মধ্যে ইসলাম ধর্ম শ্রেষ্ঠ, এটা মানব জাতিকে বিশ্বাস করতে হবে। এটা আমাদের ঈমানের অঙ্গ। ইসলাম ত্যাগ করে যে ব্যক্তি অন্য ধর্মমত গ্রহণ করেছে, সে নিশ্চয় অধঃপতিত এটাই আমাদের বিশ্বাস। কাজেই যারা আমাদের দেশের নিরীহ ধর্মপ্রাণ গরীব লোকদের ঈশায়ী ধর্মে দীক্ষিত করেছে বা করার চেষ্টা করছে, তারা আমাদের মিল্লাতের একাংশকে অধঃপতিত করছে। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করা এখনই উচিত। যতক্ষণ এই চেষ্টায় আমরা সর্বপ্রযত্নে নিয়োজিত না হচ্ছি, ততক্ষণ আমরা আমাদের ঈমানকেই বিনষ্ট করার তৎপরতায় শামিল হচ্ছি।

ইসলাম অন্য সব ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠ এটা কি শুধুমাত্র একটি ঘোষণা? নিশ্চয়ই নয়। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত বিশ্বাসের দিক দিয়েও ইসলাম শ্রেষ্ঠ কারণ, ইসলাম বিশ্বাস করে স্রষ্টা এক এবং অনন্য। তিনি কাউকে জন্ম দেননি তিনি কারও দ্বারা জাতও নন। কিন্তু খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে যীশু খৃষ্ট খোদার পুত্র। যেহেতু যীশু খোদার পুত্র অতএব বিশ্ব পিতার পুত্রের অধিকারে সে দুনিয়ার তাবৎ

www.pathagar.com

পাপী-তাপীকে উদ্ধার করার শক্তি রাখে। ইসলাম অনুসারে স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের এই পিতা-পুত্র সম্পর্কিত ধারণা অতিশয় ভ্রান্ত। তাছাড়া মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলাম যে ব্যবস্থা প্রস্তাব করে তা একাধারে যেমন বাস্তব, তেমনি ন্যায়ানুগ। ইসলামকে বলা হয় একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলামের বিধান কার্যকরী হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে কোন বৈরিতা থাকে না। অন্যপক্ষে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বৈরিতা বিনষ্ট হলেই কেবল ইসলামী বিধান কার্যকরী করা সম্ভব হয়।

বর্তমানে জাতির অভ্যন্তরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈরিতা, জাতিতে জাতিতে বৈরিতা জিইয়ে রাখার এবং সে বৈরিতাকে আরো বাড়িয়ে দেবার বিশ্বব্যাপী তৎপরতা চালানো হচ্ছে। ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হলে এ বৈরিতা থাকবে না বলেই যারা মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে বৈরিতার দ্বারা ফায়দা হাসেল করতে চায়, তারা সর্ব প্রযত্নে ইসলামকে কিংবা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রয়াস পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলাম এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির সম্পদ লুণ্ঠনকে কোন ভাবেই সমর্থন করে না। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইউরোপের খৃষ্টধর্মাবলম্বী শিল্পোন্নত জাতিগুলি ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন মুসলিম দেশসমূহের বিশেষ করে অনুন্নত মুসলিম দেশসমূহের জনগণের ঈমান নষ্ট করে খৃষ্ঠীয় ও ইহুদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার হীন উদ্দেশ্যে বিরামহীন অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের উপজাতীয় অধ্যুষিত পার্বত্য এলাকায় ইতিমধ্যেই অধিকাংশ লোক খৃষ্টান ধর্মগ্রহণ করেছেন। এটা হয়েছে আমাদের দায়িত্বশীল লোকদের গাফিলতির দরুন, তাতে সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মোমেনশাহীর গারো পাহাড়ে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক অধিবাসীদের অধিকাংশ বৃটিশ শাসনামলে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহন করে। বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলমানদের পরে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এর পর খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠলে এদেশে খৃষ্ঠীয় বিশ্বের দ্বারা যে নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদী চাপের সৃষ্টি হবে তা মোকাবিলা করা হবে খুবই দুরূহ। কাজেই আমাদের আর মোটেই কালবিলম্ব না করে এই খৃষ্ঠীয় চক্রান্তকে রুখে দাঁড়ানো দরকার।

www.pathagar.com

আমরা দেখছি দুশো বছরের ইংরেজ শাসনে অবিভক্ত ভারতের বিপুল সংখ্যক নিম্নবর্ণের হিন্দু খৃষ্টধর্মে দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তর গ্রহণ করে খৃষ্টান হয় খুবই নগন্য সংখ্যক লোক। মুসলমানদের খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য দেখিয়ে খৃষ্টান করা সম্ভব নয়। কারণ পরলোক বিশ্বাস, শেষ বিচার বেহেশত-দোজখের ধারণা কিংবা ইহজগতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক-যে কোন দিক দিয়েই ইসলাম ধর্ম খৃষ্টান ধর্মের তুলনায় অতি উৎকৃষ্ট। কাজেই প্রত্যক্ষ প্রচারের মাধ্যমে মুসলমানকে খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত করা সম্ভব নয় বলে এদেশে কর্মরত খৃষ্টান মিশনগুলো গোপনে নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে একটা অভূতপূর্ব উপায় উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছে। তারা খৃষ্টধর্মের পরিবর্তে প্রচার করছে নতুন একটা ধর্ম। এই ধর্মের নাম দিয়েছে তারা 'ঈশায়ী মুসলমান'। ঈশায়ীরা প্রচার করছে মুসলিম বিশ্বাস অনুসারে হজরত ঈসা (আঃ) একজন নবী। তার উপর চারখানি আসমানী কিতাবের অন্যতম 'ইঞ্জিল শরীফ' নাজেল হয়। যীশুখৃষ্টের সম্পর্কে এ দেশের লোকের যাই ধারণা থাকুক, হজরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে সকলেরই বিশ্বাস তিনি আল্লাহর নবী, কাজেই মুসলমান। খৃষ্টান মিশনারীরা এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ঐ বিশ্বাসের উপরই জোর দিচ্ছে, বলছে, হযরত ঈসা (আঃ) যেহেতু আল্লাহর একজন নবী, কাজেই ঈশায়ী মুসলমান হওয়া অনৈসলামিক কিছু নয়।

অনুমান করা যায়, ঈশায়ী মুসলমান এই ধারণা খৃষ্টান মিশ-নারীদের মাথায় নতুন উপজাত হয়নি। এর উপর নিশ্চয় তারা অনেক গবেষণা, চিন্তাভাবনা করছে এবং শেষ পর্যন্ত ধাপে ধাপে মুসলমানকে অবিশ্বাসী বা খৃষ্টান বানাবার প্রাথমিক পদ্ধতি হিসেবে এই উপায় সাব্যস্ত করেছে। প্রথমতঃ মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতনের পর্ব সমাধা করার পর তারা বর্তমানে এই উপায় অবলম্বন করছে। কারণ সরাসরি খৃষ্টান ধর্মবিশ্বাস নয়, অথচ মুসলিম বিশ্বাসের সঙ্গে এর আঙ্গিকগত সঙ্গতিও আছে। অতএব এই উপায়টি কার্যকরী করার সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল। মিশনারীদের কাছে ঈশায়ী মুসলমান একটি টেস্ট টিউব। এটি মুসলমানদের চূড়ান্ত ভাবে খৃষ্টান বানাবার সুচিন্তিত ও সুসংগঠিত একটি উপায়।

www.pathagar.com

অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, পূর্বে বাইবেল ও খৃষ্টীয় প্রচার পুস্তকাদি অনুবাদ করার সময় শব্দ ব্যবহার করা হতো যা এ দেশের হিন্দু ও উপজাতীয় লোকদের সহজে বোধগম্য হয় এভাবে। যেমন প্রভু, প্রার্থনা, শিষ্য, ঈশ্বর, স্বর্গ ইত্যাদি। বাংলাদেশের খৃষ্ট বিশ্বাসীদের সঙ্গে মুসলমানদের কোন সাংস্কৃতিক বা অন্য ধরনের যোগাযোগ ছিল না। শোনা যায় এজন্য বাংলাদেশস্থ খৃষ্টান মিশনারীরা ১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে ঢাকায় মিলিত হয়ে নতুন কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করে। তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের বোধ্য ও অন্তরঙ্গ পুরাতন ও নতুন টেস্টামেন্টের (বাইবেল) বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এবং হিন্দু শব্দ প্রধান পুরাতন অনুবাদ ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে যতশীঘ্র সম্ভব নতুন অনুবাদ প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়। 'ঈশায়ী মুসলমান' এই মত হিন্দু ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের কাছ থেকেও গোপন রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

ইতিমধ্যে এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত মুসলমানী ভাষায় 'ইঞ্জিল শরীফ' আল জাবুর, আল তাওরাত, ঈশাইয়াত ও বহু সংখ্যক প্রচার পুস্তিকার অসংখ্য কপি এদেশের বিভিন্ন প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছে। এমন কিছু কিছু প্রচার পুস্তিকা মুদ্রিত হয়েছে যাতে প্রকাশকের বা মুদ্রাকরের নাম নেই। কিছু কিছু নতুন প্রচার পুস্তিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, ভারত, হংকং, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া থেকে ছাপিয়ে আনা হয়েছে। এ সব পুস্তিকায় যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার কিছু নমুনা দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। পুরানো অনুবাদঃ ঈশ্বর, প্রভু, প্রার্থনা, গীর্জা, ফাদার, ঈশ্বর পুত্র, শিষ্য, স্বর্গ, উপবাস, শুভেচ্ছা, বাইবেল, ডেভিড। নতুন অনুবাদঃ খোদা, আল্লাহ, মোনাজাত, এবাদত-খানা, ইমাম, নবী, ছাহাবা/উম্মত, বেহেশত, রোজা, সালাম, বাইবেল শরীফ, দাউদ।

বলাবাহুল্য এসব শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো ধর্মপ্রাণ সরলচিত্ত মুসলমানদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ধীরে ধীরে নিজেদের অভিষ্ঠের দিকে পরিচালিত করা।

মুসলমানরা যেহেতু আরবী ভাষাকে অত্যন্ত সম্মান করে, কাজেই বিধর্মী ঈশায়ীরা বাইবেলের আরবী অনুবাদ প্রচার করার উদ্যোগও গ্রহণ করেছে।

www.pathagar.com

যতদূর জানা গেছে—ঈশায়ী মুসলমানরা উপাসনার কিছু নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এদের উপাসনাস্থান হলো 'ইবাদতখানা'। প্রতি শুক্রবার বিকালে তারা ইবাদতখানায় সমবেত হয়। তৎপূর্ব যথাবিহিত অজুও করা হয় এবং মিম্বরে উপবিষ্ট ইমাম কর্তৃক পঠিত 'বাইবেল শরীফ'-এর পাঠ শ্রবণ করা হয়, উপাসনা শেষে মোনাজাত করা হয়। তার মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, এর ছওয়াব হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর রূহের পরিবর্তে ঈসা (আঃ) এর রূহের উপর বকশানো হয়।

বাংলাদেশে এ ধরনের দুটো 'ইবাদখানার' সন্ধান জানা গেছে। একটি ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে। এর পরিচালকের নাম মিঃ ডেভিড বা জনাব দাউদ। অন্যটি টাঙ্গাইলে। এটির দায়িত্বে রয়েছেন মিঃ রবিনসন। এসব ইবাদত খানায় মোনাজাত অন্তে 'বাইবেল শরীফ' থেকে অংশ বিশেষ পাঠ ও ভাবার্থ ব্যাখ্যা করা হয়। এবং উপস্থিত 'মুসল্লিদের' যদি কোন বিষয়ে সংশয় থাকে তবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করতে বলা হয় এবং তার উত্তর প্রদান করা হয়। ঈশায়ী ইবাদত-খানার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে,—খৃষ্টীয় চার্চের মত এখানে যীশুর কোন ফটোগ্রাফ রাখা হয় না। এবং যে কোন ফটোগ্রাফ রাখাকে ইসলামের বিধি অনুসারে অবৈধ বলে মনে করা হয়।

ঈশায়ী মুসলমানদের যে সব বিশেষ বৈশিষ্ট্য অবগত হওয়া গেছে তা হলো,—এরা পরস্পরে মিলিত হয়ে সালাম বলবে এভাবে আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক অথবা বলা হয় 'ইম্যানুয়েল' অর্থাৎ খোদা তোমার সঙ্গে অবস্থান করুন। ঈশায়ী মুসলমানরা সাধারণ খৃষ্টান-দের মত গলায় ক্রস চিহ্ন ধারণ করে না। এরা সরল সাদামাটা জীবন-যাপন পছন্দ করে। আমাদের দেশের সাধারণ জনগণের মত কুঁড়ে ঘরে বাস ও বিলাসবর্জিত খাদ্য গ্রহণ করে। এরা অবৈধ নারীসঙ্গ ও মদ্যপানকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মতই এরা হালাল ও হারাম রুজি সম্পর্কে খুবই সচেতন। ঈশায়ী মুসলিম ধর্মে দীক্ষার পর প্রত্যেকের মুসলমানী নাম চালু থাকে। ধর্ম-পুস্তক পাঠের সময় মুসলমানদের মতই এরা দেহে মনে পবিত্র ভাব পরিগ্রহ করে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে এযাবত মোট ৭৩টি কার্যরত খৃষ্টান মিশনের খোঁজ পাওয়া গেছে। এর বাইরে আরো থাকতে পারে। বস্তুতঃ এটা খুব ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা গেছে যে, 'ঈশায়ী মুসলিম' এই ধর্মমত প্রচার করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে ধাধার সৃষ্টি করা এবং পরিণামে স্বধর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেয়া। বর্তমানে সারা বিশ্বে খৃষ্টান ও ইহুদীরা মুসলিম মিল্লাতের ধ্বংস সাধণের জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে কঠোর ও নমনীয় কিছু উপায় অবলম্বন করেছে! বিশ্বের ৪০টির মত মুসলিম দেশের প্রায় ১০০ কোটি মুসলমানকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করার জন্য কখনো যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে, কখনো শান্তির বুলি আওড়িয়ে বিভ্রান্ত করছে, কখনো ইসলাম সদৃশ অথচ মর্মবস্তুর দিক দিয়ে ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এক নতুন ধর্মমত প্রচার করে মুসলমানদের ঈমান ধ্বংস করার জন্য তৎপরতা চালাচ্ছে।

কথায় বলে সময়ের এক ফোড় অসময়ের সাত ফোঁড়ের সমান —আমরা যদি উদ্যোগের পূর্বেই ঈশায়ী মুসলমানদের প্রচার কর্ম বন্ধ করতে না পারি, অনিবার্যভাবেই এর পরিণাম আমাদের জাতির জন্য হবে মারাত্মক।

কাজেই সরকারী বেসরকারী নির্বিশেষে সকল দায়িত্ববান মুসলমানকেই এই সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসা দরকার বলে মনে করি।

ঈশায়ী পাদ্রীরা যতই কৌশলী হন না কেন—আল্লাহ তার চেয়ে আরও বড় কৌশলী—নিশ্চয়ই তিনি এই বিভ্রান্তকারীদের চক্রান্ত নস্ট করে দেবেন।

www.pathagar.com

ইসলামী সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি

সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেল, সরকার মন্ত্রী পর্যায়ের এক বৈঠকে দেশে 'ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি' নামে একটি কেন্দ্র খুলবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বর্তমান সরকার যে ইসলামের প্রতি খুবই অনুরাগী এই ঘটনায় তা নতুন করে প্রমাণিত হলো।

অবশ্য বর্তমান সরকার ১৯৭২ সালের সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির-রাহমানের রাহীম সংযোজন করে ইতিপূর্বেই ইসলাম প্রীতির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়েছেন, তথাপি ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি বলতে আসলে কি বুঝায়, উক্ত বৈঠকে তা ব্যাখ্যা করা হয়নি বলে অনেকের মনেই সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ রয়ে গেছে। ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি সে আবার কি বস্তু? দেশের ৯০% শতাংশ মানুষ মুসলমান বলেই কি রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো? না হলে দেশে শিল্প সংস্কৃতির যে চর্চা এখন চলেছে তার মধ্যে 'ইসলাম' শব্দটি লিখতে যে অক্ষর গুলি লাগে তার একটার অস্তিত্বও কি আছে?

আলোচনা শুরুর আগে আলোচনার পক্ষে খুবই প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় ফয়সালা করে নেয়া দরকার বলে মনে করি। ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি কথাটার অর্থ কি? পৃথিবীর নানা দেশের ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসী লোকেরা যে শিল্প সংস্কৃতি চর্চা করে বা অতীতে করেছে এবং পৃথিবীর নানা স্থানের মুসলমানেরা যে সংস্কৃতির অনুসরণ করে বা অতীতে করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে—তাই ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি, নাকি যে শিল্প সংস্কৃতির বিষয়বস্তু ইসলাম বা ইসলামী দর্শন, তাকেই ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি বলা হবে? ইসলাম ও 'মুসলমান' এই শব্দ দুইটি যে এক নয় তা আশা করি সবাই বোঝেন। মুসলমান একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম যারা ইসলামের দর্শন গ্রহণ করেছেন, অন্যপক্ষে ইসলাম হলো একটি দর্শম বা আদর্শ। সারা বিশ্বে মুসলমানদের শিল্প সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস খুবই পুরানো এবং সমৃদ্ধ। ইতিহাসের

www.pathagar.com

মধ্যযুগে মুসলমানরা জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখায় অবাধ বিচরণ করেছিল এবং আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যে প্রথম সোপান তাও নির্মিত হয়েছিল মুসলমানদের হাতেই। সমসাময়িক ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মুসলমানরা সব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। একের পর এক তারা রাজ্য জয় করেছিল এবং বিজিত রাজ্যগুলিতে স্থাপন করেছিল স্থাপত্য ও অন্যবিধ নানা কীর্তি। এসব কীর্তির নিদর্শন সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছে। কালের প্রভাবে অনেক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু যা টিকে আছে তার পরিমাণও কম নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মুসলমানরা স্পেনে অনেক বড় বড় সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল এবং দিল্লীতে আগ্রায় ও বিহারের সাসারামে এমন কি বলতে গেলে উপমহাদেশের সর্বত্র নির্মাণ করেছিল অনেক অত্যাশ্চর্য ইমারত! মোগল আমলে মুসলমানদের চিত্রকলারও অনেক বিকাশ সাধিত হয়েছিল। বিকশিত হয়েছিল সঙ্গীত এবং সঙ্গীত বিদ্যা। এবং যেহেতু স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীত মোটের উপর শিল্প সংস্কৃতিরই বিষয়ভুক্ত, কাজেই মুসলমানদের হাতে গড়া এই শিল্প সংস্কৃতিকে অনেকে ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি বলে বুঝে থাকেন অথবা ইসলামী শিল্প সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে ঐগুলিকেই হাজির করে থাকেন। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে, শিল্প সংস্কৃতির নির্মাতা মুসলমান হলেই তা 'ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি' হয়ে যায় না, তা হওয়াও সম্ভব নয়; কারণ যে শিল্প সংস্কৃতির মর্মবস্তু ইসলামী দর্শন বা আদর্শ নয় তাকে মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসী লোকের দ্বারা নির্মিত হলেই ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি বলে স্বীকার করতে হলে 'ইসলাম' শব্দেরই তাতে অর্থ বিপত্তি ঘটবে। এবং সেটা কোন ভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইসলাম একটি দর্শন আর 'মুসলিম' একটি জাতিসত্বা। মুসলমানদের দৈনন্দিন প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনে এবং ভৌগোলিক ভিত্তিতে শিল্প সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। কয়েক যুগ ধরে ইসলামের নামে নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে আরো উঠবে, যেমন 'ইসলামিক গেম' 'ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স, 'ইসলামিক ব্যাঙ্ক' ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। 'ইসলাম'কে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগ করার একটা গুঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে বলে

www.pathagar.com

প্রতীয়মান হচ্ছে। ইসলামকে বাদ দিয়ে 'মুসলিম' শব্দটি ব্যবহারের জন্য আরজ করছি।

কাজেই আমাদের দেশের সরকার ইসলামী শিল্প সংস্কৃতির ব্যাপক নির্মাণ ও চর্চার উদ্দেশ্যে যখন ইসলামী শিল্প সংস্কৃতির কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন তখন খুব সঙ্গত কারণেই এ সম্পর্কে আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে পারিনে। আমাদের দেশের শিল্প সংস্কৃতির নানা সংস্থা চালু আছে। এদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় প্রধান। এক সম্প্রদায় মনে করে শিল্প সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হলো বিনোদন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বা এসব কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের মূল প্রেরণা হলো আনন্দ, আনন্দলাভ এবং আনন্দদান। অন্য সম্প্রদায়ের বিশ্বাস শিল্প সংস্কৃতি হলো, জীবন সংগ্রামেরই অভিব্যক্তি এবং অস্ত্র। মানুষ সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করে জীবন রক্ষার তাগিদে এবং জীবনকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে মহত্তর ব্যাপ্তি দেবার জন্যই মানুষ রচনা করে শিল্প সংস্কৃতি। আমাদের দেশের এবং পৃথিবীর নানা অঞ্চলের বস্তুবাদে বিশ্বাসী লোকেরা আরও এক পা অগ্রসর হয়ে বলে থাকেন, শিল্প সংস্কৃতি হলো উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্কের উপরি কাঠামোগত অভিব্যক্তি। যে দেশের মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক যেমন সে দেশের মানুষের শিল্প সংস্কৃতি ও তদনুরূপ। এই ব্যাখ্যা-গুলির মধ্য থেকে শিল্প সংস্কৃতির বিনোদনমূলক ব্যাখ্যাকে আমরা প্রথমেই বাতিল করে দিতে পারি এই জন্য যে, ইসলাম নিছক বিনোদনের জন্য কোন সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করে না। ইসলামী আদর্শ অনুসারে কোন কিছুই উদ্দেশ্যহীন নয়, এবং সর্ব মানবের হিত ছাড়া সামাজিক কার্যকলাপের অন্য কোন অভিপ্রায় ও ইসলাম অনুমোদন করে না। আমরা অতএব দ্বিধাহীন চিত্তেই এই আশা পোষণ করতে পারি যে, আমাদের দেশের সরকার দেশে ইসলামী শিল্প সংস্কৃতির কেন্দ্র খুলতে মনস্থ করেছেন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও জীবন দর্শনকে এবং সর্বোপরি ইসলামী মূল্যবোধকে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রেখেই, কারণ দেশে যে শিল্প সংস্কৃতির চর্চা এখন চলছে তার সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক

www.pathagar.com

নেই, শুধু তাই নয়, বরং তা একাধারে যেমন বিজাতীয় তেমনি তা ইসলামী জীবন দর্শন ও মূল্যবোধের বিরোধী। উল্লেখ না করলেও চলে যে দেশে শিল্প সংস্কৃতির কেন্দ্রের কোন অভাব নেই। এবং বাংলাদেশ হবার পর দেশে একেবারে দাদুরী ছত্রের মত যত্রতত্র সংস্কৃতির সংখ্যাহীন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর তার একটার সঙ্গেও আমার কোন সম্পর্ক নেই বলে আমাকে কণা মাত্র অনুতাপে বিদ্ধ হতে হয় না। আমরা জানি, দেশের সরকার অনেক সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে নানা রকম বৈষয়িক সহায়তা দিয়ে থাকেন এবং এই সহায়তাকে আরও সংহত করার জন্য শিল্পকলা একাডেমীর মত বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানও খোলা হয়েছে। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে, নতুন করে 'ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি' কেন্দ্র খুলবার পেছনে নিশ্চই ব্যতিক্রমী কোন উদ্দেশ্য আছে এবং সেটি আমরা উপরে যেমন অনুমান করছি সে রকমটি না হয়ে যায় না।

বস্তুতঃ এই আশাবাদের সঙ্গে সঙ্গে একটা নৈরাশ্যের আশংকাকেও আমরা উড়িয়ে দিতে পারিনে এই জন্য যে যথার্থ অর্থে যাকে ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি বলা চলে তেমন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পৃথিবীর কোথাও পরিলক্ষিত হয় বলে আমাদের জানা নেই। অর্থাৎ ইসলামের অন্যতম মূলনীতি 'ইনসাফ' ও 'আদল' এর উপর ভিত্তি করে কোথাও সংস্কৃতির পত্তন করা হয়নি। ইসলাম একটি আদর্শ, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এর মূলনীতি হলো—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জগতের বাহিরে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সার্বভৌম শক্তির অধিকারী নয়। এবং একমাত্র আল্লাহ-ই সমুদয় সম্পদের মালিক। মানুষ সম্পদের আমানতদার মাত্র, কোন অর্থেই মালিক নয়। এই মূলনীতিকে কেন্দ্র করে এবং এই নীতির আলোকে মানুষের ঐহিক ও আত্মিক বিকাশ সাধনের জন্য বিশেষ ভাবে যে শিল্প সংস্কৃতি নির্মান করা হবে তাকেই কেবল ইসলামী সংস্কৃতি বলে স্বীকার করা যাবে।

কিন্তু এ রকম শিল্প সংস্কৃতি নির্মাণের জন্য অনুকুল পরিবেশ কি আমাদের দেশে আছে? পৃথিবীর কোন দেশেই কি আছে? বলা বাহুল্য তার উত্তর নেতিবাচক। অবশ্য এও সত্য যে পরিবেশ নেই

www.pathagar.com

বলেই ইসলামী শিল্প সংস্কৃতি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও সমাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আজ দেশে ইসলামী শিল্প সংস্কৃতির কেন্দ্র খুলতে গেলে নানাদিক থেকে বাধা আসবে। বিশেষ করে দেশে যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জোয়ার চলেছে তাকে এক কথায় বলা যায় অপসংস্কৃতি। এই অপসংস্কৃতির জোয়ারের বিরুদ্ধে ইসলামী শিল্প সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে করতে হবে যুদ্ধ ঘোষণা, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। কাজেই এই কেন্দ্রের জন্মটাই হতে যাচ্ছে দেশের প্রচলিত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার অঙ্গীকার নিয়ে। অবশ্য একথা ঠিক যে, দেশের বিপুল জনগোষ্ঠির মধ্যে ইসলামী শিল্প সংস্কৃতির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রতি দারুণ আগ্রহ রয়েছে যদিও সে আগ্রহ নানা কারণে এখন সুপ্ত। দেশের মানুষ বিজাতীয় ধ্যান ধারণার শিল্প সংস্কৃতি, নাচ, গান, নাটক, সিনেমা ইত্যাদির প্রদর্শনী দেখে দেখে কিংবা না দেখেও জাতীয় প্রচার মাধ্যমে এর সম্প্রচারে অতিষ্ঠ হয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে, দেশের মানুষ চায় এই অপসংস্কৃতির কার্যকলাপ বন্ধ হোক। কিন্তু বন্ধ হওয়া দুরে থাক দিন দিন-এর দৌরাত্ম্য বাড়ছেই। বিদেশ থেকে আমাদের মূল্যবোধ বিধ্বংসী ছায়া-ছবি ভিসি আর ক্যাসেট ইত্যাদি দেদার আমদানী হচ্ছে; কখনো চোরা পথে কখনো বা সরকারের অনুমোদন নিয়েই। আমরা বুঝতে পারছি না ইসলামী মূল্যবোধ বিধ্বংসী কার্যকলাপ বন্ধ না করে দেশে ইসলামী শিল্প সংস্কৃতির কেন্দ্র খুলে সরকার কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে চাচ্ছেন। চরিত্রও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে দুই মেরুতে অবস্থানকারী এই দুই প্রকার শিল্প সংস্কৃতির সহাবস্থান কি আদৌ সম্ভব? আল্লাই মালুম, এই স্ববিরোধী প্রচেষ্ঠা কত দুর সফল হবে!

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, পৃথিবীর কোন মুসলিম অধ্যুষিত দেশেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আদলে সমাজ বা রাষ্ট্রের জীবন চালিত হচ্ছে না। বিপুল প্রাকৃতিক ও জনসম্পদের অধিকারী হয়েও মুসলিম প্রধান দেশগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ইসলাম বিরোধী ধ্যান ধারণার ধারক, দুই পরাশক্তির কোন না কোনটার তাবেদারী করে জাতীয় স্বার্থহীনতার জঘন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। বার বার মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলি ঐক্যের কথা বলছে কিন্তু ঐক্য স্থাপিত হচ্ছে না। দেশের বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকাংশ ব্যয়

www.pathagar.com

করা হচ্ছে সমরোপকরণ ক্রয় করে। আমেরিকা আর রাশিয়ার যুদ্ধ সরঞ্জাম বিক্রির স্থায়ী বাজারে পরিণত হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি। এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার অনেক কারণ থাকতে পারে—তবে সবচেয়ে প্রধান কারণ এই যে, ইসলামী আদর্শ ভুলে বিজাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য বাংলাদেশ ও এই প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। কাজেই এই চরম নৈরাশ্য-জনক পরিস্থিতিতে দেশে ইসলামী শিল্প সংস্কৃতির কেন্দ্র খোলা হচ্ছে এই খবরে আমরা খুব আশান্বিত হচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সন্দেহের কথাটাও উল্লেখ না করে পারছিনে। পৃথিবীতে ৪০টির বেশী মুসলিম প্রধান দেশ আছে এবং আমীরাত, সুলতানাত, বাদশাহীয়াত, খেলাফৎ প্রজাতন্ত্র ইত্যাকার অবিধার পশ্চাতে 'ইসলামী' বিশেষণযোগে রাষ্ট্র আছে ডজন খানেকের ওপর। কিন্তু ইসলামী শিল্প সংস্কৃতির চর্চা কোথাও হয় বলে কেউ বলতে পারবেন না। এই দেশগুলি একই ধর্ম বিশ্বাস, জাতি-সত্বার মোটামোটি একই উৎস, ভাষা, জীবন-যাপন পোশাক পরিচ্ছদসহ বহুবিধ অভিন্ন বিষয়ের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও।

www.pathagar.com

ওরা স্ববশে নেই

(ইরান ইরাক যুদ্ধ)

ইতিপূর্বে আগষ্ট এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে নানা তথ্য প্রমাণ দিয়ে যে আশংকা প্রকাশ করেছিলাম তা সত্যে পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দু'টি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ ইরান ও ইরাক এক নিদারুণ লোক ও সম্পদ ক্ষয়কারী সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। যুদ্ধ ৫ম সপ্তাহ অতিক্রম হতে চললো, এখনো শেষ হবার কোন লক্ষণ নেই। রাষ্ট্র দু'টির একটি অথবা দু'টিরই যুদ্ধ করবার ক্ষমতা নিঃশেষ হবার পূর্ব পর্যন্ত হয়তো এ যুদ্ধ শেষ হবেও না।

কিন্তু কেন এই যুদ্ধ? শাতিল আরব ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের উপর দখল কায়েম করার জন্য কি এই যুদ্ধ? নাকি আধুনিক বিশ্বের সকল যুদ্ধের যারা হোতা, সেই সম্রাজ্যবাদী পরমাশক্তিদ্বয়ের বিশ্বসমর নীতির অঙ্গ হিসেবেই অনুষ্ঠিত হলো এই ভ্রাতৃঘাতী সমরায়োজন? যুদ্ধরত ইরাক ও ইরানের মধ্যে সীমান্তবর্তী কিছু কিছু এলাকা নিয়ে বিরোধ ছিল দীর্ঘদিনের এবং একাধিক চুক্তির মাধ্যমে সে বিরোধের একটা নিষ্পত্তিও হয়েছিল মরক্কোর মধ্যস্থিতায়, কিন্তু হঠাৎ সেই বিরোধ সার্বিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ার মত এমন প্রবল হয়ে উঠলো কেমন করে। অনেকে অনুমান করেছেন, ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫২ জন কুটনীতিককে জিম্মি হিসাবে প্রায় বছর খানেক আটক করে রেখেছে আর যুক্তরাষ্ট্র নানা ভাবে চেষ্টা করেও সেই জিম্মি সমস্যার সমাধান করতে না পেরে ইরাককে দিয়ে ইরান আক্রমন করিয়েছে। বাস্তব কিছু কিছু ঘটনার সঙ্গে অবশ্য এ অনুমানের কোন অসঙ্গতি নেই। তবে ইরাক ইরান যুদ্ধের পেছনে আমেরিকার জিম্মি সংকট সমাধানই প্রধান লক্ষ্য হতে পারে না জিম্মি সংকটের চেয়েও উপসাগরীয় তেল সমৃদ্ধ অঞ্চল গুলোর উপর নিজের আধিপত্য বজায় রাখার সমস্যাই বস্তুতঃ তার প্রধানতম সমস্যা। অন্যদিকে উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল

www.pathagar.com

ক্ষেত্রগুলোর উপর শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চির বৈরী সোভিয়েট রাশিয়ারও। কারণ আধিপত্যবাদী ভোজ সভায় পরে এসে জুটলেও সোভিয়েট রাশিয়া চায় উপসাগরীয় তেল ক্ষেত্রগুলোর উপর আধিপত্য কায়েম করতে। অন্যথায় বিশ্বের সর্বাধিক তেলসমৃদ্ধ অঞ্চলটি বেহাত হয়ে গেলে সোভিয়েট রাশিয়ার তথা কথিত সমাজ-বাদী অর্থনীতির লেবেলে যুদ্ধ অর্থনীতি বিধ্বস্ত হবারই আশংকা। কাজেই ইরাক ইরান যুদ্ধের পেছনে কোন পরাশক্তির প্ররোচনা কতটুকু সেই সূক্ষ্ম হিসেবে না গিয়ে আমরা এক কথায় ধরে নিতে পারি, যেহেতু এই যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধমান দু'টি দেশের কেউই লাভবান হচ্ছে না, অপর পক্ষে লাভবান হচ্ছে পরাশক্তি দু'টিই, কাজেই পরাশক্তি দুটিই এই যুদ্ধের পশ্চাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে, তাতে কারো সন্দেহ করা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো ঃ জনাব খোমেনী ও প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কি আধিপত্যবাদী পরাশক্তিদ্বয়ের গুঢ় অভিসন্ধি সম্পর্কে সম্যক অবগত নন ?

আমরা জানি, মধ্যপ্রাচ্যের বিগত কয়েক দশকের ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে যার সম্পর্ক আছে বা ছিল, পরাশক্তিদ্বয়ের অভিসন্ধি তার পক্ষে না বোঝার কথা নয়। খোমেনী সাহেব তার চুল আর দাড়ী পাকিয়ে ফেলেছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত মিত্র শাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কাজেই সম্রাজ্যবাদ কি জিনিস তাঁর তা ভালই বোঝা উচিত। এ দিকে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনও তার নাতিদীর্ঘ রাজ-নৈতিক জীবনে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কম অবহিত হন নাই। তথাপি সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্খার সঙ্গে সম্যক পরিচিত থেকেও মুসলিম নেতৃদ্বয় আজ এমন এক আত্মনাশকারী যুদ্ধে লিপ্ত হলেন কি করে সেটাই আমাদের বিস্ময়।

ইরান ও ইরাক দুটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। দুটি দেশেরই শাসক মুসলমান। জনাব খোমেনীর দাবী তিনি ইরানে ইসলামী বিপ্লব "সম্পন্ন' করেছেন। এই বিপ্লবকে রক্ষা করাই তার প্রধান দায়িত্ব। বলতে হয় তার 'জীবনের লক্ষ্য'। কিন্তু ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার অর্থ কি তবে এই যে, ইরাক ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিরোধী ? আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুসলিম জাহানের নেতৃস্থানীয় সউদী আরব,

www.pathagar.com

জর্দান, মিসর প্রমুখ দেশগুলো ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইরাককে সমর্থন করেছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে যে সব দেশ পছন্দ করে না তার মধ্যে সউদী আরব জর্দান ও মিশর অন্যতম। হয়তো আরও কিছু বাদশা ও আমিরাত শাসিত মুসলিম দেশ এই গোষ্ঠিতে আছে।

কিন্তু কে পক্ষে আর কে বিপক্ষে এর চেয়েও অন্য একটি প্রশ্ন আজ গুরুত্বপুর্ণ। মুসলিম বিশ্বের দাবীদার ৪০টি দেশের মোট প্রায় ১০০ কোটি লোক আজ নিজেদেরকে একটি শক্তি বলে ভাবতে ভালবাসে। এই অনুভব অবশ্যই কোন অবাস্তব ব্যাপার নয়। কারণ প্রায় ১০০ কোটি লোক যদি অভিন্ন অনুভূতি নিয়ে; 'আশহাদু-আল্লা-ইল্লাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াদাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আশ-হাদু-আন্ন মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু' মতাদর্শকে গ্রহণ করে এবং এই ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে সেই সম্মিলিত শক্তিকে উপেক্ষা করা বস্তুতঃই কারো পক্ষে সম্ভব নয়, দুই সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি যত পরাক্রান্তই হোক না কেন। তা ছাড়া উল্লেখ করার মত একটা বিষয় হলো, মুসলমান অধ্যুষিত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তেলের উপর পৃথিবীর সব শিল্পোন্নত দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করছ। কাজেই মুসলমানদের হাতের তেল আজ একটা সাংঘাতিক অস্ত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সীমাহীন অজ্ঞতার দরুন এই 'শক্তিশেল' তেলাস্ত্রকে একটা মর্মান্তিক তামাশায় পরিণত করেছে। প্রয়োজনের চেয়েও বেশী জোর দিয়ে বলা হয়েছে,—সে মোমেন নয়, সে মোমেন নয়, সে মোমেন নয়, প্রতিবেশীর পক্ষে যে নিরাপদ নয়। ইরাক ও ইরান দুইটি মুসলিম দেশ। এরা এখন প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলেছে। দুটি দেশের লোকই আজ নিরাপত্তার প্রয়োজনে ঘর গৃহবাস ত্যাগ করে ব্যাংকারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। খোমেনী বলছেন, তিনি ইরানে ইসলামী বিপ্লবকে রক্ষা করেছেন, অন্যপক্ষে ইসলামী বিপ্লব ধ্বংস করার জন্য ইরাক তার উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। আর সউদী আরব, জর্দান, মিসর প্রমুখ দেশ ইরাককে সমর্থন করে জনাব খোমেনীর 'ইরানেব ইসলামী বিপ্লবকেই ধ্বংস করতে সহযোগীতা দিচ্ছে।

www.pathagar.com

অপর পক্ষ থেকে খোমেনী সাহেবের সমালোচনা করে বলা হচ্ছে, তিনি ইসলামী বিপ্লবের নামে যেটা চালাচ্ছেন তার মধ্যে অন্য অনেক কিছু থাকতে পারে কিন্তু ইসলাম নেই।

মুসলমান জনসাধারণ চায় "ঐক্য"। নিখিল বিশ্বের সাধারণ মুসলমানরা আজ অত্যন্ত আতংকের সঙ্গে লক্ষ্য করছে মুসলিম জাহানের উপর নেমে এসেছে এক দিগবিস্তারী নৃশংস ঈগলের থাবা। ইসলামী ভাবাদর্শকে দুনিয়া থেকে মুছে দেবার এক জঘন্য চক্রান্তের বেড়াজালে মুসলিম শাসকরা আষ্টে-পৃষ্ঠে বাধা পড়ে গেছে।

সময় পার হয়ে যাচ্ছে। এই কথাটা বলার আজ কেউ নেই যে, যারা ইসলামের চিন্হিত শত্রু তাদেরই যোগানো অস্ত্রের ঘায়ে প্রতিবেশী মুসলিম দেশ দুটির জান মাল ধ্বংস করা হচ্ছে-এর চেয়ে মুর্খতা আর কিছুই নেই। ভ্রাতৃহত্যায় যে শক্তি যোগায় তার মত বড় দুশমন কেউ নেই আর। ইরাক-ইরানের যুদ্ধে এই কয়দিনে উভয় পক্ষে বিপুল পরিমান সামরিক সরঞ্জামসহ শিল্প কারখানা, তৈল রিফাইনারি ও মজুদ তেলের ভাণ্ডার যে পরিমাণ ধ্বংস হয়েছে তার মূল্য কয়েক হাজার কোটি টাকা। কেবল ওয়েল ইনস্ট্যালেশনের ক্ষতি আজ পর্য্যন্ত হিসেবে দেখা গেছে ৯০০ কোটি মার্কিন ডলারের উপর। এ ক্ষতিকে এক কথায় বলা যায় অপুরণীয়। এই অপুরণীয় ক্ষতির কারণ যুদ্ধায়োজন বন্ধ করতে সমর্থ হয়নি ইসলামী সম্মেলন নামের সংস্থাটি। সংস্থার সৈক্রেটারী জেনারেল জনাব হাবিব চাত্তি পাকিস্তানের জিয়াউল হককে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধমান দেশ দুটির রাষ্ট্র প্রধানের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতির আশা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। অনুমান করা যায়, অনেক নীতি কথা তারা শুনিয়েছেন উভয় পক্ষকে। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ না হওয়াতে বোঝা যাচ্ছে নীতি তাদের মনে কোন দাগ কাটতে পারেনি। হয়তো মহাভারতের রাজা দুর্যোধনের মত তারাও বলেছেন, 'জানামিধর্মায় নচ মে প্রবৃত্তি'। এর কারণ বোঝাই যাচ্ছে ওরা কেউ এখন আর স্ববশে নেই।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ-ভারত রেল চুক্তি

পত্র-পত্রিকা মারফত আমরা সম্প্রতি জানতে পারলাম, আমাদের সরকার ভারতের সঙ্গে রেল যোগাযোগ সংক্রান্ত একটা চুক্তি সম্পাদন করেছেন। এই চুক্তিবলে ভারত বাংলাদেশের রেলপথ ব্যবহার করতে পারবে অর্থাৎ ভারতীয় ট্রেন বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে যাতায়াত করতে পারবে। কিন্তু এই চুক্তির বিশদ বিবরণ সরকার আমাদের কিছুই অবহিত করেননি। যদিও জানি এই জাতীয় চুক্তি কখনও গোপনভাবে সম্পন্ন হয় না এবং দেশের প্রত্যেকটি মানুষের এই জাতীয় চুক্তির বিশদ বিবরণ জানবার অধিকার আছে। জনগণই দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অথচ এই একান্ত জনস্বার্থ-সম্বন্ধীয় বিষয়টি জনগণের অগোচরে রাখার চেষ্টা সরকার কেন করছেন—সেটাই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে।

ভারত আমাদের একটি প্রতিবেশী দেশ। আন্তর্জাতিক বিধি অনুসারে উভয় দেশের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তিবলে ভারত আমাদের এলাকার রেলপথ ব্যবহার করতে পারে। আমাদের জাতীয় স্বার্থক্ষুন্ন হবার কোন আশঙ্কা না থাকলে এ ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কোন বাধা নেই। কিন্তু চুক্তির বিবরণ অপ্রকাশিত থাকায় আমরা বুঝতে পারছি না, এর দ্বারা আমাদের জাতীয় স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে কিনা। তবে চুক্তি সম্পাদন ও তা মেনে চলা এবং সৎ প্রতিবেশী-সুলভ মনোভাব নিয়ে উভয়ে উভয়ের স্বার্থ দেখাশোনার ব্যাপারে ভারত অতীতে যে ভূমিকা পালন করেছে তাতে রেল যোগাযোগ সংক্রান্ত এই চুক্তিতে দেশবাসী তেমন উৎসাহী হয়ে উঠতে পারছে না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে স্থলপথে যোগা-যোগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতীয় এলাকা (রেল পথ) ব্যবহারের অনুরোধ জানান হয়েছিল। ওয়াকিফহাল মহল জানেন, তৎকালীন ভারতীয়

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষ সে অনুরোধ হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার সুবিধার জন্য আমরা আমাদের রেল পথ ও জলপথ ব্যবহারের সুবিধা দিয়েছিলাম।

এক সময় নেপাল বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নেপাল-বাংলাদেশ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের কাছে ভারতীয় এলাকা (রেলপথ) ব্যবহারের আবেদন জানায়। কিন্তু ভারত সরকার সে আবেদনে কোন অনুকুল সাড়া দেননি।

ভৌগোলিক কারণে নেপালের পক্ষে বিশ্ববাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে হলে ভারতের সাহায্য প্রয়োজন। অথচ ভারত সরকার নেপালের কাঁচামাল বিদেশী মুদ্রা আদৌ খরচ না করে যাতে সহজে ব্যবহার করতে পারে তারই জন্য নেপালের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। ভারত সম্মত হলে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে আমরা নেপালের সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ লাভ করতাম। নেপালকে প্রত্যাখ্যান করে ভারত সরকার আমাদের স্বার্থও ক্ষুন্ন করেছিল। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কাছে পূর্ববাংলা রেলপথ দিয়ে যুদ্ধ সরঞ্জাম পরিবহণের অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফীল্ড মার্শাল মোঃ আইয়ুব খান সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, ভারতের মত চীনও আমাদের প্রতিবেশী দেশ। চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতকে সাহায্য করতে গিয়ে চীনকে বৈরী করে তোলা মোটের উপর বুদ্ধিমত্তা নয় বলেই যুদ্ধ সরঞ্জাম পরিবহণে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সে সময় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণে কোন বাধা-নিষেধ তখনো ছিল না। পরে ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পূর্ববাংলা রেলপথ ব্যবহারের সমঝোতা স্বাভাবিক কারণেই বাতিল হয়ে যায়।

দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর পরে সেই পুরানো সমঝোতা চুক্তিরূপে আবার নতুন করে সম্পাদিত হলো। তবে চুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে সাধারণ ব্যবসায়ী পণ্য ছাড়া অন্য ধরণের দ্রব্যাদি অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম, সৈন্য-সামন্ত পরিবহনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত কিনা আমরা জানিনে। পত্র-পত্রিকার খবরে যদিও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে রেল যোগাযোগ বলতে যেমনটা বোঝা যায় ব্যাপারটা আদৌ সেরকম নয়। ভারতীয় ট্রেন

www.pathagar.com

আমাদের রেল লাইন দিয়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলে গমনাগমন করবে আমাদের ট্রেন ভারতীয় রেলপথ দিয়ে কোথাও যাবে না যাবার কোন সুযোগও নেই। মানের দিক দিয়ে এই চুক্তি কাজেই দ্বিপাক্ষিক নয় যদিও যে কোন চুক্তির ক্ষেত্রেই দুটির কম পক্ষ থাকতে পারে না। জানি না আমাদের কাছে ভারত এই চুক্তির প্রস্তাব করলে আমাদের কর্তৃপক্ষ নেপালের সংগে ভারতের মধ্যদিয়ে (পুরাতন প্রস্তাব) রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণের কোন প্রস্তাব করে ছিলেন কিনা।

ইদানিং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কিছু কিছু আচরণের খবর আমাদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে সদ্য জেগে ওঠা কয়েকটি দ্বীপের মালিকানার প্রশ্নে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত একগুয়ে ও বৃহৎ রাষ্ট্রসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। সমুদ্রসীমা চিহ্নিত হয়নি শুধু এই অজুহাতে বাংলাদেশের উপকূলের মাত্র ১৫ মাইলের মধ্যে নির্মিত দুইটি ড্রিলিং টাওয়ার ভারতীয় গান-বোট এসে কামান দেগে উড়িয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে। অথচ ২০০ মাইল সমুদ্রসীমা একটা আন্তর্জাতিক বিধি। ভারতের মুসলমানদেরকে সুস্পষ্টভাবে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর বিনষ্ট করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের সরকার বলেছেন 'ওটা ওদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

আমরা জানি না, অথচ জানবার জন্য আমাদের কৌতুহলের অন্ত নেই যে ভারতীয় প্রবল পক্ষের কাছে আমাদের কর্তৃপক্ষ দেশের স্বার্থ ক্ষুন্নকারী কোন শর্তসম্বলিত চুক্তি পুনঃ সম্পাদন করে বসেছেন কিনা। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই চুক্তির বলে ভারতীয় পক্ষ আমাদের রেল লাইন ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু এই চুক্তিতে আমাদের কি লাভ হবে? আমরা কি পাব? আমরা কি উত্তর ভারতীয় এলাকার রেল-পথ ব্যবহার করার বিনিময়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন বৈষয়িক সুবিধা লাভ করতে পারবো? জানিনা এই চুক্তি কোন বৈদেশিক কিংবা আভ্যন্তরীণ চাপের মুখে নতি স্বীকারের ফল কিনা। তেমন কিছু না হোক আমরা সেইটাই আশা করি। তবে, যদি সেরকম কিছু হয় তাহলে সেটা হবে খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। আমরা আশা করি, দুটি সার্বভৌম স্বাধীন দেশের মধ্যে স্বকীয়সত্তা পরিপূর্ণ-ভাবে বজায় রেখে এবং পারস্পরিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার অঙ্গীকার নিয়েই এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এবং চুক্তি সম্পাদনের সময় আমাদের কর্তৃপক্ষ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে বিক্ষুব্ধ অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক সচেতন রয়েছেন।

www.pathagar.com

শেরে বাংলার পুনর্মূল্যায়ন

শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের পুর্নমুল্যায়নের নামে বস্তুতঃ যারা তাঁর অবমূল্যায়নের কাজে নেমেছেন, আমাদের বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে এই কাজের পিছনে তাদের উদ্দেশ্য কি ? যেহেতু যে কোন কাজের পিছনে একটা না একটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকেই এবং প্রকৃত পক্ষে কাজকে উদ্দেশ্য থেকে আলাদা করা যায় না এতএব এটা দিনের আলোর মতই পরিস্কার যে একটা ভাবমূর্তির বিরুদ্ধে যারা আজ ঘাতকের মূর্তিতে আসরে নেমেছেন, তাদের উদ্দেশ্য—এই ঘাতক বৃত্তিই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, ভাল নয়।

উল্লেখ বাহুল্য যে, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবনের পরিধি অতিশয় বিশাল। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে মধ্যপাদ পর্যন্ত বাংলাদেশে এমন একজন কৃষক ও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে হক সাহেবের নাম জানে না এবং সবায় জানে হক সাহেব কৃষকের বন্ধু এবং আরো যে কৃষক গরীব, ঋণে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়া পরনে ছেঁড়া তহবন্দ, মাথায় তেল চিটচিটে গামছা জমিদারের বাড়ীতে খাজনা আদায় দিতে গিয়ে বিশেষ সম্মানের আসন ছালার চট যার জন্য বরাদ্দ সেই আধা সর্বহারা কৃষক জানে হক সাহেব তারই বন্ধু। এই বন্ধুত্বের আসন থেকেই কিছু পণ্ডিত নামের মতলববাজ ব্যক্তি হক সাহেবকে অপসারিত করতে যাচ্ছেন, ভাবখানা এমন যেন, ওগো এতকাল যাকে তোমরা ভাল মানুষ বলে জেনে এসেছো সে কিন্ত ভাল মানুষ ছিল না বাপু। এই অত্যান্ত হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অবমূল্যায়নকারীরা হক সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের সমুদয় সুকৃতিকে নিতান্ত নির্লজ্জ ভাবে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। যে হক সাহেব বাংলা-দেশের মুসলিম সমাজের শিক্ষার জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন, তাকেই এরা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন শিক্ষাবিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলে। এমন কি যে ঋণ সালিশী বোর্ড আইনের সঙ্গে ফজলুল

www.pathagar.com

হকের নাম জনগণের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে মিশে আছে এরা জনগণের মন থেকে সেই স্মৃতিটুকু মুছে দেবার জন্য প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন— ঋণ সালিশী বোর্ড আইনটির সঙ্গে হক সাহেবের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। শেরে বাংলা ফজলুল হকের প্রধান মন্ত্রীত্বকালে বাংলাদেশে ঋণ সালিশী বোর্ড আইন পাশ হয়, কিন্তু বিলটি হক সাহেব আনেননি এটা সবাই জানেন, এই ঋণ সালিশী বোর্ড গঠনের পশ্চাতে আরো অনেকের অবদান নিশ্চয় ছিল। তবু আইনটির সঙ্গে হক সাহেবের নাম জড়িত আছে।

অবশ্য একথা অতিব সত্য যে এই অপচেষ্টার গোড়াতেই দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠাতে অবমূল্যায়ন প্রচেষ্টায় লিপ্ত ভদ্রলোকেরা বুঝতে পেরেছেন যে, কাজটা সহজ নয়। হক সাহেবের মত বিশাল মহিরুহকে ছেদন করতে গেলে যত বড় কুঠারের প্রয়োজন ততবড় কুঠার উচু করার মত শক্তি তার দেহে নাই। তবু চেষ্টার ত্রুটি তারা করবেন না এটা জানা কথা। বস্তুতঃ আজ যারা শেরে বাংলার অবমূল্যায়ন প্রচেষ্টায় নেমেছেন, এ কল্পনায় কোন অসঙ্গতি নেই যে, তাদেরই বাপ পিতামহরা একদা এই দেশের জমিদার বাবুদের বাড়ীতে গিয়ে কখনো বা চটের আসনে বসতে পেতেন আর খাজনা আদায় দিতে ব্যর্থ হলে গলায় গামছা দিয়ে (গলবস্ত্র নয়) দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হতেন রোদের দিকে মুখ করে। মুসলমান প্রজারা দাড়ি রাখলে আলাদা খাজনা বরাদ্ধ ছিল। আরো কত প্রকার শাস্তি যে তাদের জন্য বরাদ্ধ ছিল তার হিসাব করা সম্ভব নয়; শেরে বাংলা সেই ন্যাককার জনক সামাজিক দুর্ভোগ আর অবমাননার হাত থেকে মুসলমান কৃষক সমাজকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করার আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। সম্ভবতঃ শেরে বাংলার প্রতি সেই কৃতজ্ঞতার ঋণই তারা শোধ করছেন এই ভাবে। বহুদিন পর সম্প্রতি হক সাহেবের মাজারের উপর স্মৃতি সৌধ নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। কাজটা চলছে যদিও ঢিলে ঢালা ভাবে তবু চলছে। এ সময় যারা হক সাহেবের পুর্নমূল্যায়নের কাছে নেমেছেন, তাদের উদ্দেশ্য পরিস্কার যে, এই স্মৃতি সৌধটা নির্মিত হোক, তারা সেটুকুও চান না। কিন্তু শুধু স্মৃতি সৌধ নির্মাণে প্রচ্ছন্ন বাধা সৃষ্টিই তাদের উদ্দেশ্য নয়, তাদের উদ্দেশ্য আরো গভীর, আরো ব্যাপক তাতে সন্দেহ নাই।

www.pathagar.com

'শেরে বাংলার পুর্নমুল্যায়ন' এই শিরোনামে অত্র লেখক সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন বিচিত্রায়। যদিও এই অজ্ঞ লেখক মাত্র ৩/৪ বছর আগে শেরে বাংলা ফজলুল হক সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তবু এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে তিনি পুনরায় এই প্রচেষ্টায় নামলেন কেন? অবশ্য যে কোন অধশিক্ষিত দ্বিধাগ্রস্ত লেখকের তাঁর পূর্বের বক্তব্য প্রত্যাহার করার অধিকার আছে কিন্তু এক্ষেত্রে লেখকের আগের বক্তব্য প্রত্যাহার করার মধ্যে গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে বলেই ধারণা করা যায়। কারণ একজন প্রয়াত রাজনৈতিক এদেশের মানুষের বুকের মধ্যে যার স্থান তার ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে ফেলার এই চেষ্টাকে লেখক প্রমখু ব্যক্তিগণ ঐতিহাসিক দায়িত্ব বলে প্রচার করলেও এটা বস্তুতঃই তা নয়, বরং উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হক সাহেব যে অনন্য ভূমিকা পালন করে গেছেন, তা মুছে ফেলতে পারলে যে সব মহলের রাজনৈতিক সুবিধা হাসিল হয়, লেখক জ্ঞাতসারে তাদের স্বার্থই রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন! এ দায়িত্ব কোন অর্থেই ঐতিহাসিক নয়, জাতীয় স্বার্থের অনুকূল তো নয়-ই।

আমরা সাপ্তাহিক বিচিত্রায় লেখক সাহেবদ্বয়ের নিবন্ধ দুটি পড়েছি। তাতে যে ভাবে হক সাহেবের পূর্নমুল্যায়নের নামে অবমুল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে তাকে জঘন্য ইতরামী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিশিয়ে হক সাহেবের জীবনের ঘটনাবলীকে বিকৃত করা হয়েছে একেই বলে বুদ্ধিবৃত্তিক (Intellectual Proptitution) জোচ্চুরি। আবদুল মালেক নামের একজন পত্রিকা পাঠক ঐ নিবন্ধ দুটির জবাব দিয়েছেন। জনাব আবদুল মালেক যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে হক সাহেবের বিরুদ্ধে আনীত প্রতিটা অভিযোগ খণ্ডন করেছেন। মালেক সাহেবের এই খণ্ডন খুবই যৌক্তিক ও বিজ্ঞান সম্মত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। ডঃ সিরাজুল ইসলাম ও বজলুর রহমান সাহেব রচিত নিবন্ধ দুটির আরো খণ্ডনের প্রয়োজন আছে বলে আমরা আর মনে করি না।

তবে মালেক সাহেব খুব ভদ্রতা করে এই নিবন্ধ দুটি রচনার উদ্দেশ্য (সঠিক) সম্পর্কে কোন কটু মন্তব্য করেন নি। কিন্তু ভদ্রতা বশতঃ অপ্রিয় সত্য কথা বলা থেকে বিরত থাকা বাস্তবিকই চলে কি?

www.pathagar.com

লেখকদ্বয় যে উৎস থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে বাংলার সর্বজন নন্দিত হক সাহেবের চরিত্র হননের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন সেই উৎসটি দেশ প্রেমিক নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস। জানি না প্রেরণাটি হোয়াইট হাউস না ক্রেমলিন না দিল্লীর লালকেল্লা থেকে উৎসারিত, তবে যেখানেই হোক দেশের মাটিতে তার কোন শেকড় নাই, তা বলা যায় দৃঢ় ভাবেই।

হক সাহেবের রাজনৈতিক জীবন যাঁরা স্বশরীরে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের সংখ্যা দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন নগণ্য হয়ে এসেছে। আর দশ বছর গেলেই প্রত্যেক্ষদর্শী তেমন কেউ থাকবেন না। অবমূল্যায়নের এই অপচেষ্টা তখন হয়তো সফল হবে। এখনও বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে দু-চার জন হলেও হক সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের প্রত্যেক্ষ দর্শী কেউ না কেউ বেঁচে আছেন। তারা সাক্ষ্য দেবেন, এই দেশে একদা মুসলমানদের মিল্লাত (আইডিওলজিক্যাল নেশন) নিয়ে কি জঘন্য ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছিল। ভারতীর উপমহাদেশে হিন্দুরা যখন চিন্তা করছিল যে, যেহেতু মুসলমানরা বিদেশী দখলদার। অতএব তাদেরকে শারীরিকভাবে নির্মূল করতে হবে। (বালগঙ্গাধর তিলক ঃ রায়গড় ভাষণ ১৮৯৫, তাং ২০শে জুন ১৯২৪ সাল) ভাষণে বলেছে ঃ "The future of the Hindus rests on four pillars, these are : first Consolidation of the Hindus, Secondly, establishment of Hindu Raj, Thirdy,—Conversion of Muslims to Hinduism and forthly, conquest of Afganistan and regions contigous to the subcontinent. Destine of our childdren and their future generation shall remain insecure so long as these four objectives are not achived :"

M. K. Gandhi said (1921) 'I believe in Varnasrams Dharma in its vedic form. I believe in the protection of cow as an article of faith and I do not disbelieve in Idol workship." এবং তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোন

www.pathagar.com

কোন নেতা এমনও চিন্তা করছিলেন যে, যেহেতু মুসলমানরা এই দেশের অধিবাসী ছিলেন এতএব তাদেরকে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের মধ্যে আবার শামিল করে নিতে হবে। অর্থাৎ পঞ্চগব্য খাইয়ে যখন মসুলমানদের সাবিক হিন্দুকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছিল তখন হক সাহেব সুন্দরবনের বাঘের মতই গর্জন করে উঠেছিলেন। শের-ই-বাঙ্গলা এই কারণেই বলা হয়েছিল হক সাহেবকে। শেরে বাঙ্গলা কোন পশুত্বের অভিব্যক্তি প্রকাশের অভিধা নয়। বস্তুতঃ লেখকদ্বয় নিবন্ধ ২/৩ টিতে যে সব অভিযোগ এনেছেন, তার স্বপক্ষে কোন বৃদ্ধসম্মতি নেই। এতএব নিবন্ধ দুইটির যৌক্তিক সারবত্তা যদি থাকেও, তথাপি তা গৃহীত হবার কারণ ছিল না। উল্লেখ নিস্প্রোয়জন যে, উপমহাদেশে মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র ১৭৫৭ সাল থেকে কিংবা তারও আগে থেকে শুরু হয়েছিল, সে ষড়যন্ত্র আজ শেষ হয়ে গেছে তা ভাবার কোনো কারণ নেই বরং ১৭৫৭ সাল থেকে উপমহাদেশের মুসলমানদের নিয়ে যে চক্রান্ত শুরু হয়েছিল তা ধাপে ধাপে আরো এগিয়ে গেছে। কখনও প্রকট হয়েছে কখনও সাময়িক স্তিমিত থেকেছে। কিন্তু তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্ন গতিতে তা এগিয়েই গেছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধে যে ইহুদীবাদী চক্রান্ত চলেছে তা সুবিদিত। সঙ্গে চলেছে এই উপমহাদেশে ব্রাহ্মন্যবাদ সাহায্য করছেন এই বিতণ্ডাবাদীদের। মুসলিম দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি বিরাট সামরিক চক্রান্ত শুরু করেছে। এই সব চক্রান্ত যাতে আমরা সাফল্যজনক প্রতিরোধ না করতে পারি তারই জন্য আমাদের অতীত সংগ্রামের ঐতিহ্য মুছে ফেলার এত প্রয়োজন। তারই জন্য আমাদের জাতীয় বীর সন্তানদের চরিত্র হননের এত অপচেষ্টা।

এ কথা সবই স্বীকার করবেন যে, যদি কোন জাতির অতীত সংগ্রামের ইতিহাস মুছে ফেলা যায় তবে তার ভবিষ্যৎ কেও অস্বীকার করা সম্ভব হয়।

www.pathagar.com

যে সব দেশপ্রেমিক বীর সন্তানের সংগ্রামের কাহিনীতে আমাদের ইতিহাস সমৃদ্ধ. যাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য আমাদের ভবিষ্যৎ, তাদের চরিত্র হননের প্রচেষ্টাকে নিরপেক্ষ সামাজিক গবেষণার নামে হলেও কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। কাজে কাজেই বিতণ্ডাবাদীদের নিবন্ধ কটি আমরা সচেতন ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করছি যেমন স্যার সৈয়দ আহমদ, নবাব স্যার সলিমুল্লাহ সিরাজী আকরাম খাঁ আবুল হাসিম, সোহ-রাওয়াদী প্রমুখ মহাপুরুষের জন্ম না হতো তা হলে আমাদের উল্লেখিত লেখকদের বর্তমান নামের পরিবর্তে পটল মিঞা, ঝিঙ্গ, মিঞা, চেঙ্গ মিঞা, ছোন মিঞা নাম করণ হতো। উল্লেখযোগ্য তৎকালে হিন্দু জমিদাররা মুসলমান প্রজার ছেলেদের এই রূপ নাম রাখতো, এবং মুসলমানরা দাড়ি রাখলে মসজিদ নির্মাণ করলে হিন্দু জমিদারেরা তার জন্য ভিন্ন খাজনা আদায় করত। এ, কে, ফজলুল হকের কল্যানে আজ চট থেকে চেয়ারে বসতে এবং নামের আগে ডক্টরেট লাগাতে সমর্থ হয়েছেন যাঁরা তাঁরাই আজ এই বীর সন্তানদের চরিত্র হননের জন্য মাথা ঘামাচ্ছেন। আল্লাহ এই বিতণ্ডাবাদীদের সুচিন্তার শক্তি দিন।

www.pathagar.com

হোটেল ডি পাম্পা

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ঘসেটি বেগমের গ্যালেস রাজনীতির বদৌলতে এদেশ নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে ছিল পলাশী মাঠে। পলাশী নাটকের সকল চক্রান্তকারীই অস্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, নবাব সিরাজউদৌলা, মোহাম্মদী বেগ কর্তৃক নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন, আমিনা বেগম ও ঘসেটি বেগমকে ঢাকার অদূরে বুড়িগঙ্গায় ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। মীর জাফর আলী খান এক ধরনের মারাত্মক কুষ্ঠ ব্যাধিতে মারা যান এবং তাঁর পুত্র মীরন বজ্রপাতের মাধ্যমে ইহ জীবন ত্যাগ করেন। মীর কাসেম আলী খানের মৃত্যুদেহ দিল্লীতে আজমীরি গেটের নিকট রাস্তায় পাওয়া গিয়েছিল। রবার্ট ক্লাইভের তৈরী পদক প্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকায় নিজের নাম দেখতে না পাওয়ায় উমি চাঁদ হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান, মুঙ্গের দুর্গের শীর্ষ থেকে জগৎ শেঠ ও রাজা রায় দুর্লভ মীর কাসেম আলী খাঁন কর্তৃক গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হন, মহারাজ নন্দকুমারকে ওয়ারেন হেস্টিংস্ এক মিথ্যা মামলায় আসামী করে ফাঁসী দেন। নাটকের মূল নায়ক লর্ড ক্লাইভ স্বয়ং আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করেন। পলাশীর বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক নায়িকাদের জীবনের এটাই ছিল নির্মম পরিণতি। ইতিহাস আরব্য রজনী নয়!

গ্রেট বৃটেনের এককালীন প্রধানমন্ত্রী মিঃ এডওয়ার্ড হীথ তাঁর টার্ম শেষে যখন ১০নং ডাউনিং স্ট্রীট-এর সরকারী বাস ভবন ছেড়ে যাচ্ছিলেন তখন একজন সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এর পর কোথায় যাবেন? মিঃ হীথ ব্যাগ গোছাতে গোছাতে ঈষৎ হেঁসে বলেছিলেন 'আপাততঃ একজন বন্ধুর বাসায় উঠবো, তার পর খুঁজে নেবো একটা এক কামরার ফ্ল্যাট"।

এর পর সেই সাংবাদিক ভদ্রলোক আর কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন কিনা জানিনে। তা ছাড়া জিজ্ঞেস করার ছিলই বা কি? একটা

www.pathagar.com

পুরা টার্ম ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকার পর যিনি একটা এক কামরার ফ্ল্যাট খুঁজবার অবসরে এক-জন বন্ধুর বাসায় উঠবেন বলে মনস্থির করেছিলেন তাঁকে আর জিজ্ঞেস করার থাকেই বা কি? সেই প্রশ্নকারী সাংবাদিক ভদ্রলোক তাঁকে কি ভাবে বুঝে ছিলেন জানা নেই তবে আমাদের দেশের হিসেবে তাঁকে বাতুল বা অপদার্থ ভাবাটাই স্বাভাবিক। কেননা, এদেশে পুরো টার্ম প্রধান মন্ত্রিত্ব নয়, মাত্র দিন দশেকের জন্য তাও ফুল মন্ত্রী নয় প্রতিমন্ত্রী হয়েই এদেশে রাজধানী শহরের মোটামুটি ভদ্র এলাকায় একটা দৌলত খানা বানিয়ে নেবার দৃষ্টান্ত ও আছে। এ দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা যেন একটা পরশ পাথর, ছোঁয়ানো মাত্রই ধুলিমুষ্টি সোনা মুষ্টি হয়ে যায়।

রাজনীতি আমাদের দেশে ব্যবসা না ব্যসন তা নিয়ে আমার মনে অনেক জিজ্ঞাসা ছিল। অনেক রাজনীতিক আছেন দেখেছি, একেবারে আক্ষরিক অর্থেই রাজনীতি যাঁদের পেশা। কোন কিছু না করতে পেরে ইদানিং কোন এক শুভ সকালে (one fine morning) তাঁরা এই পেশায় নিযুক্ত হয়েছিলেন; তাঁরা নিজেরাও তা ভুলে গেছেন তার পর চালিয়ে যাচ্ছেন। যতদিন বেঁচে থাকবেন চালিয়েও যাবেন যদ্যপি কাল তাদের অধিকার না করবে কিংবা জনগণ ধিক্কার দিয়ে নরদামায় ফেলে না দেবেন, চালিয়ে যাবেন। এর মধ্যে যথাবিহিত তাঁর সংসার যাত্রা (গাড়ী বাড়ী স্ত্রীর শাড়ী পুত্র কন্যাদের দেশী বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী. স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, সোনাদানা, আর দেশী বিদেশী ব্যাংকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরম প্রভূত সঞ্চয়) নির্ব্বাহ হয়ে থাকবে, ধর্ম্ম, অর্থ কামমোক্ষাদি কোন ও কিছুই অলভ্য থাকবে না। কোন কিছু বিপন্নও হবে না।

এ যদি ব্যবসা হয় তবে বিনা পুঁজির এত বড় ব্যবসা আর নেই। ইনকামট্যাক্স ও দিতে হয় না। একটা মশক কিংবা মক্ষিকার জীব-নোতিহাসের মত করে যদি আমরা একজন রাজনীতিকের জীবনেতি-হাস পর্যালোচনা করি তবে দেখবো কলেজ, ইউনিভারসিটি কিংবা কলকারখানার শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে প্রথমে কর্মী, তার পর ছোট নেতা, (মক্ষিকার ক্ষেত্রে যেমন প্রথমে ডিম, তার পর শুককীট, তার

www.pathagar.com

পর মুককীট শেষে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ) এমনি করে পর্যায়ক্রমে উপরে উঠতে উঠতে জাতীয় নেতা পর্য্যন্ত। জাতীয় নেতা হওয়া মানেই ব্যবসায়ে পরম সাফল্য অর্জন করা। অবশ্য অন্যতম জাতীয় নেতা থেকে এক-ছত্র রাজচক্রবর্ত্তী হবার কিংবা হয়ে টিকে থাকার নিরবধি সংগ্রাম তো আছেই।

আমাদের দেশের রাজনীতিকরা একে সন্দেহ নেই, ব্যবসা হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। জনকল্যাণ বলে রাজনীতির যে একটা বহু ঘোষিত উদ্দেশ্যের কথা শোনা যায়, আমাদের বর্তমান দেশীয় রাজনীতিতে বলা বাহুল্য, তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজনীতিকের জন্য মাতৃবৎ পরদ্বারেষু লোষ্ট্রবৎ পর দ্রব্যেষু আর আত্মবৎ সর্ব্বভুতেষু বলে একটা প্রাচীন লোকন্যায় প্রসিদ্ধ আছে এতদ্দেশীয় রাজনীতিতে তার অর্থ পর্যবসিত হয়েছে বিপরীতে।

পরের দ্রব্যকে তাঁরা লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন এবং সর্ব্বভুতে আত্মজ্ঞান করেন বলেই জনগণের ধন আত্মসাৎ করতে তাঁরা কোন বিবেক দংশন অনুভব করেন না। আমার এই অভিযোগকে কেউ কেউ সামানাকিরণ দোষে দুষ্ট বলে ভাবতে পারেন; সে ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো লোক চক্ষুর আড়ালে জনকল্যাণের ব্রত নিয়ে কচিৎ এক আধজন জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন তবে তারা সংখ্যায় এতই নগন্য যে তাদেরকে বর্তমান অনায়াসে ব্যাতিক্রম বলে বাদ দেওয়া যায়—সর্ব্বজনের জানা শোনার আওতায় রাজনীতিক মানেই সুযোগের সর্ব্বপেক্ষা সদ্ব্যবহার-কারী আত্মকামী সফল পুরুষ।

অবশ্য এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও আছে। এ দেশে নামজাদা রাজনীতিবিদ আগেও ছিলেন যেমন সোহরাওয়ার্দ্দী, নুরুল আমিন, মাওলানা আকরম খাঁ, আবুল হাসিম প্রমুখ। তাঁদের বক্তব্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের অন্ত ছিলোনা। তবে এই জন নেতাদের শত্রুও তাঁদের সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারতেন না এবং তা আজো সম্ভব নয়। যারা এ সব নেতাদের অন্তরঙ্গ আলোকে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে, আদর্শ বিক্রি করে অর্থ নেওয়া তো দূরের কথা এরা নিজেদের পৈত্রিক সম্পদ এবং কন্টে উপার্জিত টাকা কড়ি রাজনীতি তথা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতেন।

www.pathagar.com

এটা আদৌ কোন গাল খোঁটার কথা নয়, আমাদের দেশে এমন অসংখ্য রাজনীতিক নেতা কর্মী আছেন যারা অর্থোপার্জনের চতুর্বিধ উপায়ের (বাণিজ্য, চাষ কর্ম, চাকুরী ও ভিক্ষা) মধ্যে শেষেরটি ছাড়া প্রকাশ্যে কোনটিই অবলম্বন করেন না। অথচ মথিলিখিত সুসমাচারে যেমন বলা হয়েছে 'পক্ষী সকল বীজ বপন করে না অথচ তাদের খাদ্যের অভাব নেই' তেমনি এদেশীয় রাজনীতিকরা ন্যাসঙ্গত অর্থ-কারী কোন বৃত্তিই অবলম্বন করেন না, পারেনও না অথচ তাঁদের খাদ্যের (চতুর্বিধ ভক্ষ্য বস্তু চর্ব্বচষ্য লেহ্য পেয়াদির) কোন অভাব হয় না। এই দেশে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু মাত্র আমাদের দেশেই প্রকৃত-পক্ষে এরূপ উপায়হীন উপায়ে অর্থোপার্জন সম্ভব হয়ে থাকে।

এতদ্দেশীয় জনগণের বেশীর ভাগ (৯০%) ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান। এবং রাজনীতিকরাও প্রকাশ্যতঃ সকলেই ইসলামের মূল-নীতির 'খেদমতগার'। ইসলামী মূল্যবোধ অনুসারে যেহেতু রাজনীতিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আদর্শ হিসাবে জনগণের খেদমতের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। কাজেই বহিরঙ্গে জনগণের খেদমতের আলখেল্লাটা রাখতেই হবে। তাই বলে জন সেবা করলে তো আর আত্মসেবা হয় না, অতএব আত্মসেবার মধ্যদিয়েই তাঁরা আত্মবৎ সর্ব্বভূতেরই সেবা করে থাকেন। এরাই প্রকৃতপক্ষে বিতণ্ডাবাদী।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অগনিত। বিদেশী কারো পক্ষে বিশ্বাস করে উঠাই কঠিন যে ৫৪ হাজার বর্গমাইলের একটা দেশে ৫৪টিরও বেশী রাজনৈতিক দল (প্রায় ৬০টা) থাকতে পারে। সব কটি দলেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক 'জন সেবা'। সর্ব্ব প্রকার শোষণ থেকে জনগণের 'মুক্ত' করে জনতার রাজ কায়েম করাই সবার ঘোষিত লক্ষ্য। কেবল মাত্র 'মত' আর 'পথের' (!) মিল হয় না বিধায় সংখ্যাতীত ভাগে তাঁরা ভাগ হয়ে আছেন।

বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার (যাদের উৎস প্যালেস পলেটিক্স) সব কটি রাজনৈতিক দলের প্রধানদের নিয়ে মাঝে মধ্যে উপলক্ষক্রমে খানা পিনা করে থাকেন। রাষ্ট্র প্রধান হন মেজবান আর এরা হন সম্মানিত মেহমান, রাষ্ট্রীয় মেহমান খানায় অবরে সবরে আতিথ্যলাভ কাম-নায় তাদের মধ্যে বিলক্ষণ হড়াহড়ি লাগে। রাজদর্শন পুণ্যের কাজ,

www.pathagar.com

এই পুণ্য বলে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম (হয়তো বা মোক্ষও) লাভ করা যায়। সে কারণেই হুড়াহুড়ি। কোন দলের কনিষ্ঠ নেতা হয়ে থাকলে দাওয়াত মেলে না বলে একদল ভেঙ্গে দুই দল, দুই দল থেকে চার দল এমনি করে বর্তমানে পাঁচ ডজনের মত দল পয়দা হয়েছে এই বাংলাদেশে। দল ভাঙ্গা আর নতুন দলগড়ার পেছনে মতাদর্শগত মত পার্থকের যত কথাই বলা হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় মেহমান খানায় নিমন্ত্রণ ও আনুষঙ্গিক ফলাদি লাভের কামনাই যে এর নিমিত্ত তাতে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আমি জানি আমাদের দেশে যতগুলি রাজনৈতিক দল আছে ততগুলি কেন পৃথিবীতে তার আট ভাগের একভাগ মতবাদও চালু নেই। অর্থাৎ মতাদর্শের ভিন্নতা দল গড়া ভাঙ্গার কোন কারণ নয়।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রকাশ্যতঃ কোন ব্যবসা করেন না। চাকুরীও করেন না, কেউ কেউ সাংবাদিকতা করেন কিন্তু যে বেতন পান তা দিয়ে তাঁদের খদ্দরের পাঞ্জাবীর ধোঁয়া খরচ আর ফিল্টার টিপড্ সিগারেট কেনার পয়সা হয় কিনা আমার সন্দেহ আছে। রাজনৈতিকদের কেউ কেউ ওকালতি করেন। এতদ্দেশীয় রাজনীতির অঙ্গনে এটা ছিল অনেকটা ঐতিহ্যের মত। কিন্তু আধুনা উকিল সাহেবদের রবি বাসরীয় রাজনীতির দিন অনেকটা সংকুচিত হয়ে গেছে বলে কিছু প্রবীন নেতা ছাড়া অর্বাচীনদের কেউ আর এ পেশায় তেমন নেই। আজ কালকার দলপতিরা এ্যামেচারিজমে আর আস্থা-শীল নয়। তারা বেশীর ভাগই এখন হোল টাইমার। রাজনীতিই পেশা। রাজনীতিই উপজীবিকা। কিন্তু এ ব্যাপারটাতে আমার কিছু দ্বন্দ্ব আছে। পেশাদার রাজনীতিকরা যেহেতু জনগণের সেবা করেন, অতএব জনগণ নেতাদের ভরন পোষন চালাবেন এতে তেমন অন্যায় আমরা কেমন করে দেখি? কিন্তু যে জনগণের সেবায় এরা ত্রিভুবন নারায়ন করে বেড়াচ্ছেন তারা তো দু-বেলা দু-মুঠো ভাতও পায় না। তাদের অর্থানুকুল্যে ফিল্টার লাগানো সিগারেট চলে কেমন করে? এর পর নেতাদের পৈত্রিক সম্পত্তির কথা যদি তুলি তবে মানহানির মকদ্দমায় পড়ে যাবার আশংকা। কিন্তু উচিৎ কথা বলতে গেলে বাপের হোটেলে (রক এর ভাষায় হোটেল দি পাপ্পা) খেয়ে সারা জীবন বুনো মোষ (লাভ জনক নয় অর্থে) খেদিয়ে বেড়াবার মত মজবুত হোটেল

www.pathagar.com

আমি বেশী দেখিনি। সামাজিক নিয়ম অনুসারে যেমন প্রত্যেকেই জীবনের প্রাথমিক দিনগুলো বাপের হোটেলে খায়। রাজনৈতিকরাও তাই করেন। কিন্তু বাপের হোটেল রাজার গোলা ত-নয় যে চির দিন ওখানে থাকা যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো রাজনীতিকরা করেন কি? কবি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একবার একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন মহাশয়ের কি করা হয়? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কবিতা লিখি; প্রশ্নকারী ভদ্রলোক দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করেছিলেন কবিতা লেখেন তাতো বুঝলাম কিন্তু করেনটা কি?

আমাদের প্রশ্ন, রাজনীতিকরা রাজনীতি করেন তা বুঝলাম, কিন্তু করেনটা কি? অবশ্য কবিদের সঙ্গে রাজনীতিকদের তুলনা ঠিক খাটে না। কারণ কবিতার ফসল অন্যান্য ফসলের মত কাটতি না হলেও অর্থমূল্যে কিছু বিক্রি হয় কিন্তু রাজনীতিকদের বক্তৃতা কেউতো আর পয়সা দিয়ে শোনে না। তবুও ধর্মের ষাড়ের মত রাজনৈতিক নেতাদের গায়ে চেকনাইয়ের অভাব নেই। বস্তুতঃ ব্যবসা নেই, চাকুরী নেই এত চেকনাই আসে কোথা থেকে এ প্রশ্ন আমাদের যতই বিদ্ধ করুক, পতি পুত্র হীনা নারীর চল চল দেহলাবন্য দেখেই বোঝা যায় উপপতি আছে।

আমাদের দেশের ফৌজদারী দণ্ড বিধিতে এ রকম ক্ষেত্রে একটা বিধান আছে বলে জানি। কোন ব্যক্তির জীবিকার উপায় যদি অজ্ঞাত হয় অর্থাৎ চাষ, চাকুরী বা ভিক্ষার দ্বারা সে যদি নিজে এবং তার পরিবার প্রতিপালন না করে অথচ তার সংসার যাত্রা ভাল ভাবে নির্ব্বাহ হচ্ছে এমন দেখা যায় তা হলে দণ্ড বিধির কোন ও একটা ধারা মতে এলাকার জনগণের সপক্ষে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং উক্ত ধারা মতে তাকে অভিযুক্ত করে বিচার করা হয় আমি যতদুর জানি, দণ্ড বিধির উক্ত ধারাটি এখনো বলবৎ আছে কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা ঐ ধারার আওতায় প্রকাশ্য জীবনোপায়হীন এ সব রাজনৈতিক দলপতিদের কেন আনা হচ্ছে না? কোন বিশল্যকরণ প্রভাবে তারা এভাবে অস্ত্ররক্ষা ও আত্মবিকাশ করে চলেছেন জনগণের খুবই জানাতে ইচ্ছা হয়।

www.pathagar.com

ভারতীয় আগ্রাসন

বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সদ্য জেগে উঠা দঃ তালপট্টি দ্বীপটি ভারত গায়ের জোরে দখল করে নিয়েছে। ভারত বাংলাদেশের একটি বন্ধু দেশ। বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ দঃ তালপট্টি দ্বীপটি দখল করে ভারতীয় নেতারা বাংলাদেশের বন্ধুত্বের যে চমৎকার মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন বন্ধুত্বের ইতিহাসে বোধ করি তার সমান্তরাল দৃষ্টান্ত খুব বেশী নেই।

বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা এই ঘটনার পশ্চাতে ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের যোগসাজসের অভিযোগ এনেছেন। বস্তুতঃ দঃ তালপট্টির উপর ভারতের আগ্রাসন এক তরফা হোক কিম্বা বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে যোগ সাজসমূলক হোক, ফলাফলের দিক দিয়ে দুইই সমান। কারণ দঃ তালপট্টি দ্বীপ যা ভারত একবার গ্রাস করেছে তা আর কখনো সে স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দেবে না। ১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারত এ পর্যন্ত যতগুলি দেশ দখল করেছে, শতদেন দরবার সত্ত্বেও সে তার একটাও ছেড়ে দিয়েছে এ রকম একটা নজীরও নেই।

পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ কাশ্মীর দখল করে নেয়ার পর পাকিস্তানী নেতারা ভারতের সঙ্গে বহু দেনদরবার করেছিলেন, সচীব, মন্ত্রী ও রাষ্ট্র প্রধান পর্যায়ে বহুবার দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামেও আলোচিত হয়েছিল বহুবার কিন্তু কোন ফল হয়নি। ভারতের গ্রাস থেকে কাশ্মীর উদ্ধার করতে সমর্থ হয়নি পাকিস্তানী নেতারা। এই কাশ্মীর নিয়েই দুদেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে ঘটতে ১৯৬৫ সালে দেশদুটি এক সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৭ দিন একটানা যুদ্ধ চলার পর রাশিয়ার মধ্যস্থতায় যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে, কিন্তু মূল বিরোধীয় বিষয়ের কোন নিস্পত্তি হয় না। অর্থাৎ কাশ্মীর সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। বস্তুতঃ ভারতের আগ্রাসী চরিত্রের এটাই অনন্য নজীর নয়, একতরপাভাবে ভারতে ফরাসী

www.pathagar.com

উপনিবেশ পণ্ডিচেরী ও চন্দননগর কিংবা পর্তুগিজ উপনিবেশ গোয়া, দমন, দিউ কিংবা খাস খলে মানভাদড় জুনা গড় ও হায়দারাবাদ দখল করে নেবার মত বহু নজীর ভারত স্থাপন করেছে, কখনো বিবেকের দংশন অনুভব করেনি। বাংলাদেশের দঃ তালপট্টি দ্বীপ দখল করে নেবার পর দেশের পত্র-পত্রিকায় ভারতের বিবেকের উপর কটাক্ষ করে অনেক নিবন্ধ লেখা হয়েছে, সভা সমিতি, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতের আগ্রাসী ভূমিকার অনেক নিন্দা জানানো হয়েছে কিন্তু ভারত তার জবাবে দঃ তালপট্টি দীপ ভারতের 'অবিচ্ছেদ্য' অঙ্গ—এই মন্তব্য করেই বাংলাদেশের সমুদয় প্রতিবাদ বাতিল করে দিয়েছে। কোন বিবেকের তাড়না অনুভব করেনি।

বিবেক! একজন ভারতীয় লেখক, নাম মনে নেই বলে খুবই দুঃখিত, বিবেকের সঙ্গে এ্যাপেণ্ডিকস্ এর তুলনা করে লিখেছিলেন, 'মানুষের শরীরে এই অঙ্গটি না থাকলেই ভাল হয়, সামগ্রিক শারীরিক ব্যবস্থার মধ্যে এই অঙ্গটির কোন ভূমিকা নেই। মাঝখান থেকে এটি থাকার জন্য এ্যাপেণ্ডিসাইটিসের যন্ত্রনার ভয় আছে। বিবেকও এমনি, থাকলেই জ্বালা। এটি বাদ দিতে পারলে অনেক জ্বালাযন্ত্রনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, কিন্তু বিবেক কি সত্যিই এ্যাপেণ্ডিকস্ এর মত দু আঙ্গুল সমান একটি শারিরীক অঙ্গ যে অপারেশন করে বাদ দেয়া যায়? না, এটি কেটে বাদ দেবার মত তেমন কোন দেহাংশ নয় মোটেই। তবু হিন্দু ভারত তার রাজনৈতিক বিবেককে কেটে বাদ দিতে না পারুক সনাতন রাজ ধর্মের উদাহরণ দেখিয়ে বেশ ভালমতই চোখ ঠারতে সমর্থ হয়েছে। বাহুবলের দ্বারা অন্যের রাজ্য বা দখলকৃত অঞ্চল দখল করা একটি পুণ্য কাজ। সনাতন রাজ ধর্ম ভারতের।

অবিশ্বাস করার কিছু নেই। ভারতের জাতীয় বিবেক যে সনাতন ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সে ধর্মে সাম্রাজ্যবিস্তার যথার্থই একটি পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত। আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতরা মনকে চোখ ঠেরে অনেক কথা বলতে পারেন কিন্তু যা সত্য তা সত্যই। আধুনিক ভারতবাসী নানা রকম প্রগতিশীল মতাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, পররাজ্যগ্রাসকে তাঁরা নিন্দনীয় কাজ বলে নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর চেতনায় রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি পররাজ্য গ্রাস ও আধিপত্যবাদমূলক পৌরানিক যজ্ঞকর্ম এখনো অনুপ্রেরনার উৎস

www.pathagar.com

হিসেবে জাজ্বল্যমান।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে বলা হয় আধুনিক ভারতের আত্মা। তিনি বহুবার স্বীকার করেছেন—প্রাচীন ভারতের সনাতন ধর্মে তার বিশ্বাস অগাধ এবং যে মূল্যবোধ তিনি বহন করেন তার একমাত্র উৎস বৈদিক ধর্ম। *

বৈদিক ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তনকারী মহাকাব্য মহাভারতকে পঞ্চম বেদ এর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। সকল বেদের সার নাকি সংকলিত হয়েছে মহাভারতে। এই মহাভারতের অবিসংবাদী পুন্যাত্মা মহা-তত্ত্বজ্ঞ সত্যাশ্রয়ী পুরুষ হলেন ভীষ্ম। মহাভারতের কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বলে কীর্তিত হলেও তার চরিত্র অমল নয়। যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র, পুন্যাত্মা বলে পরিচিত, তবু মিথ্যা ও ছলনা তাকেও মাঝে মাঝে স্পর্শ করেছে। যদিও সে সত্য ও ছলনাকে সত্যের মুখোস পরাবার চেষ্টা কম হয়নি কিন্তু ভীষ্মকে কখনও মিথ্যা আশ্রয় হয়ত করতে পারেনি। মহাভারতের এই পুণ্যপুরুষ ভীষ্ম রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজ ধর্ম বিষয়ক অনেক উপদেশ দান করেছিলেন। মহাভারতের শান্তি পর্বে তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

রাজসূয় একটি পৌরানিক যজ্ঞ। রাজাদের মধ্যে যারা রাজচক্রবর্তী হতে চান তাকে এই যজ্ঞ করতে হয়। এই যজ্ঞ অতিশয় পুণ্যের কাজ। এই পুণ্যকর্মটি হলো অন্য রাজাদের পরাজিত করে করদানে বাধ্য করা আর যে রাজা কর দিতে রাজি না হয় তাকে জয় করে হত্যাকরা এবং তার রাজ্য নিজের সম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করে নেয়া। এই পুণ্য কর্মটি সমাপনের পর যিনি রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট হবেন মৃত্যুর পর তার জন্য হিন্দুর স্বর্গে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম বাসস্থান নির্দিষ্ট আছে। তাছাড়া সাধারণভাবে যুদ্ধের দ্বারা রাজ্যবিস্তার সনাতন ধর্মানুসারে একটি পুণ্যকর্ম। রাজ্যবিস্তারের জন্য যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলতে সনাতন ধর্মাত্মারা কেউ আপত্তি করেননি। এই যুদ্ধে জয়লাভ করলে ত্রিলোকে খ্যাতিলাভ তো আছেই, যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিলেও স্বর্গের বীর লোকে তার স্থানলাভ নিশ্চিত। আধুনিক ভারতীয় শাসকদের রাজনৈতিক মূল্য বোধ তাই পররাজ্য দখলের প্রশ্নে পীড়িত হয় না।

এটাকে একটা গুরুতর নিন্দাবাদ বলে মনে হতে পারে। অনেকে ভাবতে পারেন ভীষণ রকম অসূয়াপরবশ হয়েই বুঝি এই রকম অভি-যোগ করা হচ্ছে। কিন্তু তা নয়। নিছক নিন্দা জানাবার জন্য এ

www.pathagar.com

অভিযোগ তোলা হয়নি, অসূয়াপরবশ হয়েতো নয়ই। যদি বলি ভারত তার সনাতন ধর্মের যা কিছু ভাল তা পরিত্যাগ করেছে এবং মন্দটুকু গ্রহণ করেছে তাহলে বোধ করি একটুও অতিরঞ্জিত হয় না। ভীষ্ম কথিত রাজধর্মে বলা হয়েছে 'যাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করবে কদাচ তার ক্ষতিসাধন করবে না। কিন্তু ভারত আমাদের একটা স্বীকৃত বন্ধু হয়েও নানাভাবে আমাদের ক্ষতিসাধন করেছে এবং এখনো করে চলেছে। ফারাক্কা একটি সমস্যা যা ভারত তৈরী করেছে, অর্থনৈতিক ভাবে বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এবং এটিকে একটিরাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে তুলে রাখা হয়েছে প্রয়োজনমত দমনের কাজে ব্যবহারের জন্য। দুনিয়ার মানুষ জানে, বাংলাদেশের ৯ কোটি লোকের সম্মিলিত প্রতিবাদ সত্বেও ভারত ফারাক্কা সমস্যা সমাধান না করে জীইয়ে রেখেছে।

আধুনিক ভারতের স্থপতি বলে সম্মানিত পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু তাঁর ভারত আবিষ্কার গ্রন্থে ভারতবর্ষের আদি সীমানা অনেক বিস্তৃত করে দেখিয়েছেন। মহাভারতের বর্ণনা থেকেও দেখা যায় ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলসহ চীনের বিপুল অঞ্চল, আফগানিস্তান, এমনকি সোভিয়েত রাশিয়ার অংশবিশেষও আদি ভারতের অংশ ছিল। রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা করে অনেক রাজচক্রবর্তী সমাগরা পৃথিবীর অধিকার হয়েছিলেন। মহাভারতের বর্ণিত 'সমাগরা' পৃথিবীর অধিশ্বর সেই সব অগণিত নৃপতির কীর্তি-কাহিনী আধুনিক ভারতীয় শাসকদের সম্প্রসারবাদী আকাঙ্খাকে এখনও উদ্দীপিত করে না—এমন ভাববার কোন কারণ নেই। ১৯৬২ সালে চীন ও ভারতের মধ্যে এক সাংঘাতিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ভারতের মর্মান্তিক পরাজয় ঘটে। চীন ভারতের সীমান্তবর্তী অনেক এলাকা দখল করে নেয়। কিন্তু পরে একতরফাভাবে চীন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। এবং বিজয়ের মুখে চীনা সৈন্যরা অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের এলাকায় চলে যায়। চীনের রেড ফ্যাগ পত্রিকা চীন ভারত যুদ্ধের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জওহর লাল নেহেরুর দর্শনের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে। নেহেরু বিশ্বাস করতেন, আধুনিক ভারতবাসীরা তাদের 'পৈত্রিক সাম্রাজ্য' পুনরুদ্ধার করতে একদিন সক্ষম হবেই। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর স্বপ্ন ভারতীয় শাসকরা পরিত্যাগ করেছে তা ভাবা উচিত নয়।

www.pathagar.com

ভারত বাংলাদেশের দঃ তালপট্টি দ্বীপ দখল করেছে। আমরা বাংলাদেশের অধিবাসীরা ভারতের এই আচরণকে যতই নিন্দা করি, ভারতকে সম্প্রসারণবাদী বলে আখ্যায়িত করে তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য যতই আকুল আহবান জানাই, ভারত দঃ তালপট্টি দ্বীপ সহজে ছেড়ে দেবে না তা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সম্প্রতিক বক্তব্য থেকেই পরিস্কার বোঝা গেছে। তারা মনে করেন, এ দ্বীপটি ভারতের 'অবিচ্ছেদ্য, অংশ। এই 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' শব্দটি ভারতকে ইতিপূর্বে অনেকবার উচ্চারণ করতে আমরা শুনেছি। ভিন্ন রাষ্ট্রের দখলকৃত কোন এক বা একাধিক এলাকা গায়ের জোরে দখল করে নেবার পরই ভারত এই শব্দটি উচ্চারণ করেছে। এই ভারতীয় স্টাইলটির সঙ্গে উপমহাদেশের অনেক জনপদের লোকেরই পরিচয় ঘটেছে।

ভারত ইদানিং কালের একটি মিনি সুপার পাওয়ার বলে পরিচিত। সে তার সুপার পাওয়ার নামের আগে 'মিনি' বিশেষণটি ত্যাগ করে যত-শিঘ্র একটি সাবালক সুপার পাওয়ার হওয়া যায় সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে প্রাণ-পণে এবং এই লক্ষ্য সামনে রেখেই সে উপমহাদেশে তার আধি-পত্যের অঞ্চল সম্প্রসারনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে একের পর এক। ভার-তের এই আধিপত্যবাদী আকাঙক্ষার আর এক শিকার সিকিম।

প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের স্বাধীনচেতা মনোভাব সেকারনেই তার পছন্দ হয় না। কিন্তু পছন্দ না হলেও কৌশলগত কারণে অনেক সময় সহ্য করে নিতে হয়। যখন রাজনৈতিক আগ্রাসন সুবিধাজনক নয় বলে মনে-হয় তখন চালাতে হয় অর্থনৈতিক আগ্রাসন। বাংলাদেশের উপর সে এতদিন অর্থনৈতিক আগ্রাসন চালিয়েছিল, এখন সামরিক আগ্রসন চালাতেও দ্বিধা করছে না।

১৯৭১ এ ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ দখলের পর ভারত এখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিল সেটাকে অনেকে ইতিহাসের একটি মহৎ দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করার চেষ্টা করে থাকেন। অন্য রাষ্ট্রের কোন ভূখণ্ড দখল করার ইচ্ছা থাকলে ভারত নাকি এ ভাবে একতরপা সৈন্য প্রত্যাহার করতো না। ১৯৭১ এ বাংলাদেশ থেকে ভারতের সৈন্য অপ-সারণ কোন মহৎ বা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আমাদের কোন গরজ নেই। আমরা দেখেছি বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে একে একে লাঠি টিলা, তিন ভিঘা, আঙ্গুর পোতা, দহগ্রাম প্রভৃতি

www.pathagar.com

অঞ্চল ভারত গ্রাস করেছে, কিন্তু এসব অঞ্চলের পরিবর্তে বাংলাদেশকে কোন ভারতীয় ভূখণ্ড প্রত্যর্পণ করেনি। বরং বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি মৌখিক সম্মান দেখিয়েই সে বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর আপন প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য ফারাক্কা সমস্যা জীইয়ে রেখেছে, করিডোর চুক্তিতে বাধ্য করেছে এবং অমর্যদাকর অনেক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে যা আমরা জানিনে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ট মহল সূত্রে জানা গেছে, ভারত মহাসগরের দিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করায় ভারত উদ্বিগ্ন। সে দঃ তালপট্টি দ্বীপে আর একটা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি গড়ে উঠুক তা চায় না। প্রতিবেশী কোন দেশের উপকূলীয় সীমানার মধ্যে জেগে ওঠা দ্বীপের উপর আপন দখল কায়েম করার জন্য এ ধরণের যুক্তি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবতঃ খুব বেশী নেই। ভারতের যে কোন ন্যক্কারজনক কাজকেই যারা মহত্বের মুকুট পরিয়ে ন্যায়সঙ্গত করে নেবার ফিকির করে বেড়ায় সেরকম জোহুজুর মার্কা ভারতীয় মোসাহেবের অভাব এদেশে না থাকতে পারে তবে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ এই কুযুক্তিতে ভুলবে না।

বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ দঃ তালপট্টি দ্বীপের উপর ভারতের দখল সম্প্রতি ঘটলেও পরিকল্পনাটা খুবই পুরনো। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল সম্পদে খুবই সমৃদ্ধ এটা জানার পর থেকেই ভারত এলাকাটির উপর দখল নেবার নানান ফন্দি ফিকির করে আসছে। যতদিন বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্গত ছিল ততদিন এদিকে সে নজর দেবার সাহস পায়নি। এখন বাংলাদেশকে সে—ভাবে নির্বান্ধব ও দুর্বল। কাজেই বাংলাদেশকে নিয়ে সে যা খুশী তাই করতে পারে। বিশেষ করে '৭১-এর যুদ্ধে সে বাংলাদেশের জনগণকে কথিত সাহায্য করার বিনিময়ে এদেশের অভিভাবক সেজে বসেছে। এবং একদা 'উপকার' করার বিনিময়ে আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে রেখেই সে সন্তুষ্ট হচ্ছে না তথাকথিত উপকারের বিনিময়ে এদেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতার উপরেও সে হস্তক্ষেপ করতে চাইছে।

ভারত সম্পর্কে আমাদের দেশের জনগণের একাংশের মনে একটা মোহাচ্ছন্ন ধারণা আছে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। পাকিস্তানের

www.pathagar.com

৩৪ বছরের জীবনকালের মধ্যে প্রায় ২২ বছর চলেছে সামরিক শাসন, সেখানে ভারতে একবারও সামরিক শাসন জারি হয়নি। আভ্যন্তরীণ সংকটের মধ্যেও ভারত পার্লামেন্টারী শাসন টিকিয়ে রেখেছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যেখানে সেনাবাহিনীই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল নিয়ামক, সেখানে ভারতে এখনও গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা বিদ্যমান। কিন্তু অন্য দেশের ভূখণ্ড দখল করার ব্যাপারে যে এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় না মোহবশতঃ আমরা অনেকেই তা ভুলে যাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সে দেশের গণতন্ত্র ভারতের তুলনায় অনেক বিকশিত। গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রতি সে দেশের জনগণের শ্রদ্ধাও প্রশ্নাতীত কিন্তু ভিয়েতনামের উপর সামরিক অভিযান চালাতে মার্কিন সিনেট কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। একইভাবে আফগানিস্তানের উপর রুশ হামলার বেলায়ও সোভিয়েতের সুপ্রিম কম্যাণ্ড কোন বাধা আরোপ করেনি। অর্থাৎ আভ্যান্তরিন ক্ষেত্রে কোন দেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অন্য দেশের উপর আধিপত্যবিস্তার কিংবা অন্যদেশের ভূমি দখলে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কাজেই ভারত একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ—অতএব সে প্রতিবেশী দেশের উপর আগ্রাসন চালাতে পারে না—যুক্তি হিসেবে এর কোন মূল্য নেই। যদিও অবশ্য আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ভারতের গণতন্ত্রপ্রিয়তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা যায় কিন্তু অন্যদেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে আমরা নাক গলাতে চাইনে।

আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবিস্তারের আদি ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। এবং ভারতও শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশমান একটি আধুনিক রাষ্ট্র। তথাপি সনাতন অর্থে সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্খা সে ত্যাগ করেনি যদিও সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশের এলাকায় বাণিজ্যিক আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টাও সে চালিয়ে যাচ্ছে। সে একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় নিজের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; আবার পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্খায় বৃহৎ পরাশক্তিদ্বয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতাও চালিয়ে যাচেছ। ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা ঘোষণার দাবীর সঙ্গে সঙ্গে দঃ তালপট্টি দ্বীপ দখল করে সে নিজেই কারণ হচেছ ভয়ানক রকম শান্তিভঙ্গের।

www.pathagar.com

ভারত কর্তৃক দঃ তালপট্টি দ্বীপ দখল নিয়ে বাংলাদেশের জনগণ যখন ঘৃণা ও প্রতিবাদে সোচ্চার, ঠিক তখনই দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে নক্ষত্র পতন ঘটে যায়। ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ৩০শে মে, আকস্মিকভাবে দুষ্কৃতিকারীদের হাতে শহীদ হন। জাতীয় জীবনের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় জাতি এমনভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়ে যে দঃ তালপট্টির ব্যাপারে আর মনোযোগ দেবার মত অবস্থা থাকে না। কিন্তু শোক যত বড়ই হোক শোকে মুহ্যমান হয়ে বসে থাকলেই তো আমাদের চলবে না। চীনের প্রধাসমন্ত্রী চৌ-এন লাইয়ের মৃত্যুর পর চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শোক বাণীতে বসেছিলেন, শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে। আমরাও আমাদের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর শোককে শক্তিতে পরিণত করে ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

* "সনাতন ধর্ম্মবাদ বা হিন্দুবাদ যে সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দেয়, তার ভিত্তি হলো, এক অনড় বর্ণপ্রথা,—যা মানুষের মানবিক মর্যাদাকে কখনো স্বীকার করে না। মানুষে মানুষে সমতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে পদদলিত করে শুধুমাত্র জন্ম সূত্রেই মানুষকে উচুঁ নীচু নানা সম্প্রদায়ে ভাগ করে রাখে। এই সমাজ ব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি হলো, আত্মার পুর্নজন্মবাদ। একজন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাবার ভিত্তি হলো, পূর্বজন্মে সে সাধু জীবন যাপন করেছিল, পক্ষান্তরে একজন অস্পৃশ্যের অস্পৃশ্য হবার কারণ হলো, সে পূর্বজন্মে ছিল একজন পাপী। অতএব অস্পৃশ্যের পক্ষে তার নিজের ভালোর জন্যই ব্রাহ্মণ সন্তানকে পূজা ও সেবা করা উচিৎ দাসের মত।

মহারাষ্ট্র নেতা বালগঙ্গাধর তিলক ১৮৯৫ সালে তাঁর রামগড় ভাষনে ব্যার্থ·····ব্যার্থহীন ভাষায় ঘোষনা করেছিলেন, 'এই উপ-মহাদেশের মুসলমান অধিবাসীরা হলো বিদেশী দখলদার, কাজেই তাদের শারীরিক ভাবেই নির্মূল করা দরকার।' তিলকের এই বক্তব্যের নৈতিক উৎস হলো, মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণে আর মহারাষ্ট্রীয় শিবাজী। এটাই হলো হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রকৃত রূপ।

www.pathagar.com

অখণ্ড ভারত

ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষী ও বহু জাতীয়সত্ত্বা অধ্যুষিত একটি বিশাল দেশ। তিন দিকে সাগর মহাসাগর ও একদিকে বিশাল সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা বেষ্টিত এই বিশাল ভূভাগকে দেশ না বলে বলা হয় উপ-মহাদেশ। এই উপমহাদেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন। মধ্য এশিয়া থেকে আর্যরা যখন এদেশে আসে তার আগে এই উপমহাদেশ সভ্য ছিল না বলেই পণ্ডিতদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল। ১৯২১/২৪ সালের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের এক পর্যায়ে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা আবিষ্কারের পর পণ্ডিতদের আগের ধারণা বদলে যায়। অর্থাৎ মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা যে আর্যদের চেয়েও অনেক উন্নত ছিল তা প্রমাণিত হয়। পণ্ডিত-দের ধারণা, ভারতের সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা ও সুমের আক্কাদের সভ্যতার সমসাময়িক। উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হলো, ইংরেজ শাসনের আগে সম্ভবতঃ এই ভারতীয় উপমহাদেশ কোনদিন কোন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-শক্তির অধীনে ছিল না। ইংরেজ পূর্বকালে একমাত্র মোগল শাসনের এক পর্যায়ে বিশাল ভারতবর্ষ একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির অধীনে আনার চেষ্টা হয়েছিল এবং খুব অল্পদিনের জন্য এ চেষ্টা আংশিকভাবে ফলবতীও হয়েছিল। অবশ্য ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু, শাসনামলে সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি সাম্রাজ্যের অধীনে সংগঠিত করার চেষ্টা বহুবার হলেও তা কোনদিন সফস হয়নি। শুদ্র বংশোদ্ভূত শিবাজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষকে এক মহাহিন্দু রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন অনেকে দেখেছিলেন কিন্তু সে চেষ্টাও করুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এক মহা হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার নেতৃত্বে শিবাজীকে অভিষিক্ত করার জন্য শুদ্র শিবাজীকে ক্ষত্রীয় বানাবার ব্রাহ্মণ্যবাদী চেষ্টার কথা ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন। কিন্তু উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া ঐক্য ছাড়া ভারতবর্ষের নিজস্ব ঐক্য-প্রচেষ্টা কোন দিন সফল হয়নি, ইতিহাসে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে।

www.pathagar.com

বৃটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বাধীন ভারতকে এক মহা হিন্দু রাজ্যে (রামরাজ্য) রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন অনেক নেতাই। এমনকি এম, কে, গান্ধীর মত ভারতীয় নেতাও এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করার ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রচেষ্টায় শরিক হয়েছিলেন আজীবন। কিন্তু বাস্তব কারণেই সে চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমির দাবী স্বীকৃতি লাভ করে এবং পাকিস্তান ও ভারত এই দু'খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয়। অতঃপর কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা খণ্ডাবশিষ্ট ভারতবর্ষ নিয়েই তাঁদের রামরাজ্যের স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা শুরু করেন। অবশ্য কথিত রামরাজ্যের স্বপ্ন মিঃ গান্ধীই প্রথম দেখেছিলেন তা নয়, তার আগে শ্রীবাল গঙ্গাধর তিলকও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেছিলেন। তবে রামরাজ্যের কনসেসেপ্শন একশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে বিশেষ করে ব্রহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের বয়স্ক হিন্দুদের মধ্যে খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

মহাকবি বাল্মিকীকৃত রামায়নের রাম পুনর্জন্মবাদী হিন্দুদের চোখে হলেন স্বয়ং ভগবান। কথিত হয় যে, ভগবান প্রজাপতি চতুর্খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পুরানোক্ত অযোদ্ধার রাজা দশরথের রামলক্ষণাদি চারপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে শ্রীরাম 'পৃথিবীব্যাপী' এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রসঙ্গতঃ বলে নেয়া দরকার যে, ভারতবর্ষীয় ভূগোল অনুযায়ী পৃথিবী বলতে মধ্যভারতই, উত্তরের হিমালয় প্রদেশ হলো স্বর্গলোক আর দক্ষিণের সমুদ্রউত্থিত প্রদেশ হলো পাতাল বা নাগলোক। এই হলো ভারতীয়দের মতে সারা পৃথিবী!

যাহোক, রামরাজ্যের প্রবক্তা কংগ্রেস নেতাদের চোখে 'রামরাজ্য' হলো ন্যায়ের প্রতীক, শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনাহীন সর্বজনের জন্য এক সুখকর আবাস ভূমি হলো রামরাজ্য। কিন্তু এই শ্রীরাম শাসিত রামরাজ্যের কতিপয় সুবিদিত ঘটনার কথা মনে রাখলে কথিত রামরাজ্যের ন্যায়শাসনের স্বপ্নকাজল আমাদের চোখ থেকে মুহূর্তে বিলিন হয়ে যায়। রাজা রামচন্দ্র বেদপাঠনিরত এক নিষাদবালকের কানে তপ্ত শিষা ঢেলে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন এবং অকারণে বালী নামের এক বানর বংশীয় রাজপুত্রকে হত্যা করেছিলেন। রাজা রামচন্দ্রের শাসনকালের এই চিরস্থায়ী অকীর্তির কথা সম্যক অবহিত

www.pathagar.com

থেকেও যারা রামরাজ্যের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন, তাদের মনে যে অন্য প্রকার অভিসন্ধি বিদ্যমান ছিল তা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য আজকের দিনের আধুনিক ভারতবাসীর মন থেকে সে রামরাজ্যের ধারণা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, কারণ ৬৭ কোটি অধিবাসীর মধ্যে ৪০ কোটিরও বেশী হলো শূদ্র—কথিত রামরাজ্যে যাদের সর্বপ্রকার জ্ঞানচর্চা ছিল নিষিদ্ধ। পরবর্তীকালে ডাঃ মেঘনাদ সাহা প্রমুখ কতিপয় অব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শুদ্রযোনীসম্ভূত, অনেক ভারতবাসী জলচল হয়েছেন। তবু এখনও নানাবৃত্তিজীবী অগণিত ভারতবাসী অস্পৃষ্যতার অভিশাপে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত জীবন যাপন করছেন—তথাকথিত রামরাজ্যের উদগাতা যাদের 'আদর' করে বলতেন 'হরিজন।'

আজ এটা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার যে, কথিত রামরাজ্যে যেহেতু শূদ্রের কোন সম্মানজনক স্থান নেই অথচ আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতবর্ষে শূদ্ররাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়ে সারা ভারতের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা একটা স্ববিরোধী প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে যেভাবে রাজ্যে রাজ্যে অসন্তোষ পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছে তাতে নানাবিধ ভাষা, ধর্ম ও জাতিসত্তা অধ্যুষিত বিশাল ভারতবর্ষকে ব্রহ্মণ্যবাদী এক কেন্দ্রীয় শাসনের নিগড়ে আর বেশী দিন বেঁধে রাখা যাবে না।

খবরের কাগজের পাঠকেরা জানেন, উত্তর পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যে (আসাম, হিমাচল, অরুণাচল, ত্রিপুরা প্রভৃতি) 'বিদেশী খেদাও' আন্দোলন দীর্ঘদিন যাবত শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার শত চেষ্টা করেও সে আন্দোলন দমন করতে পারছেন না অথচ ঐসব প্রদেশ থেকে যাদেরকে বিদেশী বলে তাড়াবার চেষ্ট করা হচ্ছে ভারতীয় সংবিধান অনুসারে তারা কেউই বিদেশী নয়, ভারতীয়।

ব্যবসা চাকুরী কৃষিকর্ম ইত্যাদি নানা উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহুলোক উত্তর পূর্ব ভারতের এইসব অঞ্চলে বসবাস করছে এবং পুরুষানুক্রমে অনেক বাঙালী ও বাস করছে। অনেক গুজরাটি ব্যবসায়ী প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ এই পার্বত্য রাজ্যগুলিতে বছরের পর বছর ধরে ব্যবসাপাতি করছে। আজ এই অঞ্চলের জনগণ শিক্ষাদীক্ষার মাধমে

www.pathagar.com

সচেতন হয়ে বুঝতে পারছে দেশের ব্যবসা চাকুরী প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে তারা নিজ আবাস ভূমিতেই বিদেশীর মত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে বা হচ্ছে।

শিক্ষায় পশ্চাৎপদ থাকার দরুন চাকুরীর ক্ষেত্রগুলি অধিকাংশ দখল করেছে বাঙ্গালীরা। পূর্ব থেকেই দরিদ্র ছিল বলে অঞ্চলের ব্যবসা-পাতি দখল করেছে গুজরাটি-মাড়োয়ারী প্রভৃতি বণিকরা। তাছাড়া ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বিপুলসংখ্যক অন্য প্রদেশবাসী ডাক্তার, উকিল ঐ সব অঞ্চলে প্রাকটিস শুরু করে এখন অনেকটা কায়েমী হয়েই বসবাস করছে। পার্বত্য অঞ্চলের এই সাতটি রাজ্যের অধিবাসীরা আজ ঠেকে ঠেকেই বুঝতে সক্ষম হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন অখণ্ড ভারত তথা রামরাজ্যের শ্লোগান দিয়ে তাদেরকে এ যাবত ঠকিয়েই এসেছে। আরও ঠকতে তারা রাজী নয়।

বলা লাহুল্য যে, এই 'বিদেশী খেদাও' আন্দোলন প্রথমদিকে আপাত-নিরীহ মনে হলেও তা যে চূড়ান্ত পর্যায়ে বিচ্ছিন্নতাবাদেই পর্যবসিত হবে বা ইতিমধ্যে সেই দিকেই মোড় নিচ্ছে—সচেতন ব্যক্তি মাত্রেই তা উপ-লব্ধি করতে পারছেন। এবং এই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বের পার্বত্য এলাকাতেই সীমাবদ্ধ—তাও নয়। ইতিমধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলেও বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে এবং কেরালা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসন এখন বলতে গেলে খুবই নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন তার কৃত্তিমতা আজ ভারতীয় জনগণের কাছে সুস্পষ্ট। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের অর্থনৈতিক দুর্দশা যখন অবর্ণনীয়, তাদের ভাঁড়ারে মা ভবানী, তখন তাদের দাবীদাওয়ার জবাব দেয়া হচ্ছে লাঠিতে আর বুলেটে। মহারাষ্ট্রীয় কৃষকদের লংমার্চ থেকে হাজার হাজার কৃষককে বন্দী করে জেলে পোরা হয়েছে আর মুখে আওড়ানো হচ্ছে অখণ্ড আর ঐক্যবদ্ধ ভারতের। উদাহরণ আরো দেয়া যায় কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। মোট কথা, ভারতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই মৌখিক ঐক্যপ্রচেষ্টা 'মুখে শেখ ফরীদ আর বগলে ইটের' মতই প্রতারণায় ভরা। সুখের বিষয়, ভারতের সংখ্যাগুরু শূদ্র জনগণের চোখের সামনেই কেন্দ্রীয় নেতাদের বগল থেকে সে ইট খসে পড়েছে।

www.pathagar.com

সামান্য দু'একটি রাজ্য ছাড়া সর্বত্রই ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। কোন সামাজিক দ্বন্দ্ব একবার সৃষ্টি হলে তার যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত তার শেষ হয় না—এ কথাটি যদি সত্য হয়, তাহলে অতি শীঘ্রই হয়তবা দেখা যাবে, ভারত জুড়ে নানা জাতিসত্ত্বার নানা ভাষাভাষী জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন—অবশ্যই তা কেউ চাক কিংবা না চাক।

তাবলে এমন কথাও আমরা বলি না যে ভারতীয় উপমহাদেশ কোন দিন একটি অভিন্ন আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই আদর্শ কোন্‌টা? একথা ঠিক যে, বাইরে থেকে কেউ কারো আদর্শের নির্দেশনা দিতে পারে না। তবে যে কোন আদর্শের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো, যে আদর্শ মানুষকে শোষণ থেকে, বঞ্চনা থেকে, আধিপত্যের অবমাননা থেকে মুক্ত হবার পথ দেখায় সেই আদর্শই গ্রহণযোগ্য।

বর্তমানে একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, প্রাচীনকালে আর্য আক্রমণের পূর্বে ভারতীয় জনগণ এক মহান সভ্যতার অধিকারী ছিল। তারা কৃষি কাজ শুধু জানতো তাই নয়, ভারতীয় কৃষি এতদূর বিকশিত হয়েছিল যে, কৃষি উদ্বৃত্তের উপর নির্ভর করে একাদিক নগরও তারা নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছিল। তারা কৃষিকাজে বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর না করে এক অতি উন্নত সেচব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্রে তার অজস্র স্মারক এখনো টিকে আছে। সেই কৃষি-নির্ভর সভ্যতা পশুপালক বহিরাগত আর্যরা নির্মমভাবে ধ্বংস করে। এবং কালক্রমে যুদ্ধ বিদ্যায় কম পারদর্শী ভারতের স্থানীয় জনগণকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে ওদের দেবদেবীগুলোও ছিনিয়ে নেয়। এদেশের প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে সমগ্র জনগণকে চারটি বর্ণে ভাগ করে। নিজেরা হয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয় আর স্থানীয় জনগণ হয় বৈশ্য ও শূদ্র। আর্য পণ্ডিতরা এই গল্প প্রচার করে যে ভগবান প্রজাপতি তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ বাহু থেকে ক্ষত্রের সৃষ্টি করেছেন এবং ভগবান প্রজাপতির মুখ থেকে আগুন ও পদতল থেকে মাটিও সৃষ্টি করেছেন, অতএব বৈশ্য শূদ্রাদি ব্রাহ্মণেতর জন-

www.pathagar.com

গণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয়দের সেবা করবে। এবং এই সেবার মধ্য দিয়েই তাদের মোক্ষ লাভ হবে।

অবশ্য ভারতীয় জনগণের এই বর্ণ বিভাগের আদি তাৎপর্য নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে পাণ্ডিত্ব বজায় রাখার জন্য নানা বিতর্ক আছে, তবে এই বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, ভারতের স্থানীয় জনগণ, যারা কৃষি, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি নানা রকম বৃত্তিমূলক ও দৈহিক শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত ছিল তারাই শূদ্র ও বৈশ্য বলে চিহ্নিত হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকদের সঙ্গে তারা কোন প্রকার সামাজিক, বিবাহ, পংক্তি-ভোজন, সমআসনে উপবেশন ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে মিলিত হতে পারতো না। ভারতীয় পুরান সাহিত্যে উচ্চবর্ণ কর্তৃক শূদ্রনিগ্রহের বহু নজীর দেখতে পাওয়া যায়।

বর্তমানে ভারতে বহু জাতিসত্তা, বহু ভাষা ও বহু ধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলী 'সনাতন' হিন্দু ধর্মের অনুসারী। সনাতন বলতে শাশ্বত বা চিরন্তন বোঝানো হয় কিনা জানিনে, তবে সনাতন ধর্ম অর্থে ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণাশ্রম প্রথার প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষক হিন্দু ধর্মকেই বুঝতে হবে। এই ধর্ম মানুষে মানুষে সমতার আদর্শে বিশ্বাস করে না — মানুষের মধ্যে উচ্চ ও নীচের ব্যাখ্যায় তারা পূর্বজন্মকৃত পূণ্য ও পাপকেই নির্দেশ করে থাকে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই শূদ্রশ্রেণীতে জন্মলাভ করে যে পূর্ব জন্মে পাপ করেছিল। অন্য পক্ষে বহু পূণ্যকর্মের অনুষ্ঠাতা পুরস্কৃত হয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করে। ধর্মের এই বিধান এমনই অনড় যে, এই বিংশ শতাব্দীর পরমাণুর যুগেও ভারতের অগণিত শূদ্র জনগণকে তার অচলায়তন বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, ইতিহাসের এই কৌতুককর অধ্যায় ভারতের বুকে স্থায়ী হয়েছে প্রায় দুই সহস্রাব্দ যাবৎ। কিন্তু বর্ণাশ্রম প্রথার এই অচলায়তন অচিরে ভেঙে পড়বে ভারতের সকল জনপদেই তার চিহ্ন ইতিমধ্যে ফুটে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

ভারতের বুকে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রথম উত্থিত হয় বহিরাগত মুসলিম অভিযানকারীদের মুখে। বিপুলসংখ্যক ভারতবাসী ইসলামের সাম্য মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। আজ ভারতীয় উপমহাদেশে দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র ছাড়াও ব্রাহ্মণ্যবাদ শাসিত ভারতেই মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১২

www.pathagar.com

কোটি বা তারও বেশী। উত্তর-পূর্ব ভারতের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাজ্য-গুলির অধিবাসীরা অধিকাংশই বর্ণাশ্রম বিরোধী। অন্যান্য রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মতবাদও ভারতে বিশেষ সোচ্চার—কাজেই ব্রাহ্মণ্যবাদ অর্থাৎ আর্যবাদ প্রচারিত অমানবিক বর্ণাশ্রম প্রথা ভারতে আর বেশী দিন টিকে থাকতে পারবে না তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। ভারতের মহান জনগণ তখন হয়ত মহত্তর কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই অমানবিক প্রথা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করবেন। সেই অদেশের প্রসঙ্গেই আমাদের মহান ইসলাম ধর্মের কথা মনে পড়ে। কেননা, একদা ভারতের বিপুল জনগণকে ইসলামই তার সাম্য-মৈত্রী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছিল, হয়ত ভবিষ্যতেও দিতে পারবে। অনেকে মনে করেন, ইসলাম বুঝি শুধু মুসলমানের। কিছু সংখ্যক স্বল্প শিক্ষিত 'উলেমা'র কল্যাণে এই ভুল ধারণার জন্ম হয়েছে ঠিকই কিন্তু বস্তুতঃই কি ব্যাপারটা তাই? দেশ-কাল-ভাষা বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য তো বটেই—ইতর প্রাণী এমনকি উদ্ভিদ জগৎ অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান এই বহির্জগৎ এবং এর বাইরে অস্তিত্বশীল সকলের জন্যেই ইসলাম—এই বক্তব্য কি বহুবার বহুভাবে পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হয়নি?

আজ ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে সবত্রই অনৈক্য ও আদর্শের সংকট দেখা যাচ্ছে। এ সংকট চিরদিন থকেবে না। প্রকৃত আদর্শকে মানুষ ঠিকই চিনে নিতে পারবে এবং একবার সঠিক পথের সন্ধান পেলে লক্ষ্যে পৌঁছাতেও তার দেরী হবে না।

www.pathagar.com

গৃহ যুদ্ধের আগুন যদি লাগেই

দেশে বেশ কিছুদিন যাবত অবাঞ্ছিত একটা বিষয় নিয়ে আবার হৈ-চৈ শুরু হয়েছে। বিষয়টা মুক্তিযোদ্ধা বনাম রাজাকার আলবদরের দন্দ্ব। এই দন্দ্ব দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘাতের রূপও নিয়েছে। উভয় পক্ষে বেশ কিছু লোক হতাহতও হয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা থামেনি। তুলোর বালিসে আগুন লাগলে যেমন বাহির থেকে তেমন বোঝা যায় না অথচ হঠাৎ হঠাৎ আগুন আত্মপ্রকাশ করে, নিভেও নিভতে চায় না মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার দ্বন্দ্বেরও তেমন মীমাংশা হচ্ছে না বরং জাগিয়ে রাখা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য তৈরি হচ্ছেন, দেশের বিভিন্ন এলাকায় রাজাকার আল বদরের তালিকা প্রনয়ন করার উদ্যোগে নিচ্ছেন, অন্যদিকে বিপক্ষীয়রাও বসে নেই, তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রনয়নের চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং চুড়ান্ত এক সংঘাতে লিপ্ত হবার প্রস্তুতি সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

৭১ সালে দেশকে দুটিস্পষ্ঠভাগে ভাগ করা হয়েছিল। পাকিস্তানী শাসকরা পূর্ববাংলার সমুদয় সম্পদ শোষন করছে—অতএব এদেশ থেকে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে 'স্বাধীনতা' অর্জন করতে হবে এই মতের অনুসারী একটা পক্ষ। আর এক পক্ষ হলো, পশ্চিমা শোষণ থেকে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হবে কিন্তু পাকিস্তানের কাঠামো ঠিক রেখে। ৭১ এর ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সমুদয় ঘটনা দেশবাসী জানেন, কাজেই তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে এদেশের পাকিস্তান সমর্থকদের কলাবরেটর অডার্স ও প্রেসিডেন্টের ৫০ ধারা অনুযায়ী গ্রেফতার করে জেলে আটক করে এবং কয়েক মাস পর এক সাধারণ ক্ষমার আওতায় দেশ গঠনে সবার সহযোগিতা আহবান করে তাদের মুক্তি দেয়। দেশের একতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষে গৃহীত আওয়ামী লীগের সেই পদক্ষেপকে দেশ বিদেশে সকলেই স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। ব্যাপারটা এক রকম মিটে গিয়ে ছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু ঘটনার প্রায় দশ বছর পর আবার নতুন করে সমস্যাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এমনি এমনি উঠেছে তা ভাবার অবশ্য কোন কারণ নেই। পানি ঘোলা করে সেই ঘোলা পানিতে যারা মাছ ধরার গোপন ইচ্ছা মনে মনে পোষন করেন এই অবাঞ্ছিত ব্যাপারটা জাগিয়ে তুলেছেন তারাই।

বিগত দশ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনেকগুলি যুগান্তকর ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান প্রনয়ণ ও পরে চতুর্থ সংশোধনী এনে তার অধঃপতন ঘটানো এবং ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের ঘটনা প্রধান। এর আশি দিন পর নভেম্বরের জওয়ান জনগণের সম্মিলিত অভ্যুত্থান আওয়ামী লীগ শাসনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটায়। শাসন ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে চলে যায় সেনাবাহিনীর হাতে। বিগত বছরগুলিতে রাজনীতির বহিরঙ্গে আরও অনেক ছোট বড় ঘটনা ঘটেছে কিন্তু অন্তর্গত রাজনীতিতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, গঠিত হয়েছে মন্ত্রী সভা কিন্তু মন্ত্রী সভা জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী নয়, দায়ী প্রেসিডেন্টের কাছে, প্রেসিডেন্ট কারো কাছেই দায়ী নন। জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় সদস্যরা এই জাতীয় সংসদকে বলেন, প্রেসিডেন্টের রাবার ষ্ট্যাম্প। এরই মধ্য দিয়ে দেশ চলছে।

বর্তমান রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাসীন হবার এক পর্যায়ে শাসনতন্ত্রে পঞ্চম সংশোধনী জারি করে তারই আওতায় রাজনৈতিক দল বিধি প্রনয়ন করেন। প্রথমে বৈঠকখানা পরে মাঠে ময়দানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। অতঃপর প্রেসিডেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে একের পর এক রাজনৈতিক দল গঠিত হতে থাকে। গত নির্বাচন পর্যন্ত দলের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৬০টি। প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক দলবিধির আওতায় নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়াতে ইসলামী সহ পাকিস্তানের আদর্শ সমর্থক সবগুলি দলই একে একে আত্মপ্রকাশ করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই দলগুলি মতাদর্শগত বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে দ্বিধা-দ্বিধা শেষে বহুধা বিভক্ত হয়ে যায় কিন্তু এদের মধ্যে সাংগঠনিক কাঠামোর দিক থেকে সব চেয়ে মজবুত দল জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ভাঙন এড়াতে সমর্থ হয়। বলা দরকার, এই দলের মধ্যে মতা-দর্শগত বিভ্রান্তি তেমন দেখা দেয়নি। দু-একজন নেতা ছাড়া মূল নেতৃত্ব তাদের পূর্বেকার ধ্যান ধারণায় আজও অটল রয়েছেন।

www.pathagar.com

স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতীয় একতা ও সংহতির লক্ষে যে প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি নেয়া হয়েছিল পরবর্তীকালে শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী এনে তার আওতায় রাজনৈতিক দল বিধি গঠন করে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর এমন এক লণ্ড-ভণ্ড অবস্থা সৃষ্টি করা হলো যাতে জাতীয় একতা ও সংহতির দফা রফা হয়ে গেল। জাতীয় একতা ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক এই পরিস্থিতি থেকে শাসক দল তাৎক্ষনিক ভাবে কিছু কিছু ফায়দা হাসিল করতে সমর্থ হচ্ছে বটে কিন্তু তার পরিনাম যে খুবই মারাত্মক তার লক্ষন ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ওয়াকেবহাল মহলের অভিমত হলো, বিগত দশ বছরের মধ্যে জাতিকে এখনই ঐক্য ও সংহতির সর্বাধিক সংকটের মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

একটা দেশে এত অজস্র রাজনৈতিক দল থাকা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির পক্ষে সাংঘাতিক অন্তরায় তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু জাতীয় একতা ও সংহতির সবচেয়ে বড় যে বিপদ দেখা দিয়েছে তা হলো, ৭১ এর কনসেপ্ট নিয়ে দ্বিপক্ষীয় বিরোধের পুনঃ আত্মপ্রকাশ। এক সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর নেতারা বলেছেন ৭১ এ তাদের ভূমিকা সঠিক ছিল। জামায়াত নেতারা আরো দাবী করেছেন জনগণ তাদের বিপুল ভাবে সমর্থন করছে। অন্য পক্ষে ৭১ এর যুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে যারা যোগদিয়ে ছিলেন, তাদের বক্তব্য হলো, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাস করে না বাংলাদেশের মাটিতে তাদের কোন স্থান নেই।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কিংবা তার সরকার মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধার দ্বন্দ্বের ব্যাপারে এ পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোন মতামত ব্যক্ত করেননি। জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান রাজনৈতিক বক্তব্য সরকার নিশ্চয় সম্যক অবহিত আছেন। এ অবস্থায় সরকার তাদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের স্বাধীনতা মঞ্জুর করেছেন এতে ধরে নেয়া যায় তারা বাংলাদেশের সার্বভৌম ধারনার বিরোধীতা করেন না। অথচ সরকার পরিচালিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় জামায়াতে ইসলামীকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সাংঘাতিক বিপদ বলে প্রচার করা হয়েছে।

বাঙ্গলার মুসলমানরা কারও তাবেদারী করতে চায় না কিংবা পরা-

www.pathagar.com

শক্তির সঙ্গে গাঁট ছাড়া বেঁধে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যায় এই অবাস্তব ধারণায় বিশ্বাসও করে না। যারা রুশ ভারতের সঙ্গে কণ্ঠী বদল করে মোক্ষলাভ করবেন বলে ভেবেছেন, দেশের ৯০ ভাগ লোক তাদের চেনে, কেননা তাদের হাতেই দেশের বহু কষ্টলব্ধ বাংলাদেশ একদা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। সেই স্মৃতিটা মানুষ ভুলতে পারছে না। পরাশক্তিগুলি মুসলমানকে দিয়ে মুসলমান ধ্বংসের বিশ্বব্যাপী চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে এই বাস্তব সত্যটা ও আজ উন্মোচিত।

আরও আগের কথা হলো বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমাণ্ড কাউন্সিল থেকে সংগঠনের নেতা কাজী নুরুজামান ও জনাব নঈম জাহাঙ্গীর আগামী ১লা মে থেকে দেশব্যাপী রাজাকার আলবদর প্রতিরোধ পক্ষ পালন করা হবে বলে প্রচার করেছেন। ৭১ এর রাজাকার আলবদরকে তাঁরা দেশদ্রোহী, খুনী ও গনবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে গণআদালত গঠন করে তাদের বিচার করবেন বলেও ঘোষণা করেছেন। প্রকৃত পক্ষে এই ঘোষনা প্রচারিত হবার পর থেকেই দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠেছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় কমাণ্ড কাউন্সিলের প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক। কাজেই মুক্তিযোদ্ধা নেতৃবৃন্দের ঘোষিত বক্তব্যে তাঁর সমর্থন আছে এটা ধরে নিতে হয়। অথচ রাজাকার আলবদরদের বিরুদ্ধে আনু-ষ্ঠানিক প্রতিরোধ শুরু হলে দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটবে তাতে কারো সন্দেহ নেই। জাতীয় সংসদে প্রবীন রাজনৈতিক নেতা জনাব আতাউর রহমান খান প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনা কালে স্পষ্ট করেই বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার দ্বন্দ্ব দেশকে গৃহ-যুদ্ধের আবর্তে নিক্ষেপ করবে। তার ভাষায়, ঘরের আগুনেই ঘর পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। তিনি প্রেসিডেন্টকে সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন।

দেশের সঠিক মঙ্গল কামনা করেন এমন প্রতিটা লোকই অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন, দেশের রাজনৈতিক আকাশ ক্রমেই ঘণ-ঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে আমাদের বিরোধমূলক কোন একটি সমস্যাই আজ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়নি। হাড়িয়া ভাঙা নদীর সদ্যোত্থিত চর এলাকার উপর ভারত বেআইনী দখল

www.pathagar.com

কায়েম করেছে, দক্ষিন তালপট্টি দ্বীপে ভারতীয় পতাকা উড়ছে। ভারতীয় বি, এস, এফ, বাহিনী গত ১৫ মাসে ৬১ বার বাংলাদেশের সীমানায় বলপূর্বক অনুপ্রবেশ করেছে এবং অসংখ্যবার গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছে। ঐ বাহিনীর হাতে মৃত্যু বরণ করেছে ১৭ জন বাংলাদেশী। ভারতীয় এলাকা থেকে আগত ডাকাত ও লুটেরাদের হামলায় প্রাণ হারিয়েছে আরও ১২ জন এবং ২৮ লক্ষাধিক টাকাব মালামাল লুন্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া ভারতের সঙ্গে আমাদের জীবন মরণ ফারাক্কা সমস্যার কোন সন্তোষ-জনক নিষ্পতি হয়নি। এই অবস্থার মধ্যেই দেশের রাজনৈতিক দল-গুলির মধ্যে ঐকোর পরিবর্তে বিরোধের সম্পর্কই ক্রমে ঘণীভূত হচেছ। ক্ষমতাসীন সরকার রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেকার বিরোধ মেটাবার চেষ্টা না করে দলীয় স্বার্থে তা জীইয়ে রাখার অথবা এই প্রবনতাকে আরো উৎসাহিত করে চলেছেন।

জনাব আতাউর রহম'ন খান মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধার দ্বন্দ্বকে গৃহযুদ্ধে ঘরের আগুন বলে অভিহিত করেছেন। তার এই আশংকার মধ্যে অনেকে দক্ষিন পন্থীর ভীরুতা আবিষ্কার করতে পারেন কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এই বিরোধ যদি সংঘাতে রূপ নেয় তবে অবশ্যই তা ব্যাপক আকার ধারণ করবে। কারণ উভয় পক্ষের সাংগঠনিক পরিচয় দেশের ব্যাপক এলাকায় পরিব্যাপ্ত আর এ সংঘাত থেকে দেশের কোন উপকার হবে না। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিল এই বিরোধকে অবাঞ্ছিত জাতীয় দুর্ভাগ্য বলে বর্ণনা করেছেন। দৈনিক গণকন্ঠ পত্রিকার এক, উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার দ্বন্দ্ব সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোয় নিহিত কোন মৌলিক দ্বন্দ্ব নয়। কাজেই এই দ্বন্দ্ব সংঘাতে পর্যবসিত হলে সমাজের কোন পরিবর্তন হবে না। এতে প্রতিক্রিয়ার শক্তিই কেবল লাভবান হবে। শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন আরো অনেক রাজ-নৈতিক নেতাই এই বিরোধকে অবাঞ্ছিত ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বস্তুতঃ ক্ষমতাসীন নেতারা যাই বলুন কিংবা তাদের বিদেশী পৃষ্ঠ-পোষকরা যত বড় বড় প্রশংসাপত্রই তাদের দিয়ে থাক দেশের অবস্থা মোটের উপর ভাল নয়, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, মানুষের জীবন ক্রমে দুর্বহ হয়ে উঠেছে। আইন শৃঙ্খলা যত

www.pathagar.com

দিন যাচ্ছে ততই ভেঙে পড়ছে। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানী, খুন, ধর্ষণ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। সরকারী প্রশাসন ইতিপূর্বে আর কোন দিন দুর্নীতির এমন গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়নি। উৎকোচ গ্রহণ একটা প্রকাশ্য ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। দেশের সরকার দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশে খাদ্যোৎপাদন সামান্য বেড়েছে কিন্তু শিল্প ক্ষেত্রে পূর্বতন শাসনামলের নৈরাজ্য এখনো কাটেনি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেড়েছে। এই অবস্থায় সরকারের উচিত জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় টিকে থাকার স্বার্থে ব্যবহার না করে তার মীমাংসার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রয়োজন হলে সর্বদলীয় কনভেনসন ডেকে ঐ সব বিরোধ মিটিয়ে ফেলা উচিত। একটি চীনা প্রবাদ হলো, একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই প্রবীন রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান যে আশংকা প্রকাশ করেছেন তার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

তরুনদের জন্য চিন্তা

তরুনরাই সমাজের ভবিষ্যৎ। অতএব দেশেরও ভবিষ্যৎ, কওমেরও। আজ যারা তরুণ কাল তারা দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হবেন। মানব বংশ এভাবেই বিস্তার লাভ করে এবং সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে তার স্বাক্ষর এভাবেই অঙ্কিত হয়।

তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ এ কথা আমরা বংশপরম্পরায় শুনে আসছি। আমাদের সমাজপতিরা বলেছেন, রাষ্ট্রনায়করা বলেছেন। কবি সাহিত্যিক সমাজ বিজ্ঞানী সকলেই নানাভাবে মানুষকে বুঝিয়েছেন, তরুনরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, অতএব সর্ব প্রযত্নে তরুনদের সাহায্য করতে হবে। তাদের বিকাশের জন্য তাদের অস্তিত্বকে নিষ্কন্টক করার জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

বস্তুতঃ মানব বংশ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটা ব্যক্তি মানুষ, খুব সীমাবদ্ধ পরিসরে হলেও, এই নীতি আজো মেনে চলে এবং নিজেদের বর্তমানকে সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ এর জন্য উৎসর্গ করে থাকে। বলা বাহুল্য এই উৎসর্গ করার মধ্যে কোন উদারতা অনুদারতার প্রশ্ন নেই, ওলি আল্লাহ, গউস-কুতুব, মনিষী অমিনিষী নির্বিশেষে সকলের জীবনই তার সন্তান-সন্ততির জন্য উৎসর্গীকৃত।

এ সম্পর্কে রসূলে করিম (দঃ) এর শিক্ষা খুবই প্রনিধানযোগ্য— "তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের অস্তিত্বের ফল স্বরূপ এই ফলের প্রতি প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া উচিত।"

বস্তুতঃ আমাদের বংশধর যারা আগামীকালের নাগরিক, তাদের বুনিয়াদের শর্তকে নিষ্কন্টক করার জন্যই আমাদের প্রান পণে চেষ্টা করা দরকার। এই পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ মানববংশের পক্ষে বাসযোগ্য করার প্রতিজ্ঞা নীতিগত ভাবে আমাদের সকলের প্রতিজ্ঞা। অথচ এই দুনিয়া আমাদের আগামী দিনের বংশ ধরদের জন্য অর্থাৎ আজকের

www.pathagar.com

যারা তরুন তাদের জন্য, বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। যত দিন যাচ্ছে ততই। এবং পরিতাপের বিষয় হলো, শুধু মাত্র দৃষ্টি ভঙ্গির সংকীর্ণতার জন্য অথবা বলা যায়, চেতনার অভাব বশতঃ আগামী দিনের পৃথিবীকে বাসের অযোগ্য হবার প্রক্রিয়া আমরা স্বচক্ষে দেখছি কিন্তু কথা বলছিনে। কেউ কেউ এই প্রক্রিয়ায় শরিকও হয়েছি কিন্তু প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠছিনে।

আমাদের দেশের কথায় আছে ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। আমাদের ঈমান বলে আল্লাহর কাছে, আমাদের বিদ্যা বর্ধিত কর, তার চেয়ে বড় আরাধনা আর নেই তরুনদের জন্য। আমাদের দেশের সেই তরুনরা আজ অধ্যয়নই তপঃ এই কথা আর মনে করে না, কিংবা আল্লাহর কাছে "আমার বিদ্যা বর্ধিত কর" রাববি জেদনি এলমান এই দোয়া করাকে কুসংস্কার বলে মনে করছে। আমাদের দেশের দুই তৃতীয়াংশ তরুণ তরুণী শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এই বাস্তব অবস্থার মধ্যেও শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে এমন তরুণ তরুণীর একাংশ কিংবা বলা যায় বৃহদাংশ আজ অত্যান্ত দ্রুতগতিতে অধঃপতনের দিকে ধেয়ে ছলেছে। এর চেয়ে মর্মান্তিক দুঃখজনক বিষয় আর নেই। এই রাজধানী শহরে যতগুলি দুঃসাহসিক অপরাধ সংঘটিত হয় তার অনুষ্ঠাতাদের অধিকাংশই তরুণ। রাহাজানী, হাইজাক, ব্যাংক লুট, হত্যা, ধর্ষন ইত্যাকার অপরাধজনক কার্য্যাবলী বেশীর ভাগ আবার অনুষ্ঠিত হচেছ তাদেরই দ্বারা যারা এসেছে তথাকথিত 'বড়' 'বড়' ঘর থেকে, অভিজাত, এলাকায় বসবাসকারী ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারাই এদের জনক জননী। কথাটা আমার নয়, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার সাহেবই এই তথ্য জানিয়েছেন। এই লোক প্রবাদটি সম্ভবতঃ সকলেরই জানা আছে যে, মাছের যেমন পচন ধরে তার মুড়ো থেকে সমাজের ও পচন শুরু হয় তার শীর্ষদেশ থেকে। নানা অপরাধজনক কর্মকাণ্ডে সমাজের উপর তলায় বসবাসকারী লোকদের সন্তানরা বেশী বেশী অংশ গ্রহণ করেছে। এটা একটা সংকেত সমাজের পচন ক্রিয়ার। এবং এই পচন শীর্ষদেশ থেকে শুরু হয়ে ক্রমে মধ্য ও নিম্নাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন শুধু বড় ঘরের ছেলেরাই নয়, দেখা যাচেছ যাদের বাপ কেরানীগিরি কিংবা অনুরূপ অল্প আয়ের চাকুরী করে কোন

www.pathagar.com

মতে গ্রাসাচ্ছাদন করেন সেই সব ঘরের ছেলেরাও অনেকে দেখা দেখি হাল ফ্যাসানের জামা কাপড় পরে মস্তানী করে বেড়াচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশ সমূহের ছাত্ররাই যেহেতু সমাজের সর্বাধিক শিক্ষিত অংশ কাজেই ছাত্র তথা যুব সমাজের চারিত্রিক অধঃপতন খুব নিরাসক্ত ভাবে দেখা কারো পক্ষই সম্ভব নয়। অথচ চোখ খুললেই এ সব আমাদের চোখে পড়ছে। ট্রেনে, বাসে, রাস্তা-ঘাটে, স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র আমরা তরুনদের দেখছি। এবং অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের চোখে আনন্দ না হয়ে তারা আমাদের চোখের পীড়ার কারণ হয়ে উপস্থিত হচ্ছে। তাদের অনেকের চলা, কথা বলা, ব্যবহার সব কিছু মধ্যে একটা ঔদ্ধত্ব ফুটে যেতে দেখছি যা আমাদের ১৪০০ বৎসরের অর্জিত মূল্যবোধকে আহত করছে, আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলছি— হায় আল্লাহ্ কি দিনকাল হলো। যেন সময়ের পরিবর্তনের জন্যই এসব হচ্ছে এর মধ্যে আমাদের বুড়োদের অর্থাৎ দায়িত্ববান বাবা মাদের কোন কর্তব্য নেই। অথচ আমরা সবাই একমত যে, আমাদের উত্তর পুরুষ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু একমাত্র সময়কে দায়ী করেই আমরা আমাদের দায় সারছি, পরিবর্তিত সময়ের মৌলিক অবস্থাগুলোর সংগে যুব সমাজের একাংশের অধঃপতনের যোগসূত্র কি এবং সেই নিরিখে এই অবস্থার অবসানের উপায় কি আমরা তা উপলব্ধি করতে পারছিনে। অথচ ভাবতে গেলে দেখা যাবে আমরা যারা আমাদের বংশধরদের ভবিষ্যৎ দুর্ভাবনায় কেঁচো হয়ে আছি, আমরা এক মূঢ় ভাবালুতায় ডুবে থাকার জন্য কি করনীয় তা নির্ধারণ করতে পারছিনে। সবাই বলছি যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে! লেখক, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সমাজ বিজ্ঞানী রাজনীতিবিদ ক্ষমতাসীন রাষ্ট্র নেতা সবাই যুব সমাজের নৈতিক অধঃপতনে দুঃশ্চিন্তা প্রকাশ করছেন, কিন্তু কার্যকর কোন উপায় কেউ গ্রহণ করতে পারছেন না যাতে যুব সমাজের বিপর্যস্ত মূল্যবোধ পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। বরং বাস্তব অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে, তাতে যুব সমাজের ধ্বংস ত্বরান্বিত হবার যাবতীয় উপকরণেরই সমাবেশ ঘটছে সমাজে এবং সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিকেরা কখনো জ্ঞাতসারে কখনো অজ্ঞাতে এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে চলেছেন, কখনো বা প্রত্যক্ষভাবে শরিকও হচ্ছেন।

www.pathagar.com

উচ্চ শিক্ষার বৃহত্তম পাদপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশের নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে সাপ্তাহিক বিচিত্রা কিছু দিন আগের এক সংখ্যায় যে তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করে তা পড়ার পর অনেকেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। এদেশে নানা চোরা পথে বিদেশ থেকে ব্লু ফিল্ম আমদানী হবার খবর অনেকেই জানতেন। এবং সে সব ব্লু ফিল্ম অনেক উঠতি ভুইফোড় ধনী-পরিবারের ছেলেরা নানান অস্থানে কুস্থানে গিয়ে দেখেও থাকেন বলে অনেকের জানা ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে নগদ দশনীর বিনিময়ে এসব প্রদর্শিত হয় তা কারো জানা ছিল না।

আমরা জানি যৌনবৃত্তি অত্যন্ত শক্তিশালী জৈবিক বৃত্তি। উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা দৈহিক কারণেই এ সময় খুব স্পর্শকাতর থাকে। তার উপর যদি যৌনলীলা খেলার নগ্ন ছায়াছবি দেখানো হয় তাহলে নীতির কথা মনে রেখে তাদের পক্ষে মাথা ঠিক রাখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে নাকি? বস্তুতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রাবাস সমূহে এই ধরনের নগ্ন যৌন চিত্র প্রদর্শিত হয়ে থাকে—এটি একটি খবর মাত্রই নয়, আমাদের যুব সমাজের নৈতিক অধপতন ঘটানোর এক সুপরিকল্পিত চক্রান্তেরও এ বহিঃপ্রকাশ। অবশ্য এ চক্রান্তের নানা বহিঃপ্রকাশ আমরা অন্যভাবে সর্বত্রই দেখছি। আমাদের দেশে বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশের সঙ্গে নানা রকম সংস্কৃতিক চুক্তির মাধ্যমে রং বেরঙের সচিত্র ম্যাগাজিন, জার্নাল ইত্যাদি আমদানী করা হয়। চোরা পথেও আসে অনেক পত্র পত্রিকা। সবাই জানেন, এ সব পত্র পত্রিকা বেশ চড়া দামে বিক্রি হয় এবং তারাই এ সবের গ্রাহক হতে পারে যাদের জীবিকা শ্রমের বিনিময়ে অর্জন করতে হয় না। আর জীব-দেহের মত সমাজ দেহের পচন ও সংক্রামক বলে সমাজের উচু তলার দুলাল দুলালীদের দ্বারা বাহিত হয়ে সমাজের মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তদের মধ্যে ও এ পচন ছড়িয়ে পড়ে। পড়ছেও তাই।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এ দেশের জনগণের শত করা ৯০ ভাগ মুসলমান। ধর্মান্ধ না হলেও ধর্মপ্রাণ বলে এদেশের মুসলমানের একটা খ্যাতিও আছে। এবং একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, এ দেশের জনগণের যাবতীয় মূল্যবোধের ভিত্তি ধর্মচর্চার

www.pathagar.com

নানা কারণে হ্রাস প্রাপ্তি সত্বেও, এখনো ধর্মই এবং বলা বাহুল্য শুধু ইসলাম ধর্মই নয়, হিন্দু বৌদ্ধ, খৃষ্টান, এক কথায় ধর্মই সব নীতিবোধের উৎস। ধর্মীয় নীতিবোধ সব রকম যৌন উশৃঙ্খলা বিরোধী বলে কোমলমতি তরুণ-তরুণীদের মন থেকে ধর্মীয় নীতিবোধ ধ্বংস করার কুমতলবে একান্ত জৈবিক বৃত্তিতে সুড় সুড়ি দিয়ে যুব সমাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটাবার অপপ্রয়াস চলানো হচ্ছে। এ অপপ্রয়াস চালাচ্ছে তারাই যারা আমাদের জাতীয় বিকাশকে অবরুদ্ধ করে আমাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, চায় বৈষয়িক ফায়দা হাসিল করতে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে এই ঘৃন্য প্রচেষ্টাকে আমাদের জাতীয় সরকারও নানাভাবে সহায়তা দিয়ে চলেছেন। আমাদের দেশের সরকার এমন অনেক বিনোদনমূলক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ছাড়পত্র দিয়েছেন যে সব পত্র-পত্রিকা যে কোন রুচিবান ব্যক্তি ঘরে রাখতেই লজ্জাবোধ করবেন। বিস্মিত হতে হয় একটা দায়িত্বশীল সরকারের পক্ষে সংস্কৃতি চর্চার নামে কিংবা, বিনোদনের নামে এসব অশ্লীল যৌন উত্তেজক পত্র-পত্রিকার ছাড়পত্র দিলেন কি করে! এ সব পত্র-পত্রিকার প্রভাব যে বিষময় সরকারী নেতারাও আশা করি তা স্বীকার করবেন। এর থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আমাদের জাতীয় সরকারও আমাদের জাতীয় অধঃপতন সংঘটনের চক্রান্তের শরিক?

উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম বলে রাজনৈতিক নেতারা এসব দেশের রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশ গ্রহণের স্বপক্ষে মত প্রচার করে থাকেন। মিথ্যা নয় যে, বিগত ঔপনিবেশিক আমল থেকে এ পর্যন্ত এ দেশের রাজনীতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা খুবই গৌরবোজ্জ্বল। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ দেশের রাজনীতিতে ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে কোন বলিষ্ট ভূমিকা পালনে আর সমর্থ হচ্ছে না। ছাত্র সমাজ বহুধা বিভক্ত। দেশে রাজনৈতিক দল যতগুলি, বলতে গেলে ছাত্রদের সংগঠনের সংখ্যাও তত। ফলে স্বাধীনতা গণতন্ত্র কিংবা জনগণের যে কোন সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা বা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ছাত্র সমাজ আর ঐক্যবদ্ধভাবে কোন আন্দোলন সংগঠিত করতে পারে না। ছাত্র তথা যুব সমাজের কানে কথাটা খুব খারাপ লাগবে কিন্তু একথা খুবই সত্যি যে, সমগ্র

www.pathagar.com

ছাত্র সমাজ আজ দেশের ৫৬টি মতান্তরে ৬০টি রাজনৈতিক দলের কোন না কোনটির লেজুড়ে পরিণত হয়েছেন। দেশের সর্বাধিক সচেতন অংশ হয়েও ছাত্রদের এই পরিণতির কথা ভাবলে দুঃখের অবধি থাকে না।

উল্লেখ একান্তই বাহুল্য যে, কেবল মাত্র মতাদর্শগত বিরোধের জন্য আমাদের দেশের রাজনীতি এত অসংখ্য সংগঠনে বিভক্ত নয়। কারণ এতগুলি মতবাদেরই অস্তিত্ব নেই দেশে। এত বিভাজনের মূল কারণ নেতৃত্বের কোন্দল, অথচ ছাত্ররা নির্বিচারে এই নেতৃত্বের কোন্দলের শিকার হয়েছেন এখনও হচ্ছেন। আমরা ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের বিরোধিতা করি না। কিন্তু অবশ্যই সংখ্যাহীন সংগঠনে বিভক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের লেজুড়বৃত্তির বিরোধিতা করি। আমরা চাই, ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করুক এবং দেশের আদর্শগত সুস্থ রাজনীতি চর্চার পরিবেশ গড়ে তুলুক। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে যে সব ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠেছে তাদের নেতারা অনেকেই আদর্শের প্রভাবে নয় অন্য প্রকার বৈষয়িক স্বার্থের নিগড়ে আবদ্ধ।

কিছু দিন আগে সাপ্তাহিক বিচিত্রা পরিবেশিত এক পরিসংখ্যান থেকে আমরা জানতে পেরেছি, অর্ধেকেরও বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী কোন প্রকার রাজনীতিতেই উৎসাহী নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে সবাই যে পড়ুয়া অর্থাৎ তথাকথিত ভাল ছেলে তাও নয়। রাজনৈতিক চেতনাহীন অসংখ্য ছেলে-মেয়ে আছে যারা কোন সুস্থ মূল্যবোধ বহন করে না। এদের অধিকাংশ শিল্পোন্নত ইউরোপ আমেরিকার নানা দেশের বখে যাওয়া ছেলে-মেয়েদের অনুকরণে (বিদেশী ম্যাগাজিনে এদের নানা রূপ বিকৃত অঙ্গসজ্জার ছবি ছাপা হয়) পোষাক পরে, চুল ছাটে (কিংবা বলা যায় ছাটে না) নখ, রাখে পরিচর্চা করে ও ঠোঁট রঞ্জিত করে। আগে যাদের কথা উল্লেখ করেছি, এরা হচ্ছে সেই এক পুরুষের হঠাৎ ধণাঢ্য উপর তলার বাসিন্দাদের ছেলেমেয়ে। খুব নীচু তলা থেকে সমাজের চূড়ায় উত্তরনের মধ্যে কোন ধারা-বাহিকতা রক্ষিত হয়নি বলে তাদের আত্মসচেতনতা নেই বললেই চলে। তাছাড়া উপর এবং নীচের মধ্যেকার শূন্যতা এত গভীর এবং এই গভীর শূন্যতা অতিক্রমের মত চেতনার শক্তির এত অভাব যে, এদের কাছ থেকে ভিন্ন রকম কোন আচরণ প্রত্যাশা করাও অসম্ভব।

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা বা ভুয়োদর্শন থেকে জানা যায় যে, সে সব ছেলে-মেয়ের অভিভাবক অন্যায় ও অসামাজিক পথে অর্থোপর্জন করে সেই সব ছেলে মেয়েরা সুস্থ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয় না। এই ঘটনার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেয়া হয়তো সব সময় সম্ভব নয়। তবে দেখা যায় অবৈধভাবে অর্জিত পয়সা সংসারে আসা শুরু হওয়া মাত্র সংসারের ধারাবাহিক শৃঙ্খলায় ছেদ পড়ে। শ্রমের বিনিময় অর্জিত নয় বলে কিংবা অল্প পরিশ্রমের বিনিময়ে আশাতিরিক্ত বেশী উপার্জনের ফলে, ঐ অর্থব্যয়ের সময় পরিবারের প্রতিটা সদস্যের অভ্যস্ত সংযমে চিড় ধরে। এক সময় সংযম আর থাকে না। অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে সংযম-হীনতা মানব সম্পর্কের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অভিব্যক্ত হতে থাকে। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে, "অবৈধ উপায়ে অর্জিত সামগ্রীর দ্বারা পুষ্ট দেহসকল দোজখের ইন্ধন হইবে।" আবার যারা সমাজ স্বীকৃত বৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তা কঠোর ভাবে সঞ্চয় করে—তাদের সন্তানদের মধ্যেও অকর্মন্যতা ও সংযম-হীনতা দেখা যায়। বাবা মার সঞ্চয় বৃত্তির (ভূ-সম্পত্তি, ব্যাংক ব্যালান্স, স্বর্ণ রৌপ্যের আকারে মওজুদ প্রভৃতি) পরিণাম হয়ে দাঁড়ায় সন্তান-সন্ততির গলার বিলাসের ফাঁস। এ ফাঁস বাবা মা তাদের সন্তানদের গলায় অত্যন্ত স্নেহভরেই পরিয়ে থাকেন। স্নেহ বশতঃই বাবা মা তাদের সন্তান সন্ততির বসে খাবার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেন সম্পদ সঞ্চয় করে কিন্তু প্রয়াশ এর ফল হয় উল্টো। বাবা মা অনেক কষ্টে সঞ্চয় করেন। উত্তর পুরুষের অযোগ্য আর অকর্মন্য হাতে পড়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে "যে অর্থ জমায় ও উহা বার বার গণনা করে, সে ধারনা করে যে, তাহার অর্থ তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। কখনও না, অবশ্যই তাহারা নিক্ষিপ্ত হইবে হুতাশনে।" অবৈধ সঞ্চয়কারীদের জন্য আখেরাতে কি কি শাস্তি তোলা রয়েছে আল্লাহ জানেন, তবে ইহকালে তাদের বংশধরদের যে পরিনাম ভোগ করতে হয় শাস্তি হিসাবে তার পরিমানও যে কম নয় তা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি।

আমরা ইদানিং যুব সমাজের একাংশের মধ্যে তীব্র হননেচ্ছার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। খবরের কাগজের পাতা খুললেই দেখা যায়, যুবক খুন, মস্তক বিচ্ছিন্ন যুবকের লাস। ঝোপ ঝাড়ে খানা

www.pathagar.com

খন্দকে, রেল রাস্তার ধারে, ফসলের ক্ষেতে প্রায়শঃ যুবকের লাশ পড়ে থাকার খবর আমরা দেখি। এই সব যুবকদের যারা খুন করেন উল্লেখ্য যে, তারাও যুবক। এ ছাড়া রয়েছে তরুণী হত্যার খবর। পোষ্ট মোর্টেম রিপোর্টে দেখা যায়—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হতভাগ্য তরুণীটি মৃত্যুর পূর্বে ধর্ষিতা হয়েছে। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যুব সমাজের মনে এই পাশবিক বৃত্তিগুলির উদ্ভব এমন ব্যাপক আকারে দেখা দিল কেন? নিয়মের ব্যতিক্রম অবশ্য সব সময় থাকে, তবে খুনোখুনি ও অন্যান্য অপরাধজনক কার্য্যকলাপে অংশগ্রহণকারী যুবকদের অধিকাংশের অভিভাবকরা সুস্থ জীবন যাপন করে না বা করেনি এটা দেখা গেছে। বাবা মা তাদের সন্তান সন্ততির জন্য উপার্জনও সঞ্চয় করে এটা যেমন ঠিক তেমনি যে যার সন্তানের জন্য উপার্জন করতে গিয়ে সবাই এমন এক কাড়াকাড়ির জগতে প্রবেশ করে এবং কাড়াকাড়িতে মত্ত হয়ে ওঠে যে, তা আগামী দিনের নির্বিশেষ বংশ-ধরদের জন্য এক অশুভ প্রবনতার জন্ম দেয় এবং স্থাপন করে এক অতিশয় অশুভ দৃষ্টান্ত। সমাজের উপর তলায় এই কাড়াকাড়ির ব্যাপকতা ক্রমে বাড়ছে। বর্তমানে উৎকোচ গ্রহণের সুবিধা আছে, অথচ উৎকোচ গ্রহণ করেন না এমন সরকারী আধা-সরকারী কর্মচারী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সরকারী আধা-সরকারী সব অফিস গুলোতে দুর্নীতি একেবারে সংক্রামক রোগের আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্মভীরু এক আধজন কর্মচারী সৎ থাকতে চাইলেও পরিবেশ এমন দুষ্ট হয়ে গেছে যে, তার পক্ষে কাজ করাই হয়ে পড়েছে অসম্ভব। সরকারের নির্মাণ বিভাগে কোন সৎ প্রকৌশলী যদি ভাল কাজ করতে চান তবে তার সহকর্মীরা তাঁকে সৎ থাকতে দেয় না। নগদ টাকা বা অন্যবিধ প্রলোভন দেখিয়ে তাকে অধঃপতিত করে ছাড়ে। সব প্রলোভন উপেক্ষা করেও যদি কেউ নিজের নৈতিকতাকে আঁকড়ে থাকতে চান, তাঁকে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে দিয়ে অন্যত্র বদলী করানোর ব্যবস্থা করা হয়। ফলে সৎ থাকার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অফিসারেরা শেষে হতাশা-গ্রস্ত হয়ে গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। বাংলাদেশের যে কোন সাবালক ব্যক্তি সমাজের বর্তমান এই প্রবনতা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

www.pathagar.com

বর্তমানে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে টাকা বা সম্পদ অর্জন করাকে কেউ আর দোষণীয় মনে করে না। অনেক নীতি কথাবলা ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিকেও দেখা যায় জেনে শুনে ঘুষখোর ছেলের হাতে নিজের কন্যা সম্প্রদান করতে দ্বিধাবোধ করছেন না। বরং অসৎপথে উপার্জনকারী ছেলের হাতেই কন্যা সম্পাদন করতে বেশী আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। সামাজিক মূল্যবোধ যে সাংঘাতিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে এ তারই প্রমাণ। অথচ প্রত্যেক বাবা মাই চান তার সন্তান সুখে শান্তিতে থাকুক। কিন্তু সুখে শান্তিতে থাকতে গেলে সমাজটাও যে সুস্থ থাকা দরকার এই পরম সত্যকে কেউ অনুভব ও করেন না। এটা আমরা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে অগ্নির উদরে খাদ্য যেমন কখনই যথেষ্ট হয় না, বর্তমান হারে সম্পদ লাভের দ্বারা সম্পত্তি চেতন মানুষের সম্পদ অর্জনের তৃষ্ণাও তেমনি কোন অবস্থাতেই নিবৃত্ত হয় না। অথচ সম্পদ সব সময় সীমাবদ্ধ। সম্পদের সীমাবদ্ধ ভাণ্ডার থেকে অগনিত মানুষের নিবৃত্তি-হীন সম্পদতৃষ্ণা তাহলে কিভাবে মিটতে পারে?

পবিত্র কোরান থেকে যদি আমরা শিক্ষাগ্রহণ করতে রাজি হই তাহলে অসুস্থ্য সম্পত্তিতৃষ্ণা থেকে আমরা সহজেই মুক্তি পেতে পারি। কিন্তু বলা বাহুল্য ধর্ম্ম শিক্ষায় আমাদের ধণাঢ্য মুসলমানদের কোন প্রবৃত্তি নেই। ধর্মের ধ্বজা উড়াতে আমরা অনেকেই ভালবাসি বটে, তবে বলতে গেলে সবাই আমরা ধর্মধ্বজ অধার্মিক। কাজেই আমাদের যুব সমাজ যে অধঃপতনের দিকে দ্রুতধাবিত হচ্ছে তা অকারণ নয়। অধঃপতনের উপাদান সমাজের গর্ভেই উৎপাদন করা হচ্ছে ও নিহিত রয়েছে।

বস্তুতঃ আমাদের যুব সমাজের নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে আমরা সকলেই কম বেশী সচেতন, অতএব এ নিয়ে, বেশী আলোচনা করা নিরর্থক। আমাদের ভেবে বার করতে হবে কিভাবে এই অধঃপতন রুখতে পারি, কিভাবে এই অসুস্থ্য প্রবনতা থেকে সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। সমাজের সব চেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হলো রাষ্ট্র তথা আদর্শবাদী সরকার। প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকারের দায়িত্ব হলো সমাজের প্রতিটা মানুষকে তার ধর্মভিত্তিক ও মানব মঙ্গলজনক নৈতিক ও আত্মিক বিকাশের পথ নিষ্কন্টক রাখা। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্ষমতাসীন হবার পর কোন দলীয় সরকারই নিরপেক্ষভাবে

www.pathagar.com

সমাজের সকলের নৈতিক ও আত্মিক বিকাশের পথ নিষ্কন্টক রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করছেন না, বিপরীত পক্ষে এমন সংখ্যাহীন পদ-ক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করেছেন যাতে সমাজ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং কোমলমতি তরুণ তরুণীরা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই গোল্লায় যায়। বিনোদনমূলক যৌন ব্যবসাদার পত্র পত্রিকার কথা আগেই বলেছি।

সরকার দেশে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রি যাতে বিকষিত হয় তার জন্য ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন স্থাপন করেছেন। দেশে ফিল্ম বা সিনেমা শিল্পের বিকাশ কতটা হয়েছে দেশবাসী তা ভালই দেখতে পাচ্ছেন তবে ছবি যে প্রতি বছর গাদা গাদা মুক্তি পাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হাতে গোনা যায় এমন এক আধটা ছবি ছাড়া সব ছবিই নির্মিত হয়েছে দর্শকদের সস্তা সেন্টিমেন্টকে এক্সপ্লয়েট করে ও জৈবিক বৃত্তিতে শুড়শুড়ি দিয়ে কি করে দ্রুত পয়সা করা যায় সেই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য তাদের ষোল আনা সফল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই তবে দর্শকের (অধিকাংশ দর্শকই কোমলমতি তরুণ তরুণী) নৈতিক মূল্যবোধের বারোটা বাজানোর পবিত্র কর্মটি খুব সুচারুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। ছবির গুণাগুণ ও নৈতিক মান পরীক্ষার পর তার ছাড়পত্র দেয়ার জন্য সরকার নিযুক্ত একটি বোর্ড আছে—সেন্সর বোর্ড। দেশের জ্ঞানী গুনী ও দায়িত্বশীল সমাজ সচেতন বুদ্ধিজীবিদের সমবায়েই এ বোর্ড গঠিত হয় বলে আমরা জানি। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি দেখলেই কেবল বোঝা যায় তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের অর্থাৎ বিতণ্ডাবাদিদের সমাজ সম্পর্কে দায়িত্বই বা কতখানি আর সামাজিক চেতনার কোন স্তরেই বা তাঁদের অবস্থান। আমরা শুনেছি, সেন্সর বোর্ডের কর্তারা উৎকোচের দ্বারা বাশীভূত হয়েই বেশীর ভাগ সময় সমাজের পক্ষে বিষবৎ ছবিগুলির মুক্তির ছাড়পত্র লিখে থাকেন।

বিনোদন মূলক পত্র-পত্রিকা ও ছায়া ছবির পর আর একটি দ্রব্য অতি সম্প্রতি আমাদের এই হতভাগ্য দেশে আমদানী হয়েছে সেটি হলো ভি, সি, আর, ক্যাসেট যা সাধারন টেলিভিশনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে অবলীলাক্রমে নাচ গান ও রকমারী সব কারবার উপভোগ করা যায়। অবশ্য এ অধীনের সেই অত্যাশ্চর্যে পদার্থটি চোখে দেখার সুযোগ হয়নি তবে অন্যের মুখে শুনেই কানের ডগা লাল হয়ে গেছে। এ দ্রব্যটি

www.pathagar.com

শুনেছি খুব মহার্ঘ্য। না হবার কোন কারণ নেই, কেননা এর আনন্দ দানের ক্ষমতা নাকি প্রায় অকৃত্রিম। নেপথ্যে বলে নিতে হচ্ছে আনন্দ দান ও লাভের সেই সাবেকী পদ্ধতিতে উপর তলাবাসী ভদ্রলোকদের ইদানীং নাকি তেমন পোষাচ্ছে না। পদার্থটি সেই দিক দিয়ে নাকী ভারী কাজের। হিন্দু পুরানের একটি উপাখ্যান মনে পড়ছে। কোন এক রাজার যজ্ঞে তেরোদিন যাবৎ একটানা ঘি খেয়ে অগ্নিদেবের নাকি বদ হজমের ভাব হয়েছিল। তখন ব্রহ্মা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, প্রচুর পরিমানে পশুমেদ ভোজন করলেই অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ কেটে যাবে। উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে তিনি দাবানল জ্বালিয়ে খাণ্ডব বন দগ্ধ করলেন এবং খাণ্ডব বনবাসী গণতাতীত পশু পক্ষীর মেদ মাংস ভোজন করে আরোগ্য লাভ করলেন। শুনেছি আমাদের সমাজের শীর্ষদেশের ভদ্রলোকেরা অতি ভোজনের ফলে স্বাভাবিক ক্ষুধা হারিয়ে ফেলেছেন। ভি, সি, আর, ক্যাসেটে বন্দী সাগর পারের ললনাদের দেহ বল্লরী কামাতুর যুবকদের দ্বারা ধর্ষিত হতে দেখলেই নাকি তাদের ক্ষুধা জাগ্রত হয়। এবং অনন্তর আনন্দাদি লভ্যও হয়ে থাকে। যাইহোক এতদিন পদার্থটি গোপন পথে বিদেশ থেকে আসতো। যারা হপ্তায় হপ্তায় হিল্লী দিল্লী সিঙ্গাপুর হংকং যান তারাই লুকিয়ে চুরিয়ে আনতেন। সম্প্রতি দেশের সরকার লজ্জার মাথা খেয়ে দ্রব্যটি উচ্চহার শুরু প্রদানের ভিত্তিতে আমদানীর অনুমতি দিয়েছেন। আর পায় কে! শুনেছি এই দ্রব্যটি অধুনা উঁচু তলার লোকদের আভিজাত্য তথা কাঞ্চন কৌলিন্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে লুকিয়ে চুরিয়ে সকলেই দ্রব্যটি যোগাড় করেছেন এবং ঘরে রাখছেন। এর পর উল্লেখ না করলেও বোধ হয় চলে যে, দ্রব্যটির আস্বাদন শুধু কর্তা গিন্নীই পাচ্ছেন না, পরিবারের অন্যরাও উপভোগ করছেন। এবং তাদের মধ্যে কিশোর পুত্র থেকে অনূঢ়া অরক্ষনীয়া কন্যারাও থাকছেন। সত্যি কিনা জানিনে, শুনেছি এই শহরে এমন অনেক আলোকপ্রাপ্ত পরিবারও আছে যাঁরা সপরিবারেই এই পবিত্র আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। উল্লেখ যে, এই ভি, সি, আর যন্ত্রটির কল্যাণমূলক ব্যবহারও সম্ভব হতে পারে, যদি ব্যবহারকারীর রুচি ও শিক্ষা তদনরূপ হয় কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রায়শ তা হয় না। এর পর রুচিবান পাঠকদের কাছে

www.pathagar.com

ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমাদের সদাশয় সরকারের আর একটি দায়িত্ব পালনের প্রসঙ্গে যেতে চাই।

কথায় আছে, কাঁচা টাকা, কাঁচা মেয়ে মানুষ আর কাঁচা মাছের লোভ ত্যাগ করা কঠিন। আমাদের সমাজের 'প্রগতি' বর্তমানে এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে, শুধু মাত্র টাকা লভ্য হলেই কোন কিছু আর অলভ্য থাকে না। বর্তমান ক্ষমতাশীন বি, এন, পি সরকার তার দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের বিশেষ করে গ্রামীন যুবকদেরকে কাঁচা টাকা লাভ করার একটা উপায় করে দিয়েছেন। গ্রামীন হাট বাজারের খাজনা (তোলা) আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বি, এন, পি ও যুব সংগঠনের হাতে। এর ফল যা হবার তাই হচ্ছে। কাঁচা টাকার বখরার লোভে অনেক বেকার যুবক এই সংগঠনে শামিল হচ্ছে। বিনা মেহনতে কিংবা অল্প মেহনতে কাঁচা টাকা হাতে আসার ফলে অধঃপতনের রাস্তা যে অত্যন্ত দ্রুত খুলে যাচ্ছে তা আশা করি কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সামাজিক শোষন ও আকস্মিক নদী ভাঙ্গন, বন্যা জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতির দরুন প্রতি বছর হাজার হাজার দরিদ্র মানুষ ঘর-বাড়ী হারিয়ে শহরে এসে জড় হচ্ছে। শহরের কঠিন জীবন সংগ্রামে খুব অল্প সংখ্যক পরিবারই উত্তীর্ণ হতে পারছে, বেশীর ভাগই পর্যুদস্ত হয়ে অসামাজিক জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। কিছু দিন আগে মেট্রোপলিটান পুলিসের এক রিপোর্টে জানা গিয়েছিল, অসামাজিক কাজে লিপ্ত সে সব প্রমোদবালা মাঝে মাঝে ধরা পড়ে তাদের বেশীর ভাগই হলো গ্রাম থেকে উঠে আসা ছিন্নমূল পরিবারের বৌ বেটী। আরো জানা গেছে, ধরা পড়ার পর তাদের ছাড়িয়ে আনার জন্য কিছু লোক সব সময়ই প্রস্তুত থাকে। এটাই তাদের ব্যবসা। সাপ্তাহিক বিচিত্রার সৌজন্যে বাংলাদেশের পাঠকবর্গ এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য অবগত হয়েছেন, কাজেই বেশী না বললেও চলবে। তবে বিচিত্রা যে কথা বলেনি সেটি হলো সরকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এজেন্সি সমূহের চোখের সামনেই ব্যাপারটা নিরন্তর ঘটে চলেছে প্রতিকারের কোন উপায় হচ্ছে না অথবা বলা যায় এক রহস্যজনক কারণে সরকারী প্রশাসন নীরবতা পালন করে চলেছে। উল্লেখ না করলেও চলে যে, বাংলাদেশের যুব সমাজের একাংশ দেশী

www.pathagar.com

বিদেশী নানা বিনোদনমূলক পত্র-পত্রিকা, যৌন আবেদন সর্বস্ব ছায়া ছবি, ভি, সি, আর ইত্যাদির মাধ্যমে মন্মথ স্পৃষ্ট হয়ে স্বভাবতই নারীদেহের অন্বেষনে উন্মুখ হবে এবং তা চরিতার্থেরও আয়োজন ছড়ানো আছে শহরের প্রায় সর্বত্র। বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকার একটি রাজপথ দিয়ে যার নামকরণ করা হয়েছে গতায়ু এক বৃদ্ধ নেতার নামানুসারে যত রিক্সা চলে সব গুলিই প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর এক ভৌতিক কারণে অর্থমূল্যে প্রাপ্তব্য আনন্দ-বর্ধনকারী ললনাদের দালালে পরিণত হয়। অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে মন্মথ স্পৃষ্ট করা এবং তার চরিতার্থের আয়োজন দুইই রাখা হয়েছে।

কিন্তু সমস্ত বিষয় অবহিত হবার পরই একটা প্রশ্নের দ্বারা আমি বিদ্ধ হতে থাকি যে, আমাদের যুব সমাজকে অধঃপতিত করার এই আয়োজন কি কোন চক্রান্তের ফল? যদি তা-ই হয়, তবে এ চক্রান্তের রচয়িতা কে বা কারা এবং আমাদের সমাজপতিরা এ চক্রান্ত রুখবার চেষ্টা না করে তাতে মদদ দিয়েই বা চলেছেন কেন?

কারণ ছাড়া কোন কাজ হয় না এটা দর্শনেরই কথা। আমাদের যুবসমাজকে অধঃপতিত করার পেছনে একটা সুদুর প্রসারী চক্রান্ত রয়েছে তাতে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। এবং এ চক্রান্তের নীল নক্সা কাদের রচনা তা বোঝা যাবে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ-ধরদের নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করতে পারলে কারা লাভবান হবে তাই দেখে।

আজ সারা বিশ্বের অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলি (যার মধ্যে রয়েছে শতাধিক কোটি জন অধ্যুসিত প্রায় ৪০টি মুসলিম রাষ্ট্র) ইউরোপ আমেরিকার গুটি কয়েক শিল্পোন্নত দেশের পুঁজিও প্রযুক্তির উপর নির্ভর-শীল। অনুন্নত বিশ্বে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অঢেল শ্রমশক্তি। পুঁজি ও প্রযুক্তির অভাব বশতঃ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বিপুল পরিমাণ শ্রমশক্তি অব্যবহৃত হয়ে আছে বা থাকছে। শিল্পোন্নত বিশ্ব চাচ্ছে, আমরা বরাবর তাদের কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমশক্তির যোগানদার এবং তাদের শিল্পপণ্যের স্থায়ী বাজার হয়েই থাকি। আমরা যদি আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, কাঁচা-মাল ও শ্রমশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ আমরা যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কারো দ্বারা আর শোষিত না হই তাহলে অতি

www.pathagar.com

অল্পদিনের মধ্যেই আমরাও উন্নত বিশ্বের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারবো। কিন্তু তাতে শিল্পোন্নত বিশ্বের ঘোরতর আপত্তি। কারণ তাতে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সমস্যা দেখা দেবে, তাদের মেসিনগুলি 'মামদো ভূত" হয়ে ওদের গলা টিপে মারবে। কাজেই তারা তাদের একান্ত অর্থনৈতিক স্বার্থেই আমাদের স্বনির্ভর হবার প্রচেষ্টাকে যে ভাবে সম্ভব দমন করার চেষ্টা করবেই। বরাবর তারা তাই করে আসছে। এই দমন প্রচেষ্টা সফল করার জন্য বহু উপায় তারা অবলম্বন করে থাকে। তার মধ্যে রয়েছে একটি দেশের সঙ্গে অন্য একটি দেশের যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়া এবং অস্ত্র বিক্রি করা। দেশের অভ্যন্তরে আন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম পরিচালনা করা এবং ভবিষ্যৎ নাগরিকরা সুষ্ঠভাবে যাতে গড়ে না উঠতে পারে তারই জন্য তাদের নৈতিক অবক্ষয়ের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা। শিল্পোন্নত আধিপত্যকামী দেশ সমূহের দ্বারা গৃহিত এই উপায় সমূহের কোনটাই কম কার্যকরী নয়। তবে যুদ্ধের ক্ষতি দ্রুত পূরণ করা যায়। অন্তর্ঘাতমূলক কাজ কর্মও বন্ধ করা যায় বা তজ্জনিত ক্ষতি সমূহ পুষিয়ে নেয়া যায় কিন্তু যুব সমাজের নৈতিক মান বিপর্যস্ত হলে বা মূল্যবোধে একবার অবক্ষয় শুরু হলে যে ক্ষতি হয় তাড়া-তাড়ি তা আর পূরণ করা সম্ভব হয় না। আর একটি দেশের যুব সমাজকে নৈতিকভাবে অধঃপতিত করতে পারলে সেই দেশটির উপর স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়—এটাতো জানা কথা।

কিন্তু আমরা সব চেয়ে আশ্চর্য হই এই কথা ভেবে যে, আমাদের সরকার সমুদয় পরিস্থিতি সম্যক অবহিত থেকেও কি করে এই প্রক্রিয়া চলতে দিচ্ছেন। তাহলে কি এটা ধরে নিতে হবে যে, আমাদের সরকারের মধ্যেও বিদেশী স্বার্থের ধারক ও বাহকরা বেশ নিরাপদে ঘাপটি মেরে থেকেই এই অধঃপতন প্রক্রিয়ায় মদদ দিয়ে চলেছেন ?

বলা বাহুল্য, বর্তমানে অবস্থা এতই সঙ্গীন যে, এ বিষয়ে কালহরণ করার সময় আর নেই। এই মুহূর্তে থেকেই এর প্রতিকার চেষ্টায় আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার। সর্ব প্রথম খুঁজে বের করা দরকার কোন কোন ছিদ্র পথ দিয়ে অধঃপতনের বেনোজল আমাদের সমাজের মধ্যে ঢুকছে।

বক্ষমান আলোচনায় আমরা দেখছি, আমাদের প্রশাসন যন্ত্রের মধ্যে নৈতিকতা বিরোধী যে সব ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয় তার প্রভাব কখনো

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষভাবে আমাদের যুব সমাজের চরিত্র হননে সহায়তা করে। বাপ ঘুষ খেলে ছেলেও ঘুষ খাবে আমাদের প্রতি পাদ্যকে এই ভাবে সরলীকরণ করতে অবশ্যই আমরা চাই না। তবে ঘুষ খেয়ে অতিরিক্ত অর্থ ঘরে আনলে ঘরের ছেলে মেয়েদের চাহিদা ও সরবরাহের চৌহদ্দি যে বিস্তৃত হয়ে পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। এবং যেহেতু একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার পরে প্রয়োজনের কোন শেষ নেই কাজেই আগেই উল্লেখিত আগুনের উপমায়, আগুনের পক্ষে খাদ্য কখনো যথেষ্ট হয় না, এই নিয়মে আকাংখা মিটিয়ে আকাংখার কখনও নিবৃত্তি করা যাবে না। আমাদের শিক্ষিত সমাজে একটা জিনিষ সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন, ঘরের স্ত্রীরা প্রায়শঃ স্বামীর অসদুপায়ে সম্পদ অর্জনের প্রবৃত্তিকে বাধা না দিয়ে উৎসাহিত করে থাকেন, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, আমাদের এটা নেই, ওটা নেই আমাদের এই জিনিয় থাকা দরকার ঐ জিনিষ না হলে মান থাকছে না, আমার বড় আপার এই আছে ঐ আছে ইত্যাদি বলে, স্বামী বেচারাকে একেবারে পাগল করে তোলেন। পক্ষান্তরে খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায় স্বামী অসদুপায়ে অর্জিত পয়সা দিয়ে একটা নতুন ডিজাইনের শাড়ী বা কোন জিনিষ কিনে আনলে স্ত্রী তা গ্রহণ করতে আপত্তি জানিয়েছে। নারী এবং পুরুষ নিয়েই সমাজ। তবু আমাদের ইদানিং ঘরের মেয়েদেরই দেখা যায় নৈতিকতার মান তুলনামূলক ভাবে নীচু। মেয়েরা তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত বলে যদি এমনটা হতো তা হলে প্রতিকারের উপায় হিসেবে আশা করা যেত যে, শিক্ষিত হলেই এই অবস্থা কেটে যাবে। কিন্তু দেখা গেছে, শিক্ষিত ও সম্পন্ন পরিবারের মেয়েদের মধ্যেই এই সমস্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। অবশ্য একথা খুবই ঠিক যে, আমাদের সমাজের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা নৈতিকমান উন্নয়নের পক্ষে কিছুতেই সহায়ক নয়। আমরা যদি আমাদের বৈধ উপার্জনের ও তদনুযায়ী ক্রয়ক্ষমতার আওতার মধ্যে জীবন যাপন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে সমর্থ হই; তাহলে এই অবাঞ্ছিত সমস্যার কবল থেকে রক্ষা পেতে পারি। কিন্তু যেহেতু এই প্রক্রিয়ার কোন শেষ নেই, কাজেই যত বেশী অর্থ ঘরে আসে একের পর এক চাহিদা ততই বাড়তে থাকে। আর সন্তান সন্ততিরা প্রাচুর্যের বিষক্রিয়ার বিলাসী, শ্রমবিমুখ ও ভোগলিপ্সু হয়ে উঠে। যে সব মানবিক গুণাবলী

www.pathagar.com

শ্রমসাধ্য অনুশীলনের মাধ্যমেই কেবল অর্জন করা যায় শ্রম বিমুখতার জন্য তা আর কোন দিনই অর্জিত হয় না। পবিত্র কোরানে খুব স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে—"যে পরিশ্রম করে না সে যেন অগ্নি ভক্ষন করে" আমরা অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, অধিকাংশ পরিবারে প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন একেবারে লোপ পেয়েছে। বস্তুতঃ নানা বিজাতীয় ধ্যান ধারণা ও মতাদর্শ ব্যাপকভাবে আমদানী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের মূল্যবোধের ভিত্তি এখন পর্যন্ত ধর্মই, কাজেই ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তরে বাধ্যতামূলক করতে পারলে সামগ্রিক মূল্যবোধের বিপর্যয় এড়ানো যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তা ছাড়া দেশ বিদেশের বিশেষ করে প্রাচ্যের মনিষীদের জীবন কাহিনী পড়ানোর যে অভ্যেস আগে ছিল তা পুনরায় চালু করা উচিত। আমাদের মনে রাখা দরকার কোমলমতি তরুণ তরুণীদের অর্থাৎ যুব সমাজের নৈতিক মান উন্নয়নে আমরা যদি ব্যর্থ হই ইতিহাসের কাছে আমরা দায়িত্বহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত হবো।

মানুষের ধর্ম শিক্ষা সমাজ ও সমাজ গঠনেরই শিক্ষা। মানুষের মধ্যে নৈতিক অনুভূতির উন্মেষ ঘটানোর যে শিক্ষা তার ও মূলে রয়েছে ধর্ম। ধর্মের মাধ্যমে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ। যখনই গ্রন্থ গুলোর নির্দেশাবলীর ভুল অথবা স্বার্থ-প্রনোদিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তখনই তা বাতিল ঘোষনা করা হয়েছে এবং পুনরায় মানব কল্যাণের উপযোগী ধর্ম গ্রন্থের প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। পবিত্র কোরান এই সিরিজের মধ্যে শেষ ধর্ম গ্রন্থ যা পরিশুদ্ধ এবং পরিপূর্ণ অবস্থায় মানুষের কাজে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মাধ্যমে নাজেল হয়েছে। ঘোষণা করা হয় পৃথিবী বিলুপ্তর দিন পর্যন্ত এ গ্রন্থের নির্দেশাবলী মানব জীবনে শান্তির সহায়ক হবে এবং এর সোপান 'লা-ইলাহা-ইল্লালাহ-মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ্'। এই অদ্বিতীয় বাণীকে শান্তি (ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত সমাজগত) এবং এবং সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য বিপ্লবের সবক; এই বানীটি-বিপ্লবী। এর প্রত্যেকটি অক্ষর বিপ্লবী। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে সঠিক আধ্যাতিক বিপ্লব, নৈতিক বিপ্লব, বুদ্ধিবাদী বিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব,—বিপ্লবের নীল নক্সা আঁকা আছে এর মধ্যে, এব সৃষ্টিকে সৃষ্টির উত্তম কাজে লাগানোর পথ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

যেহেতু এদেশের মানুষ শতকরা নব্বইভাগ মুসলমান প্রত্যেকটি মুসলমান সন্তানের রক্তে রয়েছে বিপ্লবী ভাবধারা এবং এটাই স্বাভাবিক। এ ইতিহাস ১৫০০ বৎসরের। এ ইতিহাস জগৎ সভ্যতার—তুমি মুসলিম সন্তান ভুলে যেওনা তোমার ইতিহাস তোমার বিপ্লবের ইতিহাস। বাঁচতে হবে—বাঁচতে হবে বিতণ্ডাবাদীদের হাত থেকে, রক্ষা পেতে হবে—শিখতে হবে এবং সে শিক্ষাই হবে মুক্তির পথ।

www.pathagar.com

নারী সমাজ

মেয়েদেরকে আর ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখা চলবে না, এই দাবীটা বর্তমানে খুবই সোচ্চার। বর্তমান যুগেই "নাকি" এই দাবী করছে। এই দাবীর সমর্থনে বলা হচ্ছে, বুদ্ধি বৃত্তির দিক দিয়ে মেয়েরা পুরুষের তুলনায় মোটেই খাটো নয় অথচ সুযোগ সুবিধা ঠিকমত পাচ্ছে না বলে নারী সমাজের বিপুল অংশ ঘরের কোনে আবদ্ধ থেকে নিজেদের বুদ্ধি বৃদ্ধি ও প্রতিভার সকল সম্ভাবনা বিনষ্ট করছে সুতরাং মানব জাতির সাধারণ কল্যাণের জন্যই এই অবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন।

কথাটা নানা দিক দিয়েই ভেবে দেখবার মত। মেয়েদের বুদ্ধি-বৃত্তি পুরুষের তুলনায় হয়ত কোন অংশেই ন্যূন নয়। স্কুলে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনের অন্য নানা কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের সমান সুযোগ যেখানেই পেয়েছে, সেখানেই তারা পুরুষের সমান কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থ হয়েছে। আগে যেমন ধারণা করা হতো যে, দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হয় এমন সব ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষের তুলনায় পেছনে পড়ে থাকে বর্তমানে সে ধারণাও কিছু কিছু পাল্টে যাচ্ছে। উন্নত দেশে মেয়েরা পুরুষের সমান কৃতিত্ব দেখাচ্ছে জীবনের নানা কঠিন কঠিন ক্ষেত্রেও। দেহবল ও মেধার সমান প্রয়োজন হয় এমন নানা ক্ষেত্রেও মেয়েরা কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থ হয়েছে পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবেই। অতএব পুরুষের চেয়ে মেয়েরা দুর্বল এই ধারণা বস্তুতই অমূলক। তাছাড়া মেয়ে এবং পুরুষ কেউ কারো চেয়ে খাটো নয় ইসলাম সহ বিশ্বের প্রগতিশীল সকল ধর্মমতও এই ধারণা সমর্থন করে। ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) অত্যন্ত বলিষ্ঠ কন্ঠেই নর-নারীর মেধা কর্মক্ষমতা ও অধিকারগত সমতা প্রচার করেছেন।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে বর্তমান যুগে নারী পুরুষের এই সমানাধিকার তত্বের ভিত্তিতে নারী পুরুষের কর্ম ক্ষেত্রের মধ্যেকার সীমারেখা মুছে

www.pathagar.com

দেবার যে প্রচেষ্টা, তার ফল দাঁড়াচ্ছে সমাজের সাধারণ কল্যাণের পক্ষে ক্ষতিকর। নারী সমাজের মেধা, কর্মশক্তি, উদ্যম, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির প্রতি সমান শ্রদ্ধা রেখেই আজ আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে, সমাজের সাধারণ কল্যাণের পক্ষে নারীত্বের শক্তির কি ভাবে সদ্ব্যবহার করা যায়। কথায় কথায় আমরা ইউরোপের তুলনা দিয়ে থাকি। ইউ-রোপীয় সমাজের অনুকরণে আমরাও দেখতে চাই আমাদের মেয়েরা ইঞ্জিনিয়ার হোক, ব্যবহারজীবি হোক, পাইলট হোক এবং আরো পুরুষেরা যা যা হতে পারে তার সব কিছুই হোক। পূর্বেই বলেছি, সম্ভাবনার দিক দিয়ে এর কোনটাই অস্বীকার্য নয়, কিন্তু ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশ সমূহের অনুকরনে আমরা এসব চাইছি, একবারও কি আমরা ভেবে দেখছি, আমাদের দেশে শিল্প বিপ্লব এখনো হয়নি কিংবা অদূর ভবিষ্যতে হবে এমন সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

আমাদের জীবনাদর্শ ভিন্ন, আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ আলাদা এ সব কথা বলে আমি নতুন বিতর্কের অবতারনা করতে চাই না কিন্তু গৃহের চার দেয়ালের অবরোধ থেকে মুক্তি দেবার নাম করে মেয়েদেরকে পথে নামিয়ে এনে আমরা যে নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার জন্ম দিচ্ছি তা সম্পূর্ণ খোলামন নিয়েই একবার পর্যালোচনা করে দেখা দরকার নয় কি ?

আমাদের অনুন্নত দেশগুলিতে মানবীয় শ্রম শক্তির বিপুল আংশ বেকার। দক্ষ, আধাদক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের লক্ষ লক্ষ শ্রমঘন্টা প্রতিদিন কাজের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচেছ। আমাদের বাংলাদেশের কথাই ধরা যাকঃ নানাস্তরের প্রায় এক কোটি যুবকের কোন কর্মসংস্থান নেই। দেশে যে পরিমাণ শিল্প কলকারকানা রয়েছে তাতে এই বিপুল সংখ্যক বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হতে পারে না। অন্যদিকে আবাদী জমির পরিমাণ জন সংখ্যার তুলনায় কম। এক জনে যে কাজ করতে পারে সেই কাজ করছে তিনজনে চার জনে। তা ছাড়া ভূমি মালিকানা ব্যবস্থা এমন যে, মোট জমির অধিকাংশ মাত্র ১৮ শতাংশ অকৃষক জোতদারের দখলে রয়েছে ফলে যার কাজের লোক আছে তার জমি নেই আবার যার জমি আছে তার কাজের লোক নেই।

আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান এই সমস্যাগুলো ভুলে গিয়ে আমাদের উৎপাদন উপকরণের (জমি, খনিজ সম্পদ ও মানবীয়

www.pathagar.com

র্ম শক্তি) সঠিক ব্যবহার যে সম্ভব নয় এটা প্রথমেই মেনে নেয়া দরকার। আমরা সঠিক ভাবে এখনো জানি না, আমাদের জাতীয় শ্রম শক্তির মোট কত অংশ প্রকৃত উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কত অংশ কর্মহীন বেকার। এরপর ও বিদ্যমান অবস্থা হলো উপনিবেশিক আমলের, প্রশাসন কাঠামোর চরিত্র অনুসারে এদেশের চাকুরীতে বিপুল অংশ (মোট জন সংখ্যার ৬-৭ শতাংশ) বলতে গেলে কোন উৎপাদনী কাজেই সহয়তা করতে পারে না। আদমজী মিলের একজন বৃদ্ধ শ্রমিক একবার আমাকে বলেছিলেন, ম্যানেজমেন্ট থেকে খতকরা ৫০ ভাগ লোক কমালে উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ বাড়বে এবং প্রশাসনের লাল ফিতার দৌরাত্ব বলে যে কথাটি আছে সে সম্পর্কে মাওসেতুং একবার বলেছিলেন, "আমলাতান্ত্রিক দফতরবাজি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি বন্ধক" আমাদের মোট শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা মোট জন সংখ্যার দেড় শতাংষের মত। বাকি সব মানুষ জমি আঁকড়ে পড়ে আছে উৎপাদনের নামে এবং বসে বসে খাচেছ। কৃষি ক্ষেত্রের অবস্থা হলো, দুই কোটি ৪০ লাখ একর আবাদী জমি বিভক্ত হয়ে আছে প্রায় ৬২ লক্ষ কৃষি খামারে। এর মধ্যে অধিকাংশ খামারই ঘাটতি (প্রায় ৫৭ লক্ষ)। এই সব ঘাটতি খামার মালিক কৃষকদের পরিবারে গড়ে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে তিনজন বেকার। গ্রামের জোতদার ও ধনী কৃষকরা নিজেরা জমির উপর কাজ না করে বিভিন্ন ব্যবসা চাকুরী এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। অবস্থান বদলের এই প্রক্রিয়া দ্রুত। এদের ঘরের ছেলে মেয়েরা লেখা পড়া শিখেছে বা শিখছে এবং শহরের চাকুরী, বড় ব্যবসায় ইত্যাদি দখল করে নিয়েছে এবং নিচেছ। এদের দেখা দেখি গ্রামের যে সব গরীব কৃষকদের ছেলে কষ্টে সৃষ্টে উচ্চ শিক্ষা নিচেছ তারাই বেশীর ভাগ চাকুরীর অভাবে শহরে বন্দরে ঘুরে বেড়াচেছ। গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তিজীবি মানুষ আপন আপন কৌলিক পেশা আঁকড়ে আর থাকতে পারছে না। গোচারণ ভূমির অভাবে গোয়ালারা (ঘোষরা) পশু পালন বৃত্তি ত্যাগ করেছে, কাপড় বুনে পেট চলে না বলে শত শত গরীব তাঁতী তাঁত বোনা ছেড়ে দিয়ে দিন মজুরী করছে, এমনি করে কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, কলু প্রভৃতি বৃত্তিজীবী লোকের বিপুল অংশ কর্মহীন বেকার জীবন যাপন করছে। আর কৃষি ক্ষেত্রেতো বেকারের কোন সীমাই নেই। সরকারের কাছে শিক্ষিত

www.pathagar.com

অশিক্ষিত নানা স্তরের বেকারের মোট সংখ্যা সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য নেই। আমাদের সামাজিক অবস্থা হলো এই। অথচ দেশের দায়িত্ব-শীল সরকারের প্রধান কাজ হলো, সমাজের সঠিক অবস্থাগুলো তথ্য প্রমাণ সহ বুঝে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া। মূল লক্ষ্য হলো শ্রমশক্তি ও জাতীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং উৎপাদন বৃদ্ধি কিন্তু দেশের সরকার এ দায়িত্ব পালনে আজো সক্ষম হয়নি।

এইবার একটা প্রশ্ন পরীক্ষা করা যাক। বাংলাদেশে স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সকল পর্যায়ে বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এ সব মেয়ের দক্ষ শ্রম শক্তিকে কি ভাবে কাজে লাগানো যাবে সে সম্পর্কে জাতীয় ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াই সরকারী অধাসরকারী বিভিন্ন বিভাগে এদের চাকুরী দেয়া হচ্ছে। অবশ্য যারা চাকুরী পাচ্ছে তারা অধিকাংশই উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। তারা চাকুরী পেয়ে সমাজের অর্থনৈতিক দুর্দশার কোন লাঘব করতে পারছে না। বরং চাকুরী করার ফলে তাদের নিজেদের পরিবারের আয় বাড়ছে, ফলে সুখ স্বাচ্ছন্দ বাড়ছে কিন্তু গরীব কৃষকের যে ছেলেটা বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করে ঘরে বসে আছে তার চাকুরী পাওয়ার ক্ষেত্রটা সংকুচিত হচ্ছে। চাকুরীটি কি যার যথার্থ প্রয়োজন তাকে দেয়া হচ্ছে? নাকি তেলা মাথায় আরও তেল দিয়ে সমাজের শৃঙ্খলা আরো বিপন্ন করার পদক্ষেপ নেয় হচ্ছে? না—না শ্রেণী বিশেষের বিরুদ্ধে শ্রেণী বিশেষের ঘৃণা প্রচারের উদ্দেশ্য আমি একথা বলছিনে। যথার্থই ভেবে দেখা দরকার নয়কি, কার কর্মের সংস্থান হলে আরো পাঁচ জনের অন্নের সংস্থান হয় এবং এই একান্ত ন্যায্য প্রশ্ন উপেক্ষা করে, যেহেতু মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কোন অংশেই খাটো নয়—এই অধিকার বাদের উপর মেয়েটাকে চাকুরী দেয়া ঠিক হচ্ছে?

আমাদের রাষ্ট্র নেতারা উন্নত দেশে সফরে গিয়ে মেয়েদের নানান কৃতিত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে এবং তদানুযায়ী আমাদেরকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মাঝে মাঝে এক একটা অপূর্ব কাণ্ড করে বসেন। আমাদের দেশের মেয়েদের পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ এমনি এক তাক লাগানোর ব্যাপার। রাজধানীর সবাই এক সময় দেখেছেন, বিভিন্ন পুলিশ বক্স থেকে মিহি গলায় মাইকে ট্রাফিকের কলা কৌশল আবৃত্তি করেছেন নীল বসনা মহিলা পুলিশ। কখনো এই নীল বসনা পুলিশ ললনাদের মোড়ে

www.pathagar.com

মোড়ে জেব্রা ক্রসিং এর এপার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে বিব্রত প্রস্তর মূর্তির মত। আজন্ম শাড়ী পরা ঘরের মেয়েদের এ ভাবে রাস্তার মোড়ে এক হাট মানুষের ভীড়ে নীল কুর্তা পরিয়ে দাঁড় না করালে কি আমাদের প্রগতি মাঠে মারা যেত? না কি ইট চাপা পড়ে থাকতো? তাদের এখন দেখছিনে কেন? চাকুরী যখন দেয়া হয়েছে তখন তাদের নিশ্চয় ছাটাই করে দেয়া হয়নি, তাদের কি এখন বসিয়ে বসিয়ে মাহীনা গোনা হচ্ছে? নিম্নবিত্ত ঘরের এসব মেয়েদের পুলিসের এই চাকুরী গুলো না দিয়ে যদি গরীব ঘরের স্বল্প শিক্ষিত যুবকদের চাকুরীগুলো দেয়া হতো তা হলে তারা নিশ্চয় বিয়ে করে কিছু মেয়ের অন্নের সংস্থান করতে পারতো। কিন্তু কোন পুলিশ মেয়ে কোন বেকার যুবককে বিয়ে করে তার অন্নের সংস্থান করেছে, এমন নজীর কি আছে?

প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী মানুষ সমাজ পুরুষ প্রধান। যদিও পারিবারিক পরিবেশে মেয়েদের প্রধান্য পুরুষের তুলনায় মোটেই কম নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষ বেশী। তবে সাংগঠনিক রূপের দিক দিয়ে এ সমাজ পুরুষ প্রধান এবং পুরুষদের এ প্রধান্য বিয়ে, সম্পত্তির উরাধিকার প্রভৃতি আইন দ্বরা স্বীকৃত। সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন না ঘটিয়ে মেয়েদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়ে অনেকাংশে মন রাখা স্বীকৃতি স্বরূপ কিছু কিছু মেয়েকে চাকুরীতে নিয়োগ দান করে সমাজের সাধারণ শান্তি বিপন্ন করে তোলা হচ্ছে যার ফল সামগ্রিক দৃষ্টি কোণ থেকে মোটেই শুভ হচ্ছে না এবং প্রকৃতির নিয়ম বিরোধিতা করা হচ্ছে। যে সব দেশে শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজের বুর্জোয়া বিকাশ সাধিত হয়েছে সে সব দেশে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সর্বত্র কাজ করছে বা সমাজের উন্নতি ঘটাচ্ছে। এর ফল সেখানেও ভাল হচ্ছে না মন্দ হচ্ছে সেটা ভিন্ন আলোচনার বিষয়, তবে সে সব দেশের পারিবারিক বন্ধন যে খুবই শিথিল এবং ক্রমেই আরো শিথিল হয়ে যাচেছ তা সবাই জানেন। সেই সব শিথিল বন্ধন পরিবার সমাজকে যে আর আশ্রয় দিতে পারছে না—,এ নিয়ে সে দেশের সমাজ বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। যাই হোক আমাদের দেশে শিল্প বিপ্লব হয় নি, কবে নাগাদ হবে তারও কোন ঠিক নেই। সমাজের শ্রম শক্তির বিপুল অংশ অব্যবহৃত থেকে যাচেছ। এ অবস্থায় একটা বিকশিত বুর্জোয়া দেশের অনুকরণে আমরা যদি আমাদের পুলিশ, আনছার, দেশ রক্ষা প্রভৃতি বাহিনীতে

www.pathagar.com

মহিলা নিয়োগ করে প্রগতির আনন্দে অভিভূত হই তা হলে পুরানোক্ত মহাবীর অশ্বত্থামার দুগ্ধ পানের মতই একটা শোচনীয় রকমের হাস্যকর ব্যাপার হয় নাকি ?

আমার এই আলোচনায় নারী পুরুষের সমানাধিকার তত্ত্বে বিশ্বাসী মহিলারা ক্ষুণ্ণ হতেও পারেন। তবে এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিনীত ভাবে আমি একটা কথা বলতে চাই। মেয়েরা সাধ্যমত শিক্ষালাভ করুন এবং যত খুশী যে কোন বিষয়ে পারঙ্গম হয়ে উঠুন এটাই সবার আকাঙ্খা। তবে চাকুরী দানের ক্ষেত্রে এই বিবেচনাটা অবশ্যই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত যে, জীবন ধারণের জন্য কে চাকুরীর প্রার্থী এবং কে চাকুরী চাচ্ছে জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি তথা আরো একটু বেশী স্বাচ্ছন্দ আনবার জন্য। দেখা গেছে উচ্চ মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়েরা চাকুরী করে যে টাকা উপার্জন করেন, তার বেশীর ভাগ ব্যয়িত হয় শাড়ী গহনা আর কসমেটিক্স কেনায়। এটা এমনই এক বাস্তব সত্য যে এটাকে অস্বীকার করা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেক বড় ঘরের চাকুরীজীবি মেয়ের কথা জানা যায় যারা বেতনের বেশীর ভাগ টাকা দিয়ে প্রতি মাসে নতুন নতুন ডিজাইনের শাড়ী কেনেন। এ ভাবে অনেকের শাড়ীর কালেক-সান হাজার ছাড়িয়ে যায়। সমাজ বিজ্ঞানের ডিগ্রি নিয়েছেন এমন মেয়ে-ও আছেন যারা নিজেদের সমাজের পরিচিতদের মধ্যে কার কত সংখ্যক শাড়ী আছে এবং কত ডিজাইনের আছে তা নিয়ে সময় সময় সিরিয়াস আলোচনা মেতে উঠেন। এর জন্য অবশ্য মেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কেননা মুখে যতই সমানাধিকারের কথা বলা হোক এই সব তথাকথিত শিক্ষিতা ও শিক্ষাভিমানী মেয়েরা নিজেদের দেহকে এখনো পুরুষের ভোগের বস্তুর বাইরে কিছু ভাবতে শেখেনি। এরা বাবা মা বা স্বামী শশুরের কাছ থেকে আকাঙ্খা মত টাকা নিয়ে মনের মত করে সাজে। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর উম্মতদের উদ্দেশ্যে যদিও বলেছেন, তোমরা তোমাদের অঙ্গ সমূহকে গোপন কর এবং

www.pathagar.com

লজ্জাকে উন্মোচিত করো না সে কথা এ সব মুসলমান মহিলাদের মনে কোন রেখা পাত করে না।

আমরা সবাই জানি, আমাদের দেশের হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক বেকার। নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন পরিবারের ছেলেরাই যেহেতু এই বেকার দের বৃহদংশ, কাজেই এই সব পরিবারের আর পাঁচটা সাধারণ সমস্যার মধ্যে কন্যাদায় একটি দুরুহতম সমস্যা। এ সব মেয়েদের যারা সম্ভাব্য বর তাদের কর্ম সংস্থান নেই। অতএব তারা বিয়েও করতে পারছে না। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে মেয়ে সেয়ানা হচেছ এবং হতে হতে অরক্ষণীয়া হয়ে দাঁড়াচেছ—এই বাস্তবতাকে সেই কেবল অস্বীকার করতে পারে যে মূঢ়। অথচ দেখা যাচেছ এই মূঢ়তাই আমাদের সমাজের প্রধান প্রবনতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের এই বাস্তবতা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই আমরা দেখতে পাবো, সামাজিক সমস্যার সমাধান হিসেবে যে পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি তা কতদূর ভ্রান্ত আর যাকে আমরা সমাধান হিসেবে ভাবছি তা সমাধান তো নয়ই বরং নতুন নতুন সমস্যার জননী মাত্র। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে মানুষের ঘরবসত আজ ভেঙ্গে উজাড় হয়ে যাচেছ। পরিবারের পবিত্র ধারণা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যাচেছ বদলে। অতিজনতার মধ্যে মানুষের নির্জনতা করুণ হয়ে উঠেছে। বুড়োবুড়ীদের সঙ্গ দেয়ার কেউ নেই। খবরের কাগজ পড়ে অনেকের জানতে হয় তাঁর জনক বা জননী অমুক 'হোম' এ মারা গেছেন। হোষ্টেলবাসী ছেলে বা মেয়ে জানতে পারে না তার মা এখন কার সঙ্গে ঘর করছে কিম্বা তার বর্তমান পিতা কতদিন বর্তমান থাকবেন। এ অবস্থা অমাদের দেশেও ডেকে আনা হচেছ। এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তা ধেয়ে আসছে। কিন্তু একটা ব্যাপার আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে, আমাদের দেশে হয়নি, অথচ শিল্প বিপ্লব সম্পন্ন হবার পর সমাজের বহিরঙ্গে যে ধাক্কা লাগবে এবং তার ফলে সমাজের মর্মমূলে যে ফাটল দেখা দেবে শিল্প বিপ্লবের আগেই আমাদের দেশে তা দেখা দিয়েছে। এর চেয়ে দুঃখজনব আর কিছু নেই।

আমাদের দেশে পরিবারের পবিত্র ধারনায় প্রথম কিছু কিছু আঘাত লাগতে শুরু করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারত দখলের পর। বৃটিশের সংস্পর্শে আসা ইংরেজী শিক্ষিত কিছু পরিবারে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে

www.pathagar.com

প্রথম। বৃটিশের চলে যাবার পরেও সে হাওয়া সমানেই বয়ে চলেছে কিংবা বলা যায় আরো জোরদার হয়েছে। বৃটিশের সদগুন আমরা বিশেষ অর্জন করেনি তবে ব্যক্তির (নর-নারী নির্বিশেষে) আত্মবিকাশের অধিকারের নামে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের ষোল আনা অনুশীলন করছি। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ আমাদের সমাজে আত্মপরায়নতার জন্ম দিয়েছে। এই আত্মপরায়নতা তথা আত্মকেন্দ্রিকতা সমাজের শিক্ষিত অংশকে এই ভাবে অধিকার করছে যে, মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে প্রভৃতি সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের আয়ত্তে মানুষের যে পরিচয়, সে পরিচয় এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে গৌন। স্ত্রী ভাবছে তার রোজগার না করলে তার আত্মস্বাতন্ত্র বুঝি আর অক্ষুন্ন থাকলো না। ফলে আর্থিক প্রয়োজন থাক বা না থাক সে একটা চাকুরী নিল। দেখা দেখি বিশেষ প্রয়োজন নেই তবু উচ্চবিত্ত ও নব্য ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের মেয়েরা দলে দলে চাকুরী নিচেছ এবং এই ভাবে গ্রামের গরীব গৃহস্থের শিক্ষিত ছেলের চাকুরীর ক্ষেত্রকে সংকুচিত করছে।

বর্তমান আলোচনা শেষ করার আগে পুনশ্চ এই কথাটা বলে নিতে চাই যে, মেয়েদের চাকুরী করার আমরা বিরোধী নই। তবে বিনীত পরামর্শ হিসাবে এই টুকু নিবেদন করতে চাই যে, বিশেষ বিশেষ বিভাগ যেমন, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মেয়েদের জন্য রিজার্ভ করা হোক। এবং সমস্ত পুরুষ মানুষের কর্মসংস্থানের আগে প্রাণধারনের জন্য জরুরী নয় এমন কোন মেয়ের চাকুরী যেন না দেয়া হয়। আমাদের মত অনুন্নত আর বেকার সমস্যায় আকন্ঠ ডুবে থাকা দেশের পক্ষে কিছু সংখ্যক বড় ঘরের মেয়ের ব্যবসা প্রশাসনাদি বিভাগে উচ্চ পদে সমাসীন থাকা প্রগতির লক্ষন বলে যারা মনে করেন, তাঁরা একদেশদর্শী। সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে গেলে এ রকম সমাজের জন্য শোক করা উচিত। নারীরাই মহৎ যতক্ষণ ওরা স্ববশে থাকে।

www.pathagar.com

আমদানী নীতি জাতীয় শিল্পের বিকাশের পরিপন্থি

বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি হলো কৃষি। জাতীয় আয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। আমাদের সরকারী অর্থনীতিবিদরা নিশ্চয় জানেন, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি মানেই দুর্বল অর্থনীতি। যত দিন জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিরভূমিকা প্রধান থাকে ততদিন তার দুর্বলতা ঘোঁচে না। কাজেই অর্থনীতির দুর্বলতা ঘোঁচাতে হলে কৃষির উপর থেকে তার নির্ভরতা কাটাতে হবে। এবং কৃষিভিত্তিক অর্থ-নীতিকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। একটা দেশের সমৃদ্ধির সেইটাই পরীক্ষিত পথ। আর এটা যে সরকারী খাতে হওয়া সম্ভব নয় তাও সরকার প্রমান করেছেন। বিনিয়োগ এখনও সরকারী খাতেই বেড়ে চলেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংলাদেশের জন-নেতারা যারা এর সমৃদ্ধি ঘটাবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তারা বিষয়টা ভূলে যান কিংবা সম্যকজ্ঞানের অভাবে শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ে বসে থাকেন।

যদিও এ যাবত যাঁরাই ক্ষমতায় এসেছেন সবাই স্বীকার করেছেন দেশকে ক্রমান্বয়ে শিল্পায়িত করতে হবে এবং শিল্পায়নের পক্ষে প্রচারও চালিয়েছেন, কিন্তু একটা কৃষিনির্ভর দেশকে শিল্পায়িত করতে হলে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার, জাতীয় সঞ্চয়কে যে ভাবে কাজে লাগানো দরকার কিংবা বিদেশী সাহায্যকে যে ভাবে ব্যবহার করা দরকার তা করা হয়নি। ভূল নীতির জন্য কৃষি খাতের উদ্বৃত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত না হয়ে অধিকাংশ ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হয়েছে, কৃষির উদ্বৃত্ত জমি ক্রয়ে, ঘর বাড়ী দালান কোঠা নির্মানে আর বড় জোর ধান কল প্রতিষ্ঠা করে কিংবা দুই একটা ট্রাক বা বাস কিনে পরিবহন ব্যবসায় খাটিয়ে বড় লোক হবার সহজ রাস্তা অবলম্বিত হয়েছে। বিগত দশকগুলিতে আমাদের চোখের সামনে যে সব কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির দেশ শিল্পায়িত হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা স্মরণ

www.pathagar.com

করলে আমরা দেখবো, আমরা নীতিগতভাবে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি সে পদ্ধতিতে কোন দেশই শিল্পায়িত হয় নি।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে সরকার ক্ষমতাসীন তারা নিজেদেরকে জাতীয়তাবাদী বলে দাবী করে থাকেন। এই দাবীর পেছনে সরকারী দলের নাম "জাতীয়তাবাদী" এই টুকু ছাড়া জাতীয়তাবাদের প্রকৃত পক্ষে কোন বৈশিষ্টই চোখে পড়ে না। আমরা আমাদের দেশকে শিল্পায়িত করতে চাই—যথাযথ পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও উদ্যোগ ব্যতিত নিছক এই ইচ্ছার কি আদৌ কোন মূল্য হতে পারে? বরং কাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থায় এই ধরণের কথাবার্তাকে প্রতারনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর তৎকালীন সরকার পাকিস্তানী আমলে প্রতিষ্ঠিত সব কলকারখানা, ব্যাংক ও বীমা ব্যবসায় জাতীয়করণ করেন। তৎকালীন সরকারী নেতারা তাদের বিদেশী "মুরুব্বীদের" মনোরঞ্জনের জন্য নিজেদেরকে সমাজতন্ত্রের পথের পথিক বলে পরিচয় দিতে ব্যাকুল ছিলেন বলে পাকিস্তানী আমলের শিল্প, ব্যাংক ও বীমা ব্যবসায় জাতীয়করণ করে নেন। প্রকৃত পক্ষে ঐ জাতীয়করণ ছিল পার্টিকরণ মাত্র। পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকরা নেই, এ দেশীয় মালিকদেরকেও পাকিস্তানপন্থী বলে নিগৃহিত করার মত অনুকুল অবস্থা বিদ্যমান, সুতরাং ক্ষমতাসীন পার্টির বসংবদ ও অনুগ্রহ-ভাজন ব্যক্তিদেরকে রাতারাতি ঐ সব কলকারখানার প্রশাসক বানিয়ে দেয়া হলো। তার ফল কি হয়েছিল দেশবাসী জানেন। কলকারখানা গুলোতে প্রতি বছর বিপুল পরিমান লোকসান ঘটতে লাগলো। যে সব শিল্প কিছু দিন আগেও পুরোপরি লাভজনক ছিল তা হয়ে দাঁড়ালো লোকসানের কারবার। লোকসান পুষিয়ে শিল্পটাকে কোন রকমে টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো থেকে ভর্তুকী দেয়া হতে লাগলো দেদার। কিন্তু যতই ভর্তুকী দেয়া যাক, ফুটোপাত্রে পানি ঢালার মত সমুদয় উদ্যোগই নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হলো, ভর্তুকীর ইন্‌সুলিন দিয়ে দিয়ে শিল্পগুলোকে কোন রকমে টিকিয়ে রাখা হলো বটে কিন্তু প্রাণবন্ত আর হয়ে উঠতে পারলো না। অদ্যাবধিও না।

www.pathagar.com

কিছু দিন আগে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি স্বীকার করেছেন, শিল্পগুলো থেকে মিথ্যা রিপোর্ট দেয়া হয়। লোকসান হলেও হিসাবের কারসাজীতে লাভ দেখানো হয়। উৎপাদন শক্তির ৪০ শতাংশ ব্যবহার হলে ৮০ শতাংশ হয়েছে বলে দেখানো হয়। এমনি করে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সেকটর টাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু লোকসানের কারবার নয়, ফাঁকির ও কারবার। মোট কথা গুটি কয়েক পরিচালক আর কর্মকর্তা মিলে দেশের সমুদয় শিল্প সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে এটাকে নিজেদের ভাগ্য গড়ার উপায়ে পরিণত করেছেন এবং সারা জাতির চরিত্রটাকে ধ্বংস করে ছেড়েছে। এটাই ছিল জাতীয়করণের অন্যতম আর একটা কারণ। অধুনা এই প্রসঙ্গটি এতই পুরনো ও বহুল আলোচিত যে এ নিয়ে নতুন করে কোন আলোচনাও এখন অবান্তর মনে হতে পারে। মোটের উপর বিষয়টা সবারই অনেকটা গাসহা হয়ে গেছে। অনেক দিনের কুষ্টরোগীর যেমন হয়, হাত পায়ের আঙ্গুল গুলো খসে গেছে কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই।

আমাদের জাতীয়তাবাদী সরকার দেশকে জাতীয়তাবাদে দিক্ষা দিচেছন। নতুন করে অবশ্যই। কারণ বলা হচেছ, ভূতপূর্ব সরকার গুলি দেশকে বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহের কাছে বন্ধক দিতে বসেছিল কিন্তু দেশের সচেতন জনগণ ও দেশের স্বার্থ রক্ষায় যারা অতন্দ্র, তাদের সময় মত হস্তক্ষেপের ফলে সেই সর্বনাশা পরিনাম থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে (শুকুর আলহামদোলিল্লাহ)! কথাগুলোর আগের অংশ খুবই যথার্থ, কিন্তু পরবর্তী অংশ অর্থাৎ সময় মত হস্তক্ষেপের এবং সর্বনাশা পরিনাম থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রসঙ্গটি? একটু যাচাই করে দেখলেই বোঝা যাবে, পদ্মলোচন নামের ছেলেটি আসলে কানা, ঐ পদ্মলোচন নাম একটা মমতাহীন প্রতারনার চক্রান্ত মাত্র।

জাতীয়তাবাদ নিসন্দেহে জাতির স্বার্থকেই প্রধান্য দিয়ে থাকে। অন্য সব কিছুর উপরে সে স্থান দেয় জাতীয় স্বার্থের। কোন দেশে যদি জাতীয়তাবাদী সরকার ক্ষমতায় থাকে তাহলে সেই দেশের অর্থ-নীতি, কৃষি, শিল্প, আমদানী-রফতানী, জাতীয়তাবাদী চরিত্র নিয়েই গড়ে উঠে। তার আমদানীতি কখনই শিল্পনীতির পরিপন্থী হয় না, তার রফতানী নীতি সব সময় নির্ধারিত হয় জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের আমদানী নীতি

www.pathagar.com

দেশীয় শিল্পের স্বার্থে রচিত হয়নি, বরং এই আমদানী নীতি রচিত হয়েছে নতুন নতুন শিল্প গড়ার সম্ভাবনাকে অংকুরে বিনষ্ট করতে আর পুরনোগুলোর অস্তিত্বকে বিপন্ন কিংবা সঠিক ভাবে বললে বলতে হয় অসম্ভব করে তুলতে। কোন যুদ্ধ বিনা কারণে তো হয় না। বোধ হয় আমারা গতবার যুদ্ধ করছিলাম "স্বাধীনতার" নামে নিজের গৃহে অন্যের বাজার সৃষ্টি করার জন্যেই। বস্তুতই আমাদের আমদানী নীতি দেশের কতিপয় লাভজনক ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পের বেঁচে থাকাকেই অসম্ভব করে তুলছে। একটা উদাহরণ পরীক্ষা করা যাকঃ ষ্টোরেজ ব্যাটারী।

গোড়ায় এই শিল্পটার অবস্থা বেশ সন্তোষজনক ছিল। পাকিস্তানী শাসনামলে এই শিল্পটি দেশের সমুদয় ষ্টোরেজ ব্যাটারীর চাহিদা মেটাতো। তখন দেশে ছিল ১০টি ষ্টোরেজ ব্যাটারী শিল্পের কারখানা। ১৯৭৫ সালের পরে চাহিদা বেড়ে গেলে আরও ১০টি কারখানা স্থাপিত হয় ও উৎপাদন শুরু করে। এই কারখানাগুলি ভাল ভাবেই জাতীয় চাহিদা মিটিয়ে আসছিল। কিন্তু মাঝখান থেকে সরকার বিদেশ থেকে ব্যাটারী আমদানীর নীতি গ্রহণ করে বসলেন। বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ব্যাটারী আমদানী করা হতে লাগলো। এদিকে, দেশীয় ব্যাটারী শিল্পের উপর নানা রকম করারোপের ফলে দেশীয় ব্যাটারীর বিক্রয় মূল্য বেড়ে গেল। আমদানীকৃত ব্যাটারীর চেয়ে দেশী ব্যাটারীর (৬ ভোল্ট ও ১২ ভোল্টের) মূল্য পার্থক্য কমপক্ষে ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত। দামের এই তারতম্যের দরুন বেশী দামের দেশীয় ব্যাটারীর বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল। দেশীয় কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বছরে ৬৪ হাজার ব্যাটারী। অথচ উদার আমদানী নীতির ফলে এক বছরে ব্যাটারী আমদানীই হলো ৪৩ হাজারের বেশী। এই বিপুল পরিমাণ বিদেশী ব্যাটারীর বাজার সৃষ্টির জন্য দেশীয় কারখানাগুলির উৎপাদন কমিয়ে দিতে হলো। শুধু তাই নয় বিদেশী ব্যাটারীর দাম কম রাখার জন্য রাজস্ব বিভাগকে করও কম ধার্য করতে হয়েছে। এর ফল হলো এই যে, সরকারের রাজস্ব আয়ও কমে গেছে। সরকারের এই উদার আমদানী নীতি গ্রহণ কি খুব জরুরী ছিল? মোটেই না। দেশে উৎপাদিত প্রতিটি ব্যাটারীর উপর সরকারী কর প্রায় ১০৫৪ টাকা। অথচ আমদানীকৃত ব্যাটারীর উপর সরকার আমদানী শুল্ক ও বিক্রয় কর পায় ৮৭০·৪০ টাকা। আমাদের দেশে ১২ ভোল্টের ১১ প্লেটের একটি ব্যাটারী তৈরীতে

www.pathagar.com

৭৮৫·৩৩ টাকার কাঁচা মাল আমদানী করতে হয়। কাঁচামালের উপর শুল্ক শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ ৩৫৫·১৬ টাকা, বিক্রয় কর ২৩১·২৩ টাকা, কাঁচামাল আমদানীর ব্যয় ৮২·৪০ টাকা, স্থানীয় কাঁচামাল ১৫·৭২ টাকা, শ্রমিক খরচ ৭২·৯০ টাকা, সংস্থাপন ব্যয় ৬১·১০ টাকা এবং বিক্রেতার মুনাফা এর সঙ্গে যোগ করে একটি ব্যাটারীর মূল্য দাঁড়ায় ২৩৬০ টাকা। অন্যদিকে একই মানের আমদানীকৃত ব্যটোরীর দাম পড়ে ২১৫০ টাকা। বিদেশী ব্যাটারীর উৎপাদন খরচ ৫১২·০০ টাকা। আমদানী শুল্ক, ৬৪০·০০ টাকা বিক্রয় কর ২৩০·৪০ টাকা অন্যান্য ব্যয় ২১০·২৪ টাচা। সুতরাং ২১৫০ টাকায় বিক্রয় করলে লাভ হয় ৫৫৭·৩৬ টাকা। জাতীয় শিল্প বিকাশের স্বার্থে সরকারের উচিত যেখানে দেশীয় শিল্পকে প্রটেকশন দেয়া। সেখানে প্রটেকশন দেয়া দূরে থাকুক বিদেশী ব্যাটারীর আমদানী কর ও শুল্ক কমিয়ে অন্য পক্ষে দেশীয় শিল্পের উৎপাদন কর ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করে দেশীয় শিল্পের কোমর ভেঙ্গে দেয়া হচেছ। প্রতিযোগিতায় যাতে দেশীয় শিল্প সহজে ঘায়েল হয়ে যায় তার জন্য আমাদের জাতীয়তাবাদী সরকার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে চলেছেন। অথচ এই শিল্পটাকে বাঁচতে দিলে ৬০০০ লোকের কর্মের সংস্থান হয়। অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে আমরা উন্নত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে যেতে পারি এবং ২২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখা যায়। কিন্তু বিদেশ থেকে ব্যাটারী আমদানী করার ফলে স্বার্থ রক্ষা হচেছ কার? বিদেশী উৎপাদককের না দেশীয় কয়েকজন মুৎসুদ্দি আমদানীকারকের? একই নিয়মে এবং কারণে কাঁচ শিল্পগুলোও বন্ধের পথে।

এবং প্রায় একই অবস্থা ইলেকট্রনিক শিল্প, রেডিও টেলিভিশনেরও। বাংলাদেশে ৬০টি রেডিও সমন্বয় কারখানা রয়েছে যাদের সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৫ লাখ সেট। দেশের চাহিদার চেয়ে বেশী। সরকারের নীতি এ ক্ষেত্রেও দেশীয় শিল্পের বিকাশের অনুকুল নয়। সরকারের জন সংযোগ বিভাগ এ বছর ২ লাখ ৬০ হাজার রেডিও সেট আমদানী করে বসেছেন; সম্ভবতঃ আরো আমদানী করবেন। এ ছাড়া ঘন ঘন শুল্ক ও কর ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে শিল্পটির স্থিতিশীলতা বিপন্ন হচ্ছে। দেশে প্রায় ২০ হাজার সেট টেলিভিশন

www.pathagar.com

উৎপাদনের ক্ষমতা থাকা সত্বেও বিদেশ থেকে উদার ভাবে টেলিভিশন সেট আমদানী করা হচ্ছে। আর দেশীয় উৎপাদনের উপর কর বসিয়ে বসিয়ে বিদেশী সেটের দামের প্রায় কাছাকাছি এনে ফেলা হচ্ছে। এতে এ শিল্পটিও মার খেতে বসেছে। আমদানী না করতে পারলে বিদেশে কমিশন জমা করা যায় না, সম্ভবতঃ এটাই এর মূল কারণ।

সব চেয়ে করুণ অবস্থা বস্ত্র শিল্পের। বস্ত্রে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। বস্ত্রমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন অল্পদিনের মধ্যেই মাথা পিছু ১২ গজ কাপড় উৎপাদন করে আমরা বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবো। কিন্তু এ আশ্বাসের বিপরীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জাপানী প্যান্ট আর সার্ট পিছ এ দেশের বাজার ভর্তি আর ভারতীয় ছাপা শাড়ী আমাদের দেশীয় তাঁতীদের ভাত মেরে বসে আছে। বস্ত্রমন্ত্রনালয় থেকে সচিত্র পোষ্টার ছাপিয়ে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, স্বদেশের পন্য কিনে হও ধন্য ইত্যাদি কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, দেশের বাজার বিদেশী বস্ত্রে ছেয়ে গেছে। সরকারের বস্ত্র মন্ত্রনালয় বস্ত্রশিল্পের বিকাশের পক্ষে অনুকুল কোন পদক্ষেপই প্রকৃত পক্ষে নিতে পারেন নি। নেবার আদৌ কোন ইচ্ছা আছে কিনা তাও বোঝা যায় না। বরঞ্চ বস্ত্র মন্ত্রনালয়ের কথা আর কাজের ফারাক প্রায় মোনাফেকের মত। তুলা উৎপাদনকারী চাষী, বস্ত্রয়নকারী তাঁতী আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রশিল্প মালিকদের কাছে স্বনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ ইত্যাকার বাগাড়ম্বর করা হচ্ছে দেদার আর ওয়েজ আর্নার প্রভৃতি স্কীমের কারসাজির মাধ্যমে ও নানান চোরা পথে অজস্র কাপড় আসছে বিদেশ থেকে। বাংলাদেশের প্রায় ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার তাঁতের মধ্যে প্রায় দু'লাখ তাঁত এখন নানা কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁত বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে অন্ততঃ দশ লাখ লোকের কর্মসংস্থান বন্ধ হয়ে হয়ে যাওয়া। এ সব বিষয় নিশ্চয় বস্ত্র মন্ত্রনালয়ের বিবেচনায় থাকা উচিত কিন্তু বস্ত্র মন্ত্রনালয় এই বাস্তব অবস্থাগুলি বিবেচনায় রেখে কাজ কর্ম করছেন এমন মনে হয় না।

বায়ু মণ্ডলে উর্ধ বা নিম্ন যে কোন প্রকার চাপের ফলে কোন স্থান বায়ুশূন্য হয়ে পড়লে চারদিক থেকে যেমন বায়ুর প্রবাহ শুরু হয়

www.pathagar.com

পণ্যের বাজারের ক্ষেত্রের এ নিয়ম খাটে। বাংলাদেশে প্রায় দুই লাখ তাঁত বন্ধ, স্থানীয় উৎপাদনে চাহিদা মিটছে না এই সুযোগটা নিচ্ছে ভারতীয় তাঁত শিল্প। চোরাচালান বন্ধ করার জন্য সীমান্তে কড়াকাড়ি করে কিংবা পোষ্টার ছাপিয়ে জনগণের কাছে বিদেশী কাপড় না কেনার ফাঁকা আবেদন জানিয়ে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে না। দেশীয় বস্ত্র শিল্পের বিকাশ ঘটাবার পক্ষে অনুকুল যে সব পদক্ষেপ নেয়া দরকার, সময় ব্যয় না করে বস্ত্রমন্ত্রনালয়ের তাই নেয়া উচিত।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব সামগ্রিক ভাবে যে শিল্পনীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন তাতে দেশ তাড়াতাড়ী শিল্পায়িত হবে এমন সম্ভাবনা আদৌ নেই। পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় শিল্প বিনিয়োগ শিডিউল পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ২ হাজার ৩ শত ৫০ কোটি টাকার মধ্যে ১৪০ থেকে ১৫০ কোটি টাকার মত বরাদ্দ করা হয়েছে মূল শিল্পের জন্য। বাদ বাকী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে কিছু শিল্প স্থাপনের জন্য যার মধ্যে রয়েছে বিদেশ থেকে আমদানী করা নানা যন্ত্রাংশের সমন্বয় কারখানা। এ সব সমন্বয় কারখানা নির্মাণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দেশীয় চাহিদা মিটতে পারে, তা বলে এতে করে জাতীয় শিল্পের বিকাশ হলো এটা ভাববার কোন অবকাশ নেই। বিদেশ থেকে যন্ত্রাংশ আমদানী করে সে গুলো জুড়তে গাঁথতে আমরা পারি ঠিকই। কিন্তু যন্ত্রাংশ নিজেদের দেশে তৈরী না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিদেশনির্ভরতা কাটবে কি করে? কাজেই আমাদের দেশে নানা রকম যন্ত্রাংশ তৈরীর জন্য উপযুক্ত কারখানা গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় আমাদের বর্তমান শিল্পনীতির আওতায় হাজার বছরেও দেশে শিল্পবিপ্লব হবে না। কৃষি অর্থনীতির দেশ হয়েই আমাদের থাকতে হবে চিরকাল। এখন সময় এসেছে পরিকল্পনাকারীরা যেন চিন্তা ভাবনা করেন, আমরা যন্ত্রই কিনবো, নাকি যন্ত্রাদি তৈরী করার যন্ত্র কিনবো।

বস্তুতঃ শিল্পায়ন প্রসঙ্গে আমাদের সর্বাগ্রে যে সমস্যার কথাটা মনে পড়ে সেটা হলো পুঁজির সমস্যা। এ সমস্যা আগে ছিল, এখনো আছে, সদূর ভবিষ্যতেও থাকবে। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের আমলারা বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে পুঁজি গঠনে কঠোরভাবে বাধা দিয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সৃষ্টির পরও একই ধারা বয়ে চলেছে কিংবা বলা যেতে পারে সে মনোভাব দৃঢ়তর হয়েছে যাতে জনগনের হাতে পুঁজি গঠন না হয়। এখন পুঁজি সঞ্চিত হচ্ছে আমলাতন্ত্রের হাতে, সেটা উৎপাদনের কোন কাজেই আসবে না বরং মুদ্রা বাজারে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করবে। তবে আমাদের সমসাময়িক কালে সৃষ্ট কতিপয় স্বাধীন রাষ্ট্র অত্যন্ত সীমিত সামর্থ নিয়েই শিল্প স্থাপনে অনেক দুর এগিয়ে গেছে এও আমরা দেখছি। অথচ আমরা প্রকৃত পক্ষে সামান্য অগ্রগতিও অর্জন করতে পারিনি। আমাদের দেশে শিল্প বিপ্লবের পথে অন্যতম প্রধান সমস্যা পুঁজির হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান গুলির দেশ প্রেমিকতার অভাবই বোধ করি সর্বপ্রধান সমস্যা। বর্তমান সরকার জাতীয়তাবাদের নাম নিয়ে আকছার জাতীয় শিল্পের বিকাশের কথা বলছেন, অথচ সরকারের আমলাতন্ত্র উপনিবেশবাদের সাবেকী চরিত্র আজো ত্যাগ করতে সক্ষম হয়নি। সরকারের শিল্পনীতিতে আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাদের বৈষয়িক সহায়তাদানের কথা সাড়ম্বরে বলা হয়েছে কিন্তু শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে সরকারের কাছে গেলে কেউ অনুকুল সহযোগিতা পায় না। উদ্যোক্তাদের এ অফিস থেকে সে অফিসে, এ দফতর থেকে সে দফতরে ঘুরতে ঘুরতে নাজেহাল হয়ে যেতে হয়। ঘুরে ঘুরে হতাশ হয়েও অনেকে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। অনেক সময় সঠিক তথ্যাদি সরবরাহ করা হয় না। কখনো তথ্যাদির অভাবের জন্যে সরবরাহ করা হয় না, কখনো টাকা খাবার জন্য অনর্থক ঘোরানো হয়। আমলাতান্ত্রিক দফতরবাজি অনেককে এতদূর হয়রান করে যে, অনেক উদ্যোক্তাকে অপ্রত্যাশিত টাকা খরচ করার পরও সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে হয়। আর এ গুলো এতই প্রকাশ্য ব্যাপার যে, এ সম্পর্কে নতুন কিছু বলাও প্রায় নিষ্প্রয়োজন।

সরকার রপ্তানী বৃদ্ধির কথা বলেন। রপ্তানী উন্নয়নের জন্য ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের প্রধান প্রধান শহরে এর শাখা অফিস খোলা হয়েছে। রপ্তানী উন্নয়নের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে এখানে এক বিরাট কর্মী বাহিনী সরকারী অর্থের শ্রাদ্ধ করেছেন কিন্তু রপ্তানী করার মত পন্যেরই দেশে অভাব। পাকিস্তান আমলে যে, পণ্য রপ্তানী করা হতো এখন টাকার অংকে রপ্তানী আয় বেশী

www.pathagar.com

দেখানো হলেও রপ্তানীকৃত পণ্যের পরিমাণ কমে গেছে। চিংড়ী মাছ আর ব্যাঙের পা আর পাটের শিকা জাতীয় কিছু পণ্য রফতানী বেড়েছে কিন্তু শিল্প পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ বাড়েনি। কোটি কোটি টাকা খরচ করে রপ্তানী মেলা বসানো হচেছ, দেশের মানুষের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য কিন্তু সেই চিরাচরিত পাট, চা, চামড়া ছাড়া রপ্তানীর তালিকায় নতুন কোন পণ্য সংযুক্ত হয়নি। অন্য পক্ষে আমদানী বেড়েছে আশংকাজনক ভাবে। শিল্পজাত পণ্য আমদানী করে দেশীয় শিল্পের বারোটা বাজানোর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এমন অনেক বিলাস দ্রব্য আমদানী করা হচেছ যা একটা উন্নয়নশীল জাতিকে অধঃপাতে ঠেলে দেয়ার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যই সাধন করে না।

রপ্তানী ব্যবসার বা যে কোন ব্যবসার উপকরণ হিসাবে টেলিফোন, টেলিগ্রাম, চিঠিপত্র, টেলেক্স খরিদ বিক্রয়ের জন্য অপরিহার্য। এখন যারা বাংলাদেশে বসবাস করেন, সকলেই জানেন এই উপকরণগুলি কি কাজে লাগে। একটার সঙ্গে আর একটার ব্যবসার যেগেসূত্র আছে। কোনটাই কাজে আসে না। যেমন টেলেক্সে একটা মেসেজ আসছে কিংবা যাচ্ছে হঠাৎ বিদুৎ বন্ধ। মেসেজ বন্ধ কাজ হলো না—বিল এসে গেলো। ব্যাবসার উপকরণগুলোও দেশের চরিত্রের সঙ্গে অকেজো হয়ে গেছে। সুষ্ঠু ব্যবসা চালাবার উপায় অল্পই থেকে গেছে। রপ্তানি ব্যাবসাতো দুরের কথা অভ্যন্তরীন ব্যবসা সুষ্ঠভাবে চালান ও দুরূহ হয়ে পড়ছে। টেলিফোনের ব্যাপার নিয়ে অনেক পত্রপত্রিকায় লেখা লেখি হয়েছে ফল একই। অবশ্য 'ম্যানেজ' করতে পারলে কাজ পাওয়া যায় বলে কারো কারো ধারণা। অর্থাৎ সব বিষয়ই 'ম্যানেজ' করতে হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীল সরকার অনেক বড় বড় কথা বলে থাকেন। দেশীয় শিল্পের বিকাশ তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু শুধু কথা বলে আর শিল্প মেলা আর রপ্তানী মেলা বসিয়ে যদি একাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো আমাদের বলার কিছু ছিল না। আমরা দেখতে পাচিছ, দেশে শিল্প যতটুকু গড়ে উঠছে, তার চেয়ে বিদেশী পুঁজির আমদানী হচেছ অনেক বেশী। আমাদের দেশের সস্তা কাঁচামাল, সস্তা শ্রম

www.pathagar.com

শক্তি বেপরোয়া লুটে নেবার উদ্দেশ্যে বহুজাতীয় মালিকানার কর্পোরেশনগুলির এক মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ। আর আমাদের জাতীয়তাবাদী সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থ ও মুনাফা শিকারীদের গাইডের ভূমিকা পালন করছেন। সরকার বিদ্যুতের ও গ্যাসের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। এর ফল হয়েছে এই যে, দেশের ছোট বড় প্রায় ২৬ হাজার শিল্প ইউনিট বর্তমানে বন্ধ হবার পথে। বিদেশী পণ্যে দেশের বাজার ভর্তি হয় যাচ্ছে। সরকার এক দিকে জাতীয় শিল্পের বিকাশের কথা বলছেন অন্যদিকে বিদেশী আমদানীর পথ প্রশস্ত করার জন্য উদার আমদানী নীতি গ্রহণ করছেন। এই নীতি গ্রহণের ব্যাপারে সরকার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকেই রক্ষা করে চলেছেন। একই সঙ্গে বিদেশী পুঁজির স্বার্থরক্ষা আর জাতীয় শিল্পের বিকাশ কি ভাবে হতে পারে আমাদের বোধগম্য নয়।

এইরূপে গোলেমালে সরকার সময় কাটিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু জনগণের জিজ্ঞাসা এমন করে ক'দিন খাওয়া যাবে?

www.pathagar.com

জাতীয় ঐক্য—পটভূমি

ক্ষমতাসীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদত বরণ এদেশীয় রাজনীতির ইতিহাসের একটি দুঃখজনক পুনরাবৃত্তি। তবে তাঁর ক্ষমতায় আসা এবং যাওয়ার প্রাক্কালে আমরা ঘটমান বাস্তবতার এমন বৈশিষ্ট প্রত্যক্ষ করেছি যার সমান্তরাল দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই বললেই চলে। তাঁর ক্ষমতায় আসার মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণ বিরাজমান পারস্পরিক অবিশ্বাস, অনৈক্য আর বিদ্বেষতীক্ত পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে ইস্পাত কঠিন একতার বন্ধনে আবদ্ধ একটি দেশপ্রেমিক জাতিতে পরিনত হয়েছিল এবং তার আকস্মিক মৃত্যুর পরের মুহূর্তেই দেখা গেল সর্বত্র সেই ঐক্য, সংহতি ও দেশপ্রেম যা না থাকার একটি জাতির স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্বা বজায় থাকে না।

১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের পরি বর্তনগুলি এদেশের জনগণ সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে পারে নি। মরহুম শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর দল দেশে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন এনেছিল তা ছিল জনগণের আশা আকাঙ্খার সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৭২ এর সংবিধানকে তিন বছর গত না হতেই ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এমনভাবে পরিবর্তন করা হল যাতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বলতে আর কিছুই রইল না—সমুদয় ক্ষমতা ন্যাস্ত হল এক ব্যক্তির হাতে। সমুদয় রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ক্ষমতাসীনদের নেতৃত্বে গঠিত হল একটি মাত্র রাজনৈতিক দল—কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ-সংক্ষেপে বাকশাল। রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেন ক্ষমতাসীন বাকশালের চেয়ারম্যান। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বাকশালের যে গঠনতন্ত্র প্রকাশ করা হয়, দেখা গেল তাতে দলের কার্যনির্বাহী ও জাতীয় কমিটির সকল সদস্যের নির্বাচন, মনোনয়ন, নিযুক্তি, বহিস্কার, বরখাস্ত ও পুননিয়োগ সংক্রান্ত সমুদয় ধারা সংযোজিত

www.pathagar.com

হলেও দলের চেয়ারম্যানে নির্বাচন বা মনোনয়ন, বহিষ্কার বা পুনর্নিয়োগ এমন কি ক্ষমতাসীন চেয়ারম্যানের স্বাভাবিক বা অস্বাবিক মৃত্যুর পরেও নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। বাকশালের এই অভূতপূর্ব গঠনতন্ত্র সচেতন জনগণকে একেবারে হতবাক করে দিল। এর পর হতভম্ব জনগণ যখন বাকশালী রাজনীতির এই চরম ও মোক্ষম শ্লোগানটি শ্রবন করলো যে, 'এক নেতা এক দেশ বঙ্গ বন্ধু বাংলাদেশ' তখন তাদের চোখ থেকে মোহের শেষ পর্দাটা অপসারিত হতেও আর দেরী লাগলো না। এর পরের ইতিহাস সবাই জানেন। ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের অভ্যুত্থানের পর দৃশ্যতঃ যারা ক্ষমতায় এলেন তারা যদিও সবাই ছিলেন সাবেক ক্ষমতাসীন দলেরই লোক, তথাপি বাকশালী রাজনীতির আমূল বিরোধিতা করেই তাদের যাত্রা শুরু করতে হল। গণদাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হলে এ ছাড়া তাদের পথও ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এই পরিবর্তনকে বাকশালী রাজনীতির বৈদেশিক মুরুব্বীরা মোটেই সহ্য করতে পারছিল না। আগষ্টে অভ্যুত্থানের তিন মাস গত না হতেই বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এর নেতৃত্বে ৩রা নভেম্বর আর একটা পাল্টা অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট মোস্তাক অপসারিত হন। জিয়াকে বন্দী করা হয়। কিন্তু সচেতন দেশবাসী ও সেনাবাহিনীর সাধারণ জোয়ানেরা এই পরিবর্তনকে সমর্থন করতে পারে নি। ৩রা নভেম্বর থেকে ৬ই নভেম্বর ক্ষমতায় নানা টানা পড়নের মধ্য দিয়ে এই তিনটি দিন কাটাবার পর সেনাবাহিনীর সাধারণ জোয়ানদের বিদ্রোহের মুখে জিয়া মুক্ত হন। দেশের আপামর জনগণ সেনাবাহিনীর জোয়ানদের এই ভূমিকাকে বিপুল ভাবে সম্বধিত করে রাস্তায় নেমে আসে। জোয়ান ও জনতার সম্মেলনে ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর রচিত হয় একটি তুলনাহীন ইতিহাস।

জিয়াউর রহমানের ক্ষমতাসীন হবার প্রাক মুহূর্তটি ছিল ভারত বিরোধী আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ। তিনি নিজে কতটা রুশ-ভারত বিরোধী সেটা তেমন বিচার্য বিষয় ছিল না, জনগণ তাঁকে রুশ-ভারত বিরোধী স্বাধীন সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং দেখেও ছিলেন। পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্বের সংগ্রামে বাংলাদেশকে রুশ-ভারত যে সাহায্য করেছিল তার মূল্য কৃতজ্ঞতার পরিশোধ হয়নি। পাক বাহিনীর পতনের পর হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র

www.pathagar.com

শস্ত্র যানবাহন, কলকারখানার যন্ত্রপাতি, ঢাকা ও অন্যান্য শহরের বিভিন্ন সুপার মার্কেট থেকে লুট করা বিপুল পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী যখন ভারতীয় বাহিনী নিজের দেশে পাচার করে নিয়ে যাচ্ছিল তখনই এ দেশের জনগণ ভারতীয় 'সাহায্যের' আসল মোজেজা উপলব্ধি করতে পারে এবং প্রকৃত দেশ প্রেমিক জনগণের পক্ষে ভারতবিরোধী হয়ে উঠতে মুহূর্তকালও দেরী হয় না। কিন্তু এই একান্ত অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার পর দেশের জনগণকে আরো সাড়ে তিনটি বছর রুশ-ভারতের মিত্রদের দ্বারা শাসিত হতে হয় এবং সম্ভবতঃ এমন বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় যার সীমা নেই। একদা যে বাংলাদেশ ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল, ভারতীয় মৈত্রীর মূল্য চোকাতে গিয়ে বাংলাদেশকে তার সেই মর্যাদা শুধু হারাতে হয় তাই নয় অর্থনীতির প্রাণ ভোমরা পাট ও পাট শিল্পকে জাতীয় সম্প্রসারণবাদ সমূলে ধ্বংস করার চক্রান্ত প্রায় সাফল্যজনক ভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়। বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে গণতন্ত্র বিলোপের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিকেও এ ভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে তোলা হতে থাকে। এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও আঘাত হানা শুরু হয়। জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক মুহূর্তগুলি ছিল এই ধরনের ঘটনার পূর্ণ।

ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর পাঁচ বছরের শাসনকালের মধ্যে শোনা যায়, তাকে ১৭টি অভ্যুত্থান মোকাবিলা করতে হয়েছিল। এ অভ্যুত্থানের সবগুলিই ভারত পন্থী ছিল কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকলেও জনগণ ভারত পন্থী সামরিক অভ্যুত্থানের সকল প্রতিরোধকারী হিসেবেই জিয়াউর রহমানকে গণ্য করতো! এবং অষ্টাদশতম অভ্যুত্থানে যখন তাকে প্রাণ দিতে হল, তখন জনগণের বিপুল অংশের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হলো যে এ অভ্যুত্থানের নায়করাও ভারতপন্থী। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে জনৈক ক্যাপ্টেন অনন্ত অভ্যুত্থানের স্বপক্ষে প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জানা যায় এই অনন্ত ছিলেন সাবেক রক্ষী বাহিনীর একজন অফিসার। রক্ষী বাহিনীর জন্মের সঙ্গে ভারতীয় যোগসাজসের ঘটনা এদেশে খুবই প্রসিদ্ধ। মরহুম শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর অনুগত রাজনীতিকরা ছাড়া সকল বিরোধী দলীয় নেতাই রক্ষী বাহিনীর নেপথ্য জনক হিসেবে ভারতীয় সামরিক চক্রের নাম স্মরণ করেছেন। মরহুম জননেতা মওলানা ভাসানী সাবেক রক্ষীবাহিনীর জলপাই রংয়ের পোশাকের সঙ্গেই ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পোষাকের

www.pathagar.com

তাৎপর্যপূর্ণ সাদৃশ্যের উল্লেখ করে তৎকালীন ক্ষমতাসীন শেখ মুজিবকে ভারতীয় আগ্রাসনের বিষয়ে বহুবার সতর্ক করে দিয়েছেন। আগস্ট অভ্যুত্থানের পর রক্ষীবাহিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল ঘোষনা করা হয় এবং রক্ষীবাহিনীর সদস্যদেরকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হয়। মুজিব আমলে রক্ষীবাহিনী ছিল বিশেষ সুবিধা ও মর্যাদা ভোগকারী বাহিনী। নিয়মিত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সামিল হবার পরে স্বভাবতই তারা তাদের হৃতস্বর্গের কথা ভুলতে পারে নি। ৮১ এর ৩০শে মে'র অভ্যুত্থানের পর চট্টগ্রাম বেতারের দায়িত্বগ্রহণকারী সাবেক রক্ষীবাহিনী অফিসার ক্যাপটেন অনন্তের যোগাযোগকে অনেকে ভারতীয় যোগসাজসের প্রমাণ বলে অনুমান করে থাকেন। এ অনুমানের সঠিকতা অবশ্যই প্রমাণ সাপেক্ষ। তবে এ দেশের কতিপয় দায়িত্বশীল পত্র পত্রিকায় ক্যাপ্টেন অনন্ত নামের এই সাবেক রক্ষীবাহিনী অফিসারের ভারতে পালায়নের খবর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পত্র পত্রিকার মতামত কিংবা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনুমানের উপর নির্ভর না করেই এদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ জিয়ার হত্যাকাণ্ডকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি চক্রান্তের ফলশ্রুতি হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এবং জিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে যেমন সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে সম্ভাব্য বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল তাঁর হত্যাকাণ্ডের পরও দেখা গেল জাতি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার অভিন্ন অনুভূতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। রাজনৈতিক মঞ্চে জিয়ার আবির্ভাব এবং পাঁচ বছর ক্ষমতা পরিচালনার পর আকস্মিক তিরোধান দুটি ঘটনার সঙ্গেই স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে জাতির ঐক্যবদ্ধতা এমন একটি দুর্লভ ও তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা—পেশাদার রাজনীতিকদের কাছে যার কোন ব্যাখ্যা নেই।

'Collectively জনগণ ভুল করে না' এই আপ্তবাক্য সঠিক না বেঠিক আমরা তার বিচার করার দুঃসাহস দেখাতে চাইনে। বস্তুতঃ যে জিয়াকে বলতে গেলে কেউ চিনতো না জাতির এক আকস্মিক দুঃসময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক জোয়ানদের একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক স্লোগান—'আল্লাহু আকবর'—তাঁকেই জনগনের পুরোভাগে

www.pathagar.com

এনে দাঁড় করিয়েছিল। এই ঘটনার পারম্পর্য ব্যাখ্যায় অনেকে দর্শন-শাস্ত্রের 'কাকতালীয় ন্যায়' এর কথা বলেছেন, অনেকে এ ঘটনাকে 'বাঙ্গালের হুজুগ' বলে ঠোঁটের কোনে বঙ্কিম হেসেছেন, আমরা অত গভীর পানির মাছ নই—আমরা এই ভেবে আশ্বস্থ হয়েছি,—যেখানে দশজন আছে—ন্যায় সেখানেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

১৯৭৫-এর ৬ই নভেম্বরের দিবাগত রাতটির কথা বাংলার মুসলমানরা বিশেষ করে ঢাকা বাসী কোনদিন ভুলবে না। তিন দিন যাবত রেডিও বাংলাদেশ নীরব, কোন্‌টা সত্যি যাচাই করার কোন উপায় নেই। সন্ধ্যার দিকে ঢাকার আকাশে খান দুই জঙ্গী বিমান বার কয়েক টহল দিয়ে গেছে, রাত যত গভীর হচ্ছে বুকের উপর পাষানভার নেমে আসছে তত, এমনি করেই নিদ্রাহীন মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিছু জানা গেল না। শেষ রাত্রির দিকে সহসা খোলার খই কিংবা তুবড়ীবাজীর উপমাকে পরাস্ত করে আকাশ ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে শুরু করলো অজস্র গুলির আওয়াজ। নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মালো যে, যুদ্ধ লেগেছে। কিন্তু যুদ্ধ যদি লেগেই থাকে তবে কার সঙ্গে কার যুদ্ধ? অবিশ্রাম গুলির আওয়াজের মধ্য দিয়েই এক সময় সোবেহ সাদেক এসে গেল এবং মহল্লার দু'একটি মসজিদ থেকে ভেসে আসতে লাগলো আজানের সুর। এর পর উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পরমাশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে গেল মুহূর্তে। আজানের ধ্বনিকেও ছাপিয়ে উঠলো—আল্লাহু আকবর! নারায়ে তকবির—আল্লাহু আকবর!!

এক মুহূর্তে মানুষের মন থেকে সমুদয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভয়ভীতি উবে গেল—দলে দলে রাস্তায় নেমে এলো রুদ্ধশ্বাস জনতা। সেনাবাহিনীর জোয়ানদের সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে ধ্বনী তুললো—আল্লাহু আকবর! রুশ-ভারত চক্রান্ত ধ্বংস হোক! ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ নিপাত যাক! জোয়ান জনতার মৈত্রী—জিন্দাবাদ!

অনেকদিন পর জননেতা মওলানা ভাসানী এই দিনের ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "সমগ্র জাতি ইতিপূর্বে আর কোন দিনই এমন ইস্পাতকঠিন ঐক্যে আবদ্ধ হয়নি। কিন্তু সেই ইস্পাতকঠিন ঐক্যে ফাটল ধরতে মোটেই দেরী লাগলো না—এটাই আফসোস!"

www.pathagar.com

"তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলির ভাগ্যে সামরিক শাসন একটা ঐতিহাসিক নিয়তির মত। দুই ভাবে এটা কার্যকরী হতে দেখা যায়। যখন কোন বেসামরিক প্রশাসন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আঁতাত করে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে থাকে, দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে—তখনই সুবিধামত সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা দখল করে নেয়। আবার যখন কোন বেসামরিক গণতান্ত্রিক সরকার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশ গঠন করতে থাকে তখন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ সেনাবাহিনীর উচ্চাভিলাষী কোন জেনারেলকে দিয়ে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বেসামরিক গণতান্ত্রিক সরকারের স্থলে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় সরকার কায়েম করে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি। ১৯৭৫ এর ৭ই নভেম্বর একটি সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদী অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করে দিয়ে সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ ও জনগণ মিলে জেনারেল জিয়াকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার ব্যাপারে জিয়ার নিজস্ব ভূমিকা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয় বলেই বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা গ্রহণের পর জিয়া জাতীয় ঐক্যের সেই স্রোত ধারাকে রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর জীবদ্দশায় দেশে ৬০টির মত রাজনৈতিক দলকে রাজনীতি করার সনদ দেয়া হয়েছিল। নতুন নতুন দল গঠনের সেই উন্মাদ প্রক্রিয়ার মধ্যেই দেশের অনেকগুলি দল বহুধা বিভক্ত হয়ে যায় এবং জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরায়। বিস্মৃত প্রায় মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার আলবদর দ্বন্দ্ব দেশের বিভিন্নস্থানে সংঘর্ষ ও সংঘাতে রূপ নিতে শুরু করে। এ গুলিকে জাতীয় ঐক্য রক্ষায় জিয়ার ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য না করে উপায় নেই। সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদী চক্রান্তে জিয়া শাহাদাত বরণ করেছেন বলেই আজ সহানুভূতিবশতঃ তাঁর এ ব্যর্থতা অস্বীকার করলে ইতিহাসবিচ্যুতি ঘটবে। এই ব্যর্থতা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সব সার্থকতম পদক্ষেপকে অতিক্রম করে গেছে। জিয়াবিরোধী একজন সাংবাদিক নিহত জিয়াউর রহমানকে ভাগ্যবান বলে কটাক্ষ করেছেন। নিহত শেখ মুজিবর রহমান নাকি সেই তুলনায় ভাগ্যহীন। খুব স্তুতিবাদের মত শোনাবে, তবু বলতে হয় জিয়াউর রহমান বাস্তবিকই ভাগ্যবান, তার রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে জাতি সাম্রাজ্যবাদ ও

www.pathagar.com

আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং তাঁর আকস্মিক তিরোধানের পর জাতি আবার জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংকটে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। রাজনৈতিক মঞ্চে আগমন ও তিরোধান এই উভয় সময়েই জনতার ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হওয়া ভাগ্যের কথা বৈকি!

তবু আততায়ীর হাতে নিহত কোন ব্যক্তিকে ভাগ্যবান বলা এক ধরণের নিষ্ঠুরতাই। জিয়াউর রহমান যে ভাগ্য নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেলেন—সে ভাগ্য তাকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি। সেটা ভাগ্যের দোষ নয়। ভুলভাবে ব্যবহার করলে রাজার গোলাও এক সময় ফুরিয়ে যায়।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর অব্যবহিত পর দেশব্যাপী যে জাতীয় ঐক্যের সূচনা হয়েছিল—তাকে সর্বপ্রযত্নে ধরে রাখাটা যদিও জাতীয় কর্তব্য, তথাপি কোন মৃতব্যক্তির নাম ও স্মৃতিমাত্র সম্বল করে কোন জাতীয় ঐক্যই বেশী দিন ধরে রাখা যায় না—এই সত্যটাও আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতির আকস্মিক মৃত্যুর পর জাতিকে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার হুমকীর সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জাতি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক দুর্যোগ কেটে যাবার পর সেই ঐক্যকে ধরে রাখতে হলে কিংবা তাকে আরো বিকশিত করতে হলে জনগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যে আদর্শের উপস্থিতি দরকার তা কি সত্যিই আছে?

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় দরিদ্রতম দেশ। মাথাপিছু জাতীয় উপার্জনের গড় হল ৯০ ডলার। এর মধ্যে যেমন কোটিপতির হিসাব আছে তেমনিই আছে দিন মজুরেরও হিসাব। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোকের উপার্জন এতই কম যে, দারিদ্র্যের একেবারে সর্বনিম্ন স্তরে তাদের জীবন-যাপন করতে হয়। ক্ষমতাসীন বর্তমান শাসকরা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির (কৃষি ও শিল্প) যত পরিকল্পনাই গ্রহণ করুন সমাজের একাংশে ধন সঞ্চয় এবং অন্য অংশে দরিদ্রায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ করার কোন কার্যকর পদক্ষেপই গ্রহণ করতে পারেননি। সমাজের উপর তলায় যখন ভোগের সুধাপাত্র প্রাচুর্যে উপচে পড়ছে তখন অন্যখানে নিম্নতম পুষ্টির অভাবে রাতকানা হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার শিশু, ল্যাথরিজম নামক অপুষ্টিজনিত ব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে শত শত

www.pathagar.com

যুবক। শহরের সুপার মার্কেটগুলিতে রমজান মাসেও দেখা যাচ্ছে, রমজানের পবিত্রতা ক্ষুন্ন করে উপরতলার বাসিন্দা ললনারা ঈদের বাজার করতে বেরিয়ে নিজেদের ঐশ্বর্য আর দেহ লাবন্য প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। সমাজ বিজ্ঞানীরা জানেন, এই অবস্থা সমাজের একাংশে ভায়োলেন্সের জন্ম দেয় যা জাতীয় ঐক্যের পক্ষে ক্ষতি বয়ে আনে।

বস্তুতঃ পক্ষে, জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতার হাল যারা ধারণ করেছেন, জাতীয় ঐক্য রক্ষা ও তাকে বিকশিত করার জন্য তাদের কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। দশবছর আগে যে প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে—সেই দালাল আইনের প্রশ্নটি আবার তোলা হচ্ছে। ১৯৭৩ সালের ৩০শে নভেম্বর মরহুম শেখ মুজিবর রহমান দালাল আইনে অভিযুক্ত অথবা সাজাপ্রাপ্ত সকলকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় মুক্তিদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ক্ষমা ঘোষণার পর স্বাভাবিক ভাবেই মামলাগুলি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া হলেও বস্তুতঃ তা হয়নি। সেই ঝুলন্ত মামলাগুলি বর্তমানে ফের পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে। সরকারের এই পদক্ষেপের মধ্যে কোন সুবুদ্ধি আছে বলে মনে করা যায় না। কারণ এর দ্বারা জাতীয় কোন উপকারই সাধিত হবার আশা নেই। উপরন্তু জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবার সমূহ আশংকা আছে। এই ধরণের পদক্ষেপ ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা ছাড়া জাতীয় কোন ঐতিহাসিক প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। বর্তমান সরকারের ঐক্যবিরোধী পদক্ষেপের উদাহরণ, এ রকম আরো আছে।

একথা স্বতঃ সিদ্ধ যে, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগতভাবে জিয়ার অবদান কতটুকু আছে না আছে তার চুলচেরা বিচারের চেয়েও বর্তমান মুহূর্তের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, নিহত রাষ্ট্রপতির উপলক্ষে যে জাতীয় ঐক্য সূচিত হয়েছিল তা ধরে রাখা ও বিকশিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং মৃতব্যক্তির স্মৃতি চারণ করে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার হাস্যকর প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা। একথা আজ দিবালোকের মত সত্যি যে, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ইতিমধ্যেই একটি মিনি সুপার পাওয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বৃহৎ জাতিসুলভ দাম্ভিকতায় সে একের পর এক এমন কতকগুলি পদ-

www.pathagar.com

ক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাতে প্রতিবেশী দেশগুলির উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় নেই। প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক হিন্দুস্থান টাইমস্ এর সাবেক সম্পাদক মিঃ বি, জি, ভারগীজ সম্প্রতি বলেছেন, ভারতের অনুসৃত নীতি বাংলাদেশসহ সব প্রতিবেশী দেশকেই উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। নয়া দিল্লীর মেইন স্ট্রিম পত্রিকায় 'ব্যর্থ কূটনীতি' শিরোনামে প্রকাশিত এক নিবন্ধে মিঃ ভারগীজ ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের দঃ তালপট্টি দ্বীপ দখলের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। একথা ঠিক যে, ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয় আগ্রাসী নীতির সমালোচনা তাকে তার ক্রমবর্ধমান আগ্রাসী ভূমিকা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। ভারতীয় আগ্রাসনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলাই হবে একমাত্র উপায়। জিয়াউর রহমানের আকস্মিক ও অবাঞ্ছিত মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে যে জাতীয় ঐক্য সূচিত হয়েছিল আমাদের সর্বপ্রযত্নে তা রক্ষা ও তার বিকাশ সাধন করা উচিত। বর্তমান মুহূর্তে এটাই আমাদের সর্ব প্রধান জাতীয় কর্তব্য।

"দাকু নানা"
মইনুল ইস্‌লাম-এর স্মরণে

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—১

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশিম-এর ইংরেজী পুস্তক 'ইন্টিগ্রেসন' (১৯৬৭) এর আংশিক অনুবাদ

কেউ কেউ এ রকম ধারণা পোষণ করেন যে, এদেশ হলো মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ফসল। এডলফ হিটলার তাঁর মেইন ক্যাম্প বইয়ে লিখেছেন, "কোন নিদারুন মিথ্যা ও পৌনঃ পুনিক প্রচারের ফলে সত্যের মর্যাদা লাভ করে।" হিন্দুরা দাবী করেন, তাঁরা জাতীয়তাবাদী, আর মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক। অবিরত প্রচারের মাধ্যমে হিন্দুরা অনেককে এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল অন্যপক্ষে মুসলিম লীগ একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন। এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষনের মাধ্যমেই কেবল ধরা পড়বে উপরোক্ত দাবী প্রকৃত সত্যের সংগে কতটা সঙ্গতিবিহীন।

রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা জাতির সজ্ঞা নির্ধারন করেছেন দু'ভাবে। প্রথমতঃ জীবতাত্ত্বিক ভাবে, একটা নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী কিছু লোক এক ভাষা ও রক্ত ধারার একই উৎসের ভিত্তিতে জাতি হয়ে উঠতে পারে। ভৌগলিক অবস্থা, কমবেশী জীবন যাপন প্রনালী, অভ্যাস, প্রথা, ইতিহাস ও ঐহিত্য প্রভৃতি উপাদান গুলি সেখানে পালন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দ্বিতীয়তঃ আদর্শগত ভাবে কোন জনগোষ্ঠী জীবন জীবিকার সম্পর্কে একটা সাধারণ দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহণ করার মাধ্যমে রক্তের বন্ধন, ভাষা ও ভৌগলিক সীমারেখা অতিক্রম করে একটা জাতি গঠন করতে পারে। জীবতাত্ত্বিক ভাবে জার্মান, ফরাসী, মারাটা, পাঞ্জাবী, বৃটিশ প্রভৃতি হলো জাতি, অন্যপক্ষে ভাবাদর্শের ভিত্তিতে জাতি গঠনের নমুনা হিসাবে মুসলমান, কমিউনিষ্ট প্রভৃতির নাম করা যায়। আদর্শগত জাতি হলো একটা ভ্রাতৃত্ব যার ভিত্তি হলো একটা সাধারণ আদর্শবোধ। পবিত্র কোরানের ভাষায় যাকে বলা হয়েছে মিল্লাত। বৃটিশ ভারতের জনগণ যেমন, কি জীবতাত্ত্বিক কি ভাবাদর্শ কোন ভিত্তিতেই একটা জাতি ছিল না, ঠিক তেমনি বর্তমান ভারতের জনগণও একটি জাতি নয়। এই উপমহাদের কিংবা ভারতের জনগণের মধ্যে ভাষাগত ঐক্য নেই কিংবা রক্তের কোন সাধারণ উৎসও নেই। একটা সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক অবস্থার মধ্যেও তারা কোন দিন বাস করেনি। এমন কি তাদের জীবন জীবিকা সম্পর্কে কোন সাধারণ দৃষ্টি ভঙ্গিও নেই। কাজেই জীবতাত্ত্বিক বিবেচনায়, এই উপমহাদেশ হলো, বহু দেশের সমন্বয়ে গঠিত বহুজাতির এক আবাস ভূমি। মর্মবস্তুর দিক দিয়ে ভারত এবং ভারতীয় এই সংজ্ঞা ইউরোপ

www.pathagar.com

ও ইউরোপিয়ানেরই সামর্থক। আমরা যেমন একই সংগে দেখতে পাই, গাঙ্গেয় অববাহিকার পলি সমৃদ্ধ এক অতি উর্বর সমভূমি আর তুষারাবৃত হিমাচল কিংবা রাজস্থানের উষর মরু অঞ্চল আর দক্ষিনাবর্তের পাথুরে জনপদ, সংগে সংগে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে ভারতের বিচিত্র ইতিহাস যা' এক অবিশ্রাম গতিতে অঞ্চলে অঞ্চলে জাতিতে জাতিতে রক্তক্ষয়ী ক্লেদাক্ত যুদ্ধের ঘটনায় পূর্ণ। জীবতাত্বিক ভাবে না হলেও এই উপমহাদেশের মুসলমানরা আদর্শগতভাবে অবশ্যই একটি জাতি, কারণ একটা ভ্রাতৃত্ব বোধকে তারা সংগঠিত করতে সমর্থ হয়েছে—যার মৌলিক ভিত্তি হিসাবে রয়েছে একটি অভিন্ন আদর্থ ইসলাম। জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে মৌল সাতন্ত্র ও ভিন্নতার জন্য বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও ব্রাহ্মনেরাও আদর্শগত ভাবে এক একটি জাতি। সুতরাং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটা অবাস্তব আবেগের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ

'দি স্টেটস্‌ম্যান অব ইণ্ডিয়া বইয়ে রবার্ট বায়রন লিখেছেন, "মহারাষ্ট্র নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক ১৮৯৫ সালে তাঁর রায়গড় ভাষনে ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষনা করেছিলেন, এই উপমহাদেশের মুসলমান অধিবাসীরা হলো বিদেশী দখলদার, কাজেই তাদের শারীরিক ভাবেই নির্মূল করা দরকার।" তিলকের এই বক্তব্যের নৈতিক উৎস হলো,—মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ আর মহারাষ্ট্রীয় শিবাজী, এটাই হলো হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রকৃতরূপ। শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন বিশ্বাসীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হিন্দুরা ব্রাহ্মন্যবাদের অনুসারী। ১৯০০ সালে উপমহাদেশের হিন্দুরা ভারত মহামণ্ডল নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্মদেয় যার নেতা ছিলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা। ঐ একই বছরে দ্বারভাঙ্গার মহামান্য মহারাজ হাতে বেদ নিয়ে দিল্লীতে হিন্দু সম্প্রাদায়ের এক বিরাট মিছিহ পরিচালনা করেন। এই সংগঠনের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল বালগঙ্গাধর তিলকের রাজনৈতিক দর্শনেরই অনুগামী। মানবতা বিরোধী ভাবধারা প্রচারের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতিস্বরূপ তিলকের অনুসারীরা তাঁকে 'লোকমান্য' খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। এই হলো হিন্দুদের জাতীয়তাবাদ।

১৯০৬ সালে লাহোরের ৭ম অধিবেশনে ভারত মহামণ্ডল হিন্দু মহাসভা নাম গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য এই নাম পরিবর্তনের তাৎপর্য হলো, এর অন্তর্গত চেতনাকে আরো ভালভাবে প্রকাশিত করা। ১৯২৩ সালে হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা ডঃ মুনজে তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন—"যেমন ইংল্যাণ্ড ইংরেজ জাতির ফরাসী জাতীর যেমন ফ্রান্স আর জার্মানী জর্মান জাতির তেমনি ভারত বর্ষ হলো একমাত্র হিন্দুর। 'হিন্দুর জাতীয়তাবাদ হলো এই জিনিষ।'

o o o o o o o

www.pathagar.com

আবুল হাশিম ও জীবন দর্শন

সোনার চামচ মুখে নিয়ে যারা জন্ম গ্রহণ করেও সারা জীবন বঞ্চিত, লাঞ্ছিত জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ব্যাপৃত থেকে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দেন—মনীষী আবুল হাশিম ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম একজন।

১৯০৫ সালের ২৭শে জানুয়ারী শুক্রবার এই মনীষীর জন্ম হয় বর্ধমান জেলার এক সংস্কৃতিবান ও ধর্মানুরাগী মুসলিম পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন তদানীন্তন বঙ্গ দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর জননায়ক। নাম মৌলভী আবুল কাসেম। পিতামহ ও মাতামহ ছিলেন সহোদর ভাই। মাতামহ জ্যেষ্ঠ, নওয়াব আব্দুল জব্বার খাঁন বাহাদুর সি, আই, ই—ছিলেন প্রথমে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পরে অবসর গ্রহণ করে ইনি ভূপালের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পিতামহ মৌলভী আব্দুল মজিদ ছিলেন কনিষ্ঠ। ইনি ছিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একজন প্রথম শ্রেণীর অফিসার। আবুল হাশিমের পিতামহ খাঁন বাহাদুর গোলাম আসগর ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একজন সাবজজ।

ছয় বছর বয়সে আবুল হাশিম মাতৃহারা হন। লালিত-পালিত হয়েছিলেন নিঃসন্তান তাঁর এক খালাজানের কাছে। ছাত্র জীবনে অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। ছোট বেলায় আবুল হাশিম যে গৃহ শিক্ষকের কাছে জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন—তিনি ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার একজন জবরদস্ত আলেম। নাম মৌলভী গিয়াস উদ্দিন। তাঁর কাছেই তিনি অধ্যয়ন করেন পবিত্র আল-কোরান এবং গ্রহণ করেন কিভাবে সালাত কায়েম করতে হয় তার শিক্ষা। পরবর্ত্তী জীবনে ইসলামের গতানুগতিক ধর্মচর্চার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তিনি যে ইসলামের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যাকার হিসাবে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা অর্জন করবেন তার সূচনা হয়েছিল তাঁর গৃহ শিক্ষক মৌলভী গিয়াস উদ্দিনের হাতেই। ইনি ছিলেন তৎকালীন ভারতের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা আশরাফ আলী থানভীর ছাত্র।

www.pathagar.com

সাত বছর বয়সে আবুল হাশিমকে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়। আবুল হাশিমের পিতা বর্ধমানে মুসলিম ছাত্রদের জন্য একটা ছাত্রাবাস স্থাপন করেন এবং অন্যান্য ছাত্রদের অনুপ্রাণীত করার জন্য নিজের ছেলেকে রাখেন ঐ ছাত্রাবাসে। এখানে তিনি ইংরেজী ও আরবী ভাষা খুব ভালভাবে অধ্যয়ন করার এক চমৎকার সুযোগ লাভ করেন। ঐ ছাত্রাবাসের সুপারেনটেনডেন্ট মৌলভী আবুল কাসেম ছিলেন আরবী ও ইংরেজী ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান সম্পন্ন। তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে আবুল হাশিমকে খুব ভালবাসতেন। ১৯২৩ সালে আবুল হাশিম ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। এর পর তাঁকে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি বর্ধমানে ফিরে আসেন এবং বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি মাহমুদা আক্তার মেহের বানুর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই মহিলা ছিলেন বিখ্যাত তাপস শাহ্ গোলাম আলীর বংশধর শাহ সৈয়দ জিয়া উদ্দিনের কন্যা। মাহমুদা আক্তার বানু ছিলেন আরবী ভাষা ও ইসলামী দর্শনের সুপণ্ডিত মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ ওবেদীর নাত্নী। মওলানা ওবায়দুল্লাহ ওবেদীর তিন পুত্র, ডঃ আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, লেঃ কর্ণেল হাসান সোহরাওয়ার্দী এবং অধ্যাপক আমিন সোহরাওয়ার্দী উপমহাদেশের সর্বত্র পরিচিত এবং এক কন্যা খোদেজা আক্তার বানু ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতি-বিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাতা। মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ ওবেদী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন মেদিনীপুরে। কিন্তু তাঁর কর্মস্থল ছিলো ঢাকায়। ঢাকাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ঢাকার লালবাগে তাঁর মাজার রয়েছে।

বিবাহের পর আবুল হাশিম আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, ও আইন অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৯৩১ সালে ডিগ্রী লাভের পর বর্ধমান বার-এ যোগদান করেন। তাঁর সিনিয়র ছিলেন প্রখ্যাত আইনবিদ মৌলভী গোলাম মুর্তজা। আইন ব্যবসা শুরু করার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আবুল হাশিমের পক্ষে সম্ভবতঃ এর কোন অন্যথা ছিল না। তিনি আইন ব্যবসায়ী হিসাবে অল্প কালের মধ্যেই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। জীবনের সার্থকতা তিনি এর মধ্যেই অন্বেষণ করতে পারতেন কিম্বা বৃটিশ ভারতের যে কোন সরকারী উচ্চপদ গ্রহণ করে সুখী জীবন যাপন করতে পারতেন

www.pathagar.com

কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের অবহেলিত অবস্থা তাঁকে আত্ম সুখে মগ্ন থাকতে দেয়নি। তিরিশের দশক ছিলো ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এক কঠিন সংকটকাল। বিশ্বব্যাপী চলছিল সাংঘাতিক বাণিজ্যিক মন্দা। ভারতের বৃটিশ সরকারকে ইউরোপে এবং অন্যত্র বিভিন্ন ঔপনিবেশে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাতে হচ্ছিল। ইউরোপে জার্মানী ছিল বৃটিশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি। জার্মানীর কোন উপনিবেশ ছিল না। বিশ্বের উপনিবেশ-বাদী ভোজ সভায় জার্মানী দেখলো সে অনাহুত। এখানে আসন পেতে হলে তাকে গায়ের জোরে উপনিবেশ দখল করতে হবে। জার্মানী শিল্পে ছিল অতিশয় উন্নত কিন্তু তার বাজার নেই। কাঁচা মালের উৎসগুলি সব আগে থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ দখল করে বসে আছে। কাজেই তার বাজার চাই, আর চাই কাঁচামালের যোগানদার উপনিবেশ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংকটে এ ভাবে রাজনৈতিক সংকটে রূপলাভ করছিল। সে সংকটের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে এসে পড়েছিল ভারতে। এই তিরিশের দশকে ভারতে বৃটিশ উপনিবেশবাদ উৎখাতের দুই ধরণের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। এক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, দুই, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। যুবক আবুল হাশিম সন্ত্রাসবাদের প্রতি যথেষ্ট দুর্বলতা অনুভব করেও নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়েন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন সন্ত্রাসবাদের পথে ভারতীয় মুসলমানের মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে না। ১৯৩৬ সালে আবুল হাশিমের পিতা ইন্তেকাল করেন। বর্ধমানবাসী তাঁর পিতার আজীবন সমাজ সেবার প্রতিদানে আবুল হাশিমকে ম্যাকডোলাণ্ড এওয়ার্ডের আওতায় প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত করেন ১৯৩৭ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন।

১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য হিসাবে তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন—আইন ব্যবসা এবং রাজনীতি এই দুই কাজ একই সঙ্গে করতে গেলে দু'টার কোনটিই ভালভাবে করা যাবেনা। কেননা কাজ দু'টি সার্বক্ষনিক মনোযোগ দাবী করে। যদিও অনেক আইন ব্যবসায়ী আইন ব্যবসা ও রাজনীতি দু'টো বৃত্তি এক সঙ্গে চালিয়ে দু'টি ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন এবং আবুল হাশিমের চোখের সামনে এ

www.pathagar.com

রকম দৃষ্টান্তের কোন অভাব ছিলনা যে, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বহু আইনবিদ দেশে রাজনীতির মৌসুমে অর্থাৎ নির্বাচন কালে কাঁধের সামলা খুলে রেখে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, নির্বাচনে জয়লাভ করে আইন সভার সদস্য হয়েছেন, কেউ ভাগ্যের জোরে মন্ত্রী, শেষে মন্ত্রীত্ব চলে গেলে আবার ফিরে এসেছেন আদালতের বটতলায়। কিন্তু আবুল হাশিম রাজনীতির এই এ্যামেচারিজ্‌মে বিশ্বাসী ছিলেন না। আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে তিনি সার্বক্ষনিক রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়-গুলো তিনি সার্বক্ষনিক রাজনৈতিক কর্মতৎপতার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত করেন।

আবুল হাশিম আজীবন রাজনীতি করেছেন কিন্ত সবাই জানেন তিনি ক্ষমতার রাজনীতি কখনও করেননি। আবুল হাশিমের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও মনমনীষার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাঁরা আরও জানেন, রাজনীতি তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য ছিলনা, রাজনীতি ছিল তাঁর লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার। যেহেতু তাঁর বিশ্বাস ছিল মানব জাতির সাংস্কৃতিক ও আত্মিক চরমোৎকর্ষ রাজনীতির মধ্যেই কেবল অভিব্যক্ত হতে পারে এবং রাজ-নৈতিক ক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত কোন জাতি বৈষয়িক ও আত্মিক কোন দিকেই বিকাশ লাভ করতে পারেনা, কাজেই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ না থাকা সত্বেও তিনি রাজনীতিকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন।

১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য তরুণ আবুল হাশিম আরও উপলব্ধি করেন, বৃটিশ পদ্ধতির এই পার্লামেন্ট জনগনের জীবনের নানা-মুখী সমস্যা নিয়ে যত তর্ক-বিতর্ক করে সমাধান খুঁজে পায়, সেই তুল-নায় খুবই সামান্য। বঞ্চিত মানুষের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের বাষ্প জন প্রতিনিধিদের তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে অনেক বেরিয়ে যায়—বিস্ফোরনের অবকাশ প্রায় থাকেনা। পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবেই তিনি উপলব্ধি করেন—এ পার্লামেন্ট সার্বভৌম নয়। সার্বভৌম পার্লামেন্ট ছাড়া পার্লা-মেন্টের গৌরবই বা কি। তিনি বৃটিশ ভারতের অধীনে যতদিন পার্লা-মেন্ট সদস্য ছিলেন ততদিন এ কথা ভোলেননি।

১৯৪১ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী কমি-টির সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে এই কমিটির

www.pathagar.com

সাধারণ সম্পাদকের পদ লাভ করেন। পাকিস্তান আন্দোলনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যদিও মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমী পাকিস্তান দাবীর বার্তা বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি যে পরিশ্রম করেন তার কোন তুলনা নেই। তথাপি বাংলা বিভাগের জন্য তিনি প্রাথমিকভাবে দায়ী ছিলেন না। শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে মিলিত ভাবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের (যুক্ত বাংলার) জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। এই দাবীর ভিত্তিতে (দেশব্যাপী) আন্দোলনও সংগঠিত হয়েছিল, কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসী নেতাদের অসহযোগীতা ও প্রতিরোধের ফলে ঐ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।

১৯৪০ সালে লাহোর অধিবেশনে মুসলিমলীগ উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বাসভূমির দাবী নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করে।

যেহেতু বৃটিশ শাসিত ভারত একটি দেশ নয়, একটি উপমহাদেশ; যেহেতু বৃটিশ ভারতের জনগণ জীবতাত্ত্বিকভাবে কিম্বা আদর্শগতভাবে একটি মাত্র জাতি নয়, অপরপক্ষে বৃটিশ ভারতের মুসলমানরা আদর্শগতভাবে একটি জাতি এবং ইতিমধ্যে বিশ্বের সকলেই জানে যে, উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশগুলিকে অবশ্যই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হতে হবে; যেখানে মুসলমানরা ইসলামের মৌল আদর্শের ভিত্তিতে জীবন গঠন করতে পারবে, এই ছিল লাহোর প্রস্তাবের পশ্চাতে রাজনৈতিক দর্শন।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ কিম্বা জীবতাত্ত্বিকভাবে গঠিত জাতিগুলিকে ভাগ করে ফেলা মুসলিম লীগের দাবী ছিলনা। মুসলিমলীগ কখনো বাংলা বিভাগ চায়নি কিম্বা বাঙ্গালীদের বিভক্তি দাবী করেনি। পাঞ্জাব বা পাঞ্জাবীদের, কাশ্মীর বা কাশ্মীরীদের বিভক্তিও দাবী করেনি। দেশ এবং জীবতাত্ত্বিক জাতিগুলির বিভক্তির জন্য মুসলিমলীগ দায়ী নয়, তার জন্য কট্টর হিন্দু সম্প্রদায়িকতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে কংগ্রেসই দায়ী।

১৯৪৬-এর মার্চে বৃটিশ কেবিনেট মিশন আসে ভারতে। এই মিশনে ছিলেন লর্ড প্যাথিক লরেঞ্জ, সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস, প্রেসিডেন্ট অব দি বোর্ড অব ট্রেড এবং মিঃ এ, ভি, আলেকজাণ্ডার ফার্ষ্ট লর্ড অব দি এডমিরালটি। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আদর্শগত দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে কি ভাবে একটা সমন্বয়ের সূত্র বের

www.pathagar.com

করা যায় তা-ই ছিল এই মিশনের লক্ষ্য। উপমহাদেশের দেশগুলিকে মিশন একটি ফেডারেল সরকারের অধীনে তিনটি স্বায়ত্ব শাষিত অঞ্চলে ভাগ করার সুপারিশ করে। এই হলো কেবিনেট মিশন প্লান। মুসলিম-লীগ ও কংগ্রেস, কেবিনেট মিশনের এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে, লাহোর প্রস্তাবের আদর্শগত বিষয়বস্তু উপেক্ষা না করেও দেশ বিভাগের সমস্যা এড়ানো সম্ভব হতো। দুর্ভাগ্য-বশতঃ চূড়ান্ত এই ক্রান্তিকালে মওলানা আবুল কালাম আজাদের উত্তরসূরী হিসাবে এলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। নেহেরু কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েই এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেস কেবিনেট মিশন প্লান মেনে নিতে বাধ্য নয় বরং তারা ইচ্ছামত উপমহাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা করতে পারেন। এই হলো কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ। এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া ছিল অব-ধারিত। মুসলিমলীগ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ফিরে গেল। সুতরাং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মুসলিমলীগ নয়, হিন্দু কংগ্রেসই ভারত বিভাগের জন্য দায়ী।

কেবিনেট মিশন প্লান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। লর্ড ওয়াভেলকে ফিরিয়ে নেয়া হলো। ভাইসরয় করে পাঠানো হলো লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে। বৈঠকের পর বৈঠক চলতে লাগল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। অবশেষে তিনি একটি চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রনয়ণ করলেন যা ৩রা জুন ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ উভয়েই গ্রহণ করলো। মাউন্ট ব্যাটেনের এই পরিকল্পনায় একটি ব্যবস্থা থাকলো যে, বাংলার প্রাদেশিক আইন সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তারা ভারতের সঙ্গে বা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে এবং বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্তও নিতে পারবে। এটা ছিলো একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে এই পরিকল্পনায় যে অদ্ভুত বিষয় সুপারিশ করা হয়েছিল তা থেকেই। পাকিস্তান বা ভারত কার সঙ্গে যোগ দিবে তা নিয়ে আইন সভার উভয় হাউসের যৌথ অধিবেশন বসে। মুসলিমলীগ উভয় হাউসের সংখ্যা গরিষ্ঠ থাকায় যুক্ত অধিবেশনে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর পূর্ব বাংলার জেলা সমূহের সদস্যরা আলাদাভাবে বৈঠক করলেন তারা যুক্ত বাংলা মেনে নেবে, না প্রদেশটাকে বিভক্ত করবে, তা নির্ণয় করার জন্য সংসদে পূর্ববঙ্গ গ্রুপের মুসলিমলীগ সদস্যরা মুসলিম

www.pathagar.com

লীগের রায় অনুযায়ী বাংলা বিভাগের বিরোধীতা করেন এবং এই হাউসে মুসলমানরা সংখ্যা গরিষ্ঠ থাকায় তাদের সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। এরপর পশ্চিম বাংলার সংসদ সদস্যগণ আলাদাভাবে অধিবেশনে বসেন, অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। এই নির্বাচনেও মুসলীমলীগ সংসদ সদস্যগণ মুসলিমলীগের মূল রায় অনুসারে বাংলা বিভাগের বিরোধীতা করেন। কিন্তু এই হাউসে হিন্দু সদস্যগণ সংখ্যাগুরু থাকায় তারা বাংলা বিভাগের পক্ষে ভোট দেন। পূর্ব বাংলা গ্রুপের সংসদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন মিঃ নূরুল আমিন এবং পশ্চিম বঙ্গ গ্রুপের অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মাহতাব। এই একই পদ্ধতি অনুসৃত হয় পাঞ্জাবেও। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, কংগ্রেসের মূল সিদ্ধান্তের প্রতি অনুগত হয়েই মুসলমানরা নয়, হিন্দুরাই কট্টর সাম্প্রদায়িকতার ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাবের অঙ্গচ্ছেদ করার জন্য দায়ী। ইহা ছিল বৃটিশ গণতন্ত্রের রূপরেখা ও মাউন্ট ব্যাটেনের কট্টর মুসলিম বিদ্বেষের মনোভাব।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও আবুল হাশিম ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গেই থেকে যান এবং পশ্চিম বঙ্গের বিধান সভায় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পূর্ব বাংলার রিফিউজিরা তাঁর বর্ধমানের বাড়ীতে আগুন দিলে তিনি পশ্চিম বাংলা ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে আসেন এবং ঢাকাতে বসবাস করতে শুরু করেন।

দেশ বিভাগের পর তিনি যতদিন ভারতে বাস করেছিলেন ততদিন তাঁর মনের মধ্যে একটা কথা ছিল এই যে, তিনি ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করবেন। যদিও তাঁর রাজনৈতিক দর্শন বাস্তবায়নের পক্ষে ভারতে তখন উপযুক্ত স্থান ছিল না। তথাপি তিনি জীবন বিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত ভারত ত্যাগ করেননি। পাকিস্তান ছিল উপমহাদেশের মুসলিম জনগনের স্বপ্নের দেশ। আবুল হাশিম ছিলেন পাকিস্তানের স্বপ্ন দ্রষ্টাদেরই একজন। তিনি এদেশে এসে দেশটাকে তাঁর স্বপ্নের অনুকূলে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং এটা করতে গিয়েই পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকদের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাধে। বলা বাহুল্য আবুল হাশিমের সঙ্গে পাকিস্তানের শাসকদের সংঘাত

www.pathagar.com

কোন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ছিল না। কারণ আবুল হাশিম ছিলেন আদর্শ-বাদী এবং আদর্শ বাস্তবায়ন ব্যাতিত তাঁর কোন রাজ রাজনৈতিক উচ্চা-কাঙ্খা ছিল না। অন্যপক্ষে পাকিস্তানী শাসকদের কাছে আদর্শের প্রশ্নটা ছিল রাজনৈতিক শ্লোগান এবং অনেক গৌণ। ইসলামকে সামনে রেখে শাসকরা হয়ে পড়েছিল বস্তুবাদী আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নীতিহীন।

রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নে তৎকালীন মুসলিমলীগ শাসকদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ প্রত্যক্ষরূপ পরিগ্রহ করে। উপমহাদেশের রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও দার্শনিক (মরহুম) আবুল হাশিম বিষয়টা নিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উজীরে আলার সাথে অনেক আলোচনা করেছিলেন। চীপ সেক্রেটারী জনাব আজিজ আহমদের সঙ্গেও বিষয়টা নিয়ে মত বিনিময় হয়েছিল অনেক। তাঁরা কথা দিয়েছিলেন বিষয়টা কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে এবং সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন—কিন্তু রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারীই এর প্রমাণ যে, কেন্দ্র কোন বিবেচনা করেনি। তথা-কথিত সহানুভূতিতো দূরের কথা পাকিস্তানকে নিয়ে যে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত সে সময় সক্রিয় ছিল সেই চক্রান্তের ফাঁদে সে পাঁ দিল জ্ঞাত সারেই, কিম্বা বলা যায়, ২১শে ফেব্রুয়ারী সংঘঠিত করে সেই চক্রান্তকেই সে তার সম্ভাব্য পরিণতির দিকে নিয়ে গেল। এটা অবশ্যই স্মরণ করা দরকার যে, তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কার্যকরী নেতৃত্ব ছিল আহমদিয়া সম্প্রদায়ের হাতে, আর তারা ছিল আন্তর্জাতিক ইহুদী চক্রের এক ছদ্মবেশী শাখা। অতঃপর ভাষা আন্দোলন স্পষ্টভাবেই রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হলো এবং পরিণতি লাভ করলো—'৭১-এ এসে। এই সময় (১৯৫২-ফেব্রুয়ারী) তিনি "স্টেট ল্যাংগুয়েজ কমিটি অব এ্যাকশন"-এর সভাপতি ও সদস্য মনোনীত হন এবং তাঁর সভাপতিত্বে ১৯৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা জেলা পরিষদে। এই ঘটনায় মুসলিমলীগ গভর্ণমেন্ট তাঁকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী গোপীবাগ বাস ভবন থেকে (ভাড়া বাড়ী) গ্রেফতার করে এবং প্রায় ষোলমাস কারা-গারে আটক করে রাখেন। পরবর্তীকালে তিনি খেলাফতে রববানী পার্টির চেয়ারম্যান হন। সে সময় বিখ্যাত কথা শিল্পী অধ্যাপক শাহেদ আলী, অধ্যাপক আঃ গফুর, অধ্যাপক দেওয়ান মঃ আজরফ, অধ্যাপক দীন মোহাম্মদ, সানা উল্লাহ্ নূরী, আবুল কাশেমও দলের সক্রিয় সদস্য

www.pathagar.com

ছিলেন। ১৯৫৬ সালে আবার তিনি মুসলিমলীগে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৬০ সালে ঢাকা ইসলামিক একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হন। ইসলামিক একাডেমীর দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে একটি পূর্ব কথা আছে। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে জেনারেল আইয়ুব খাঁ ক্ষমতাসীন হন এবং বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে জনাব মঞ্জুর কাদিরকে নিযুক্ত করেন। মঞ্জুর কাদির দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির উপর কিছু বক্তব্য প্রচার করেন। তাঁর বক্তব্য থেকে এই ধারণা পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে, পাকিস্তান একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। (মরহুম) আবুল হাশিম এই বিষয়টা নিয়ে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেন। তদনুযায়ী ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে তিনি করাচী যান এবং বহু চেষ্টার পর (মরহুম) হাবিবুর রহমানের (বগুড়ার) সাহায্যে জেনারেল আইয়ুবের সাথে একটা সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। এ সাক্ষাতকারের জন্য প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সময় বরাদ্দ করেন মাত্র পনের মিনিট। যথা সময়ে (মরহুম) আবুল হাশিম একজন সহকারীকে (লেখককে) সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন। কামরায় ঢুকেই আবুল হাশিম বললেন "আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।" আইয়ুব খাঁ সাহেব সালামের জবাব দিলেন খুব আস্তে করে এবং হাতে ইশারা করে বসতে বললেন। লেখক আবুল হাশিমকে বসাতে যাচ্ছেন এমন সময় তিনি না বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আইয়ুব খাঁর উদ্দেশ্যে বললেন—"আপনার সঙ্গে বাহ্যতঃ আমার কোন মিল নাই, আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ—আহার-বিহার সবই আলাদা কিন্তু একটা জায়গায় আমাদের মিল আছে—আপনি আমার সালামের জবাবে—"ওয়ালেকুম আস্‌সালাম বলেছেন এবং এখানেই আমরা একাত্ম।" এতক্ষণ আইয়ুব খাঁ সাহেব কপাল কুঁচকে বসে বসে শুনছিলেন—হাশিম সাহেবের শেষ উক্তিটির সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে এসে কোলাকুলি করে তাঁকে নিয়ে নিজেই কুরসীতে বসালেন। পূর্বেই বলেছি সাক্ষাতকারের জন্য সময় নির্ধারিত ছিল পনের মিনিট কিন্তু এ সাক্ষাতকার শেষ হতে তিন ঘন্টারও বেশী সময় লেগেছিল। এই ঐতিহাসিক সাক্ষাতকারই ছিল ঢাকা ইসলামিক একাডেমী প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। [বর্তমান ইসলামিক ফাউণ্ডেশন] (মরহুম) আবুল হাশিম জেনারেল আইয়ুবকে বুঝাতে সমর্থ

www.pathagar.com

হন যেঁ, বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) তরুণ সমাজ ইসলামিক মূল্যবোধ ও তাহজীব তামুদ্দুন ভুলে বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা ও ভ্রান্ত মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়ে ধ্বংশের পথে ধাবিত হচ্ছে। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার যা ইসলামের বিশ্ব-জনীন ধ্যান-ধারণা প্রচারে একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৯৬০ সালের ২৮শে নভেম্বর (মরহুম) আবুল হাশিম ইসলামিক একাডেমীর প্রথম পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেই দেশের তরুণ সমাজকে ইসলামের বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণায় অনুপ্রাণীত হবার আহবান জানান।

ইসলামিক একাডেমী সাপ্তাহিক ও মাসিক সিম্পোজিয়মের আয়োজন করে। ১৩/১/১৯৬১ তারিখে দেশের অগ্রণী বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে তিনি এক চা চক্রে মিলিত হন এবং ২৬/১/৬১ তারিখে কার্জন হলে "বর্তমান বিশ্বে ইসলামিক জীবন ব্যবস্থা" বিষয়ে একটি সিম্পোজিয়ামে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এই সমাবেশে ডঃ সাজ্জাদ হোসেন, ডঃ সিরাজুল হক, জনাব শামসুল হক প্রমুখ ভাষণ দেন।

(মরহুম) আবুল হাশিম ইসলামিক একাডেমীর পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকেই দেশে পবিত্র কোরআনের নির্ভরযোগ্য অনুবাদের অভাব অনুভব করতে থাকেন এবং তাঁর ধারণা হয় ইসলামিক একাডেমীর পক্ষ থেকেই এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। এরপর তিনি জনাব আকরম খাঁ, ডঃ শহীদুল্লা, জনাব মোঃ আব্দুর রহমান, মওলানা ফজলুল করীম, ডঃ সিরাজুল হক প্রমুখ ইসলামী চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ এবং একটা ট্রান্সলেশন বোর্ড গঠন করেন। তিনি এই বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হন। অনুবাদের কাজ কিছুদুর অগ্রসর হবার পর তিনি উপলব্ধি করেন, আরবী ভাষার উপর পান্ডিত্ব ছাড়া এ কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তিনি অতঃপর মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষাবিদ ওস্তাদ সাবান সাহেবকে মিশর সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে এদেশে আনার ব্যবস্থা করেন এবং নিজের আরবী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এ সময় অনুবাদের কাজ প্রায় বন্ধ থাকে। (মরহুম) আবুল হাশিম দু' বছরের একান্ত পরিশ্রমে আরবী ভাষায় প্রয়োজনীয় বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং

www.pathagar.com

আরবী ভাষায় একটা ব্যাকরণ ভিত্তিক বই "Arabic Made Easy" রচনা করেন। অনেকেরই জানা আছে ১৯৪৩/৪৪ সালে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন কিন্তু কোন কাজে তিনি কখনও পশ্চাদপদ হননি। জীবদ্দশায় তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ আল-কোরআনের অনুবাদ মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সম্পন্ন করতে সমর্থ হন। ইসলামিক একাডেমী পত্রিকারও তিনি প্রধান সম্পাদক ছিলেন।

ইসলামিক একাডেমীতে বৃদ্ধ বয়সে তিনি যেসব বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেন এর জন্য শুধু তাঁর অনুরাগী ভক্তজনরাই নয় দেশের যে কোন মুসলমানই গৌরব বোধ করেন।

ইসলামিক আইনের মূল বৈশিষ্ট বজায় রেখে দেশের প্রচলিত আইনের সংস্কার কিভাবে করা যায় তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি ১৯৬২ সালে ইসলামিক আইডিওলজি কাউন্সিলেরও সদস্য নিযুক্ত হন। পূর্বে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে পিতামহের মৃত্যুর পূর্বে কাহারও পিতা মারা গেলে সে তার পিতামহের সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হত। মনীষী আবুল হাশিম ইসলামের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিবেচনায় এই আর্থ সামাজিক আইনটির প্রয়োজনীয় সংস্কারে খসড়া সুপারিশ করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে এই মর্মে আইনটি পাশ হয়। ১৯৬২ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম-লীগের প্রধান সংগঠক হিসাবে লীগের রাজনীতিতে ফিরে আসেন। কিন্তু মুসলিমলীগকে পাকিস্তানে ইসলামিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে আর সমর্থ হয়নি। এই মনোবেদনা তাঁর মধ্যে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল। ১৯৭১ সালে মুসলিমলীগের রাজনৈতিক বিপর্যয়কে তিনি কেবল অবলোকন করেন নিষ্ক্রীয়ভাবে।

১৯৭৪ সালের ৫ই অক্টোবর বিকালে এই মনীষী তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা জুরাইন কবর স্থানে তাঁর মাজার—(৮২ নং কবর)।

২

আবুল হাশিম তাঁর জীবদ্দশায় পাকিস্তানকে দেখেছিলেন আদর্শ বাস্তবায়নের প্রাথমিক ক্ষেত্ররূপে। পৃথিবীতে মুসলিম রাষ্ট্র ছিল অনেক কিন্তু কেবলমাত্র আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত কোন মুসলিম রাষ্ট্র ছিল না—পাকিস্তান ছাড়া। প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক মতবাদ হিসাবে ইসলামের আর কোন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করার সম্ভাবনা নেই বলে

www.pathagar.com

আধুনিক বিশ্বের যে ধারণা গড়ে উঠেছে তার জবাব দিতে চেয়েছিলেন আবুল হাশিম। তিনি বিশ্বাস করতেন যারা ইসলামকে একটি গতিশীল আদর্শ বলে স্বীকার করে না তাদের মুখের উপর জবাব দেয়ার দায়িত্ব কাউকে না কাউকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং এর জন্য তিনি নিজেকে গড়ে তুলতে শুরু করেন বলতে গেলে তরুণ বয়স থেকেই। বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হতে থাকে যে, মদীনায় ইসলামের যে প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক ভূমিকা দেখা গেছে, আধুনিক যুগে তার সম্ভাবনা অবসান হয়নি। বরং মদীনার প্রদর্শনীমূলক স্তর পার হয়ে ইসলাম সত্যিকার বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছে, বর্তমানে এবং অনাগত দিনে তার সম্ভাবনা যেমন অসীম-তেমনি মহৎ! ইসলাম সম্পর্কে তাঁর এই চিন্তা ও বিশ্বাসকে তিনি শুধু গ্রন্থাকারে সূত্রবদ্ধ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে তা বাস্তবায়িত করার প্রয়াসও পেয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি সফল হতে পারেননি। জানি না মহান আল্লাহ তাঁকে সে সাফল্য কেন দেননি, তবে যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না।

মদীনায় ইসলাম যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিল সেই হৃত গৌবর পুনরুদ্ধার করতে হবে এই সাধারণ ও গতানুগতিক চিন্তার সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, মদীনার পেক্ষাপটে ইসলামের অর্জিত গৌরবময় বিজয়ের স্তরে ফিরে যাবার চিন্তাটা পশ্চাৎমুখী চিন্তা। এটা ঐতিহাসিকরূপে স্মরণ করতে হবে। ইসলামের অতুল সম্ভাবনাময় সৃষ্টিশীলতার মধ্যে এই পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তার কোন অবকাশ নেই। আবুল হাশিমের রচিত "ইসলামের মর্ম কথা" (Creed of Islam) গ্রন্থের ভূমিকায় মওলানা আজাদ সুবহানী লিখেছেন, "আধুনিক ধনতন্ত্রের কদর্য পট ভূমিকায় নিরিশ্বরবাদী বস্তুতন্ত্র মানুষের পরিচ্ছন্ন চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছে এবং তার ফলে সেটিই (নিরিশ্বরবাদী বস্তুতন্ত্র) আজকাল স্বীকৃত হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তববাদ বলে।" ভূমিকার পৃষ্ঠা—৩, আধুনিক যুগের ধনবাদী সমাজ একটি বাস্তব সত্য। এ সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট হলো শোষণ। মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ। ধনবাদী ও বস্তুবাদী এই দু'য়ের রূপ এবং এর সামাজিক

www.pathagar.com

ফলাফল একই। তাই বলে এই (ধনবাদী) শোষণ থেকে মানব সমাজকে মুক্ত করতে হলে উৎপাদন ব্যবস্থার সেই আদিম স্তরে ফিরে যেতে হবে—এটা বাস্তব সম্মত নয়। ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যায়ে মানব সমাজ বর্তমানে যেখানে এসে উপনীত হয়েছে—ইসলামের শোষণহীন সমাজ নির্মানের সূত্র সেখানে কার্যকরী নয়—এই চিন্তা যাঁরা করেন তাঁরা ইসলামকে গতিশীল বিপ্লবী মতবাদ হিসাবে বিশ্বাস করেন না এবং আধুনিক যুগের সামাজিক চিকিৎসায় নিরিশ্বরবাদী বস্তুতন্ত্রকে যারা সর্বরোগহর বটিকা বলে বিশ্বাস করেন তাদের মতই ভ্রান্ত ঐ পুনরুজ্জীবন বাদীরাও। ইসলামের বৈপ্লবিক দর্শনের ব্যাখ্যা করার সময় মনীষী আবুল হাশিম আধুনিক যুগের ধনতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে কখনও বিস্মৃত হননি। তিনি জানতেন মাতৃজঠর যত নিরাপদ জায়গাই হোক একবার সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পর আর কোন দিন সেখানে ফিরে যাওয়া যায় না। তাই বিপ্লবী ইসলামের প্রয়োগিক সম্ভাবনাকে তিনি আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটেই রূপ দেবার চিন্তা করতেন। দেশের তথাকথিত হক্কানী আলেমরা তাঁর এই চিন্তাকে যে সুনজরে দেখবেন না সে ব্যাপারেও আবুল হাশিম সচেতন ছিলেন। সম্ভাব্য এবং বাস্তব সমুদয় বিরোধিতা সত্ত্বেও আবুল হাশিম তাঁর চিন্তা থেকে একতিলও সরে যাননি। গভীর পর্যবেক্ষণ ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর এই ধারণা গঠিত হয় যে, কালেমার প্রগতিশীল মতবাদকে জগতের সম্মুখে অকার্যকরী ও হেয় প্রতিপন্ন করেছেন বহুলাংশে—কিছু মোল্লা ও ধর্ম প্রচারকেরাই। কেননা তাঁরা ইসলামকে মানুষের আর্থ সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের দিগ্‌দর্শন হিসাবে না দেখে, একে দেখেছেন বেহেশতে প্রবেশ করার চাবি হিসাবে। দুনিয়া ও আখিরাত এই উভয় জগতের প্রতি সমান মনোযোগী ইসলামকে এ ভাবে খণ্ডিত করে পরিণামে তাকে পঙ্গু করে ফেলা হয়েছে।

আবুল হাশিম নিরিশ্বরবাদী বস্তুতান্ত্রিকদের আক্রমণ থেকে এবং স্বপক্ষের এক দেশদর্শী আলেমদের প্রতিরোধ থেকে ইসলামের গতিশীলতাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আজীবন কঠোর পরিশ্রম করেন। তিনি আধুনিক বিশ্বের কাছে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন যে, ইসলাম যেমন পরলোক বিলোপবাদকে সমর্থন করে না তেমনি পরলোকে বেহেশতবাসকেই একমাত্র পরমার্থ মনে করে না।

www.pathagar.com

এতকাল এই দেশে ইসলামের গতানুগতিক ব্যাখ্যাকাররা কালেমা ও ইসলামকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে খুব সংগত কারণেই মনে হয়েছে যে, ইসলাম বুঝি ইসলামের প্রাথমিক যুগের সমাজ সম্পর্কের প্রেক্ষাপটেই উপযুক্ত ছিল কিন্তু ইসলামের মূল শিক্ষা তা' যেমন দাস সমাজ থেকে সামন্ত সমাজ উত্তরণের কালে উপযুক্ত ছিল তেমনি তা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের যুগেও কার্যকরী রয়েছে এবং সর্বকালে ও সমাজে শোষণমূলক অবস্থা থেকে শোষণহীন সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার দিগদর্শন হিসাবে সমান কার্যকরী থাকবে। কেননা সমাজের যে কোন রকম সম্পত্তি সম্পর্কের আওতায় ইসলাম দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে যে, বিশ্বের যেখানে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্ এবং বিশ্বের সমুদয় মানুষ ভাই ভাই। আধুনিকযুগে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল হয়ে গেছে। উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ এর অন্যতম কারণ তাতে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের বিশেষ রকম উৎকর্ষ ঘটায় খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে মানুষ অনেক দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। মানুষের উৎপাদিকা শক্তির আয়ত্বে এখন বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক লোককে আর এখন উৎপাদন কাজে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে না। শ্রমজীবি ও উদ্‌বৃত্তজীবি এই দুই মোটাভাগে ভাগ হয়ে গেছে পৃথিবী।

ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগে আরবে মানুষে মানুষে দুস্তর পার্থক্য ছিল। কেউ ছিল দাস কেউ ছিল দাস মালিক। কিন্তু আধুনিক যুগের ধনতন্ত্র বলতে আমরা যা দেখি তা ছিল না। ধনতন্ত্রের প্রথম উন্মেষ ঘটে ইউরোপের খ্রীষ্টান জগতে। যন্ত্রশক্তির আবির্ভাবের পরেই সমাজে দেখা দেয় ধনতন্ত্র। ধনতন্ত্র যত বিকশিত হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তত জটিল হয়ে উঠতে থাকে। আজকের দিনে এই ধনতন্ত্র আন্তর্জাতিক পরিসরে সাম্রাজ্যবাদে তথা নয়া উপনিবেশবাদে পরিণত হয়েছে এবং এর প্রভাবের আওতা থেকে পৃথিবীর কোন একটি অঞ্চলও মুক্ত নয়। ধনবাদীরা সারা বিশ্বকে তাদের নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে। উল্লেখ করা দরকার যে, এই ভাগ-বাটোয়ারা কোন স্থায়ী ব্যাপার নয়। যখন কোন শিল্পোন্নত দেশ অন্য পাঁচটা শিল্পোন্নত

www.pathagar.com

দেশের তুলনায় হঠাৎ বেশী উন্নত হয়ে উঠে, তখন তাঁর উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য নতুন বাজারের প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন হয় কাঁচামাল সরবরাহকারী নতুন নতুন এলাকার। তখন পূর্বের ভাগ-বাটোয়ারা আর থাকে না, এলাকা দখলের জন্য শুরু হয় যুদ্ধ। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এই বাজার ও কাঁচামালের উৎস দখলের জন্যই। ভবিষ্যতে যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধে তা হলে তাও বাঁধবে এই কারণেই। শিল্পোন্নত বস্তুতন্ত্রবাদী ও ধনবাদী দেশগুলির কাছে মানবতা, ন্যায় বিচার, মানবাধিকার কিম্বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব হলো কতিপয় শব্দ মাত্র। তারা এ গুলি ব্যবহার করে নিজেদের প্রভাব বলয়কে ঠিক রাখতে এবং সম্প্রসারিত করতে। আসলে এ সবের কোন মূল্য নেই তাদের কাছে। আজকের দিনে ইসলামের প্রধান দুষমন হলো এই ধনবাদ ও এর দার্শনিক অভিব্যক্তি বস্তুতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ।

মনীষী আবুল হাশিম ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে আজীবন তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনি পরিচালনা করেছেন। তিনি পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ থেকে উদাহরণ তুলে দেখিয়েছেন ইসলামে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের কোন স্থান নেই। ধনবাদ সব সময় ব্যক্তির বিকাশ ও ব্যক্তির স্বাধীনতার কথা বলে কিন্তু ধনবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব হয় সমষ্টি বিকাশের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেই। ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে এখানে ধনবাদের স্বাধীনতা। আবুল হাশিম দেখিয়েছেন সামগ্রীকভাবে মানব-জাতির কল্যাণকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী বস্তুবাদ ও বস্তুতন্ত্রবাদের ধ্যান-ধারণাকে নির্মূল করতেই হবে। এর কোন অন্যথা নেই। ধনতন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত হয়েছে। ধনতন্ত্রের নীতিতে যে কোন লোক তার নিজস্ব সম্পদ নিজের ইচ্ছামত ব্যয় ও অপব্যয় করতে পারে। সমাজতন্ত্রবাদীদের দর্শনও একই। সমাজ-তন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা স্বীকৃত। কালেমার দর্শন এ দু'টিরই বিরোধী। সমাজতন্ত্র সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তিতন্ত্রেরই সামিল। কেননা ব্যক্তি মালিকানায় যেমন ধনীর দ্বারা দুর্বলেরা শোষিত হয় তেমনি সমাজতন্ত্রেও বৃহৎ রাষ্ট্রের দ্বারা ক্ষুদ্র রাষ্ট্র শোষিত হয় এবং এই সমাজতন্ত্রের নামে সারা সমাজটাকে শোষণ এবং ভোগ করে দলীয় নেতৃত্বের কতিপয় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি।

www.pathagar.com

ইসলাম যে একটা অনড় ও জাড্য মতবাদ নয় তার প্রমাণ হিসেবে আবুল হাশিম কালেমার বৈপ্লবিক বক্তব্যকে উর্ধে তুলে ধরেছেন। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, নেই কোন মালিক। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু পরিদৃশ্যমান এবং যা আমাদের দৃষ্টি ও মনের অগোচর—তার সবকিছুর মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন। একমাত্র আল্লাহই সার্বভৌম ও সার্বভৌম শক্তির একমাত্র আধার। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব এখানে খণ্ডিত হয়ে যায়। দেশে দেশে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে বিভেদ কালেমার মর্মবাণী অনুসারে তা সবই কৃত্রিম, এ কৃত্রিম বিভেদ মানুষেরই রচনা, প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে। আবুল হাশিম কালেমার মর্মবাণী উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি, শুধু এই অর্থে যে, আল্লাহ্ (রব) বিশ্বের পালক এবং মানুষ এই মহান বিশ্ব পালকের প্রতিনিধি। আল্লাহ্ মানুষের প্রতি তার প্রতিনিধি হিসাবে যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, তা হলো বিশ্বের পালন। মানুষ সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি হিসাবেই এই দায়িত্ব তার উপরে অর্পিত হয়েছে। এই সুমহান দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে যাতে মানুষ পালন করতে পারে তারই জন্য আল্লাহ্ মানুষের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন তাঁর সংবিধান—"আল-কোরআন।" আল্লাহ্র যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে কিভাবে মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব করবে আল-কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে তারই নির্দেশ। আল্লাহ্র পালনবাদী বিশ্বব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকরী হলে বলাই বাহুল্য, এ বিশ্বে কোন যুদ্ধ থাকবে না, কোন বিরোধ থাকবে না, থাকবে না কোন হানাহানি, শত্রুতা বা দুষমনী, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষনের চিরকালীন অবসান ঘটবে। এ বিশ্ব হয়ে উঠবে, একটি সাজানো বাগান, প্রতিটা মানুষ হবে প্রতিটা মানুষের ভাই ও বন্ধু।

এটা কি ইউটোপিয়া? পশ্চিমের চিন্তাবিদরা তা-ই মনে করেন। মনে করেন, এটা একটা অলীক কল্পনা কিন্তু সত্যই কি তাই? ইসলাম ধর্মালম্বীদের ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্য হলো এই যে, তারা উদাহরণ দিয়ে এটাকে আজ আর প্রমাণ করতে পারছেন না। প্রমাণ করতে পারছেনা এই সত্যও যে, মহান আল্লাহ্র পালনবাদ অনুসারে শোষণমুক্ত মানব সমাজ তৈরী করা সত্যই সম্ভব। কারণ, তার কোন নজীর দুনিয়ার কোথাও আজ আর বর্তমান নেই। বিশ্বে ৪০

www.pathagar.com

(চল্লিশ) টির উপর মুসলিম অধ্যুসিত রাষ্ট্র রয়েছে কিন্তু আল্লাহ্‌র পালন-বাদ যথাযথভাবে কোথাও অনুসৃত হয় না। সবাই জানেন, মুসলমানরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। মুসলমানরা তা স্বীকারও করেন। কিন্তু ঠিক কোন্ পয়েন্ট থেকে মুসলমানরা পথ ভুলেছে বা ভুল পথ অনুসরণ করছে তা কেউ স্পষ্ট করে বলেননি। মনীষী আবুল হাশিম এই সত্যটাই অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন—মুসলমানরা পথ ভুল করেছে একেবারে গোড়া থেকেই। রাব্বানা আতেনা·····হাসানা, হাইয়া-আলাল ফালাহ। কেবল 'হাসনা' এবং 'ফালাহ্' মুখে চিৎকার করলে মঙ্গল আসমান ফেড়ে মুসলমানদের কাছে আসবে না। আল্লাহ্‌কে সঙ্গে রেখে প্রকৃতির নিয়মাদি বশীভূত করতে পারলেই 'হাসনা' ও 'ফালাহ্' আসবে।

আল্লাহর অনেকগুলি গুণবাচক নামের মধ্যে এক নাম 'রহমান'। মানুষের জীবন ধারণের জন্য যেসব বস্তু প্রয়োজন তার মধ্যে এমন কতকগুলি বস্তু আছে যা মানুষ তৈরী করতে পারে না। এইসব বস্তুসমূহ যেমন পানি, বাতাস, মাটি প্রভৃতি যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় বলা হয় 'প্রকৃতির দান'। এসব বস্তু ব্যাতিত জীব জীবন ধারণ করতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালার যে প্রকৃতি জীবের এসব বস্তু উপকরণ সরবরাহ করে তাকে বলা হয় "রহমান।" আল্লাহ-রহমানুর রহীম কর্তৃক সরবরাহকৃত এসব বস্তু উপকরণকে বলা হয় মৌলিক বস্তু। মানুষ তার স্বকীয় প্রচেষ্টার দ্বারা এই মৌলিক উপাদান সমূহকে তার নানামুখী প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করে। মৌলিক উপাদান সমূহের আকার ও পরিমানগত নানা রকম পরিবর্তন সাধনের প্রক্রিয়াকেই বলা হয় কাজ। মানুষ কাজ করে। মানুষের এই কাজ করার শক্তি ও শ্রমশক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত। এটা প্রমাণিত যে, মানুষ নেহায়েৎ শূন্য থেকে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। মানবীয় শ্রমশক্তি (দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকারের ক্রিয়া) যখনই কিছু সৃষ্টি করে, তখন সে মৌলিক বস্তুনিচয়ের রূপান্তর সাধন করে মাত্র। একটা গাছ থেকে যখন একটা টেবিল বা চেয়ার তৈরী হয় কিম্বা জমি চাষ করে শষ্য ফলানো হয় বা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে আলো জ্বালানো হয়, পাখা ঘোরানো হয়, তখন প্রতিটা ক্ষেত্রেই মানুষ তার শ্রমশক্তি ও মেধাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বস্তু উপকরণের উপর খাটায় এবং এ ভাবেই তৈরী হয় নানা রকম প্রয়োজনীয় উপকরণ। মাটির

www.pathagar.com

বিভিন্ন উপাদান—পানি, বাতাস ও সূর্য্য কিরণের মধ্যে ফসলের যে সম্ভাবনা অদৃশ্য হয়ে আছে মানুষ তার মেধা ও শ্রমশক্তি খাটিয়ে তাকে বাস্তবে রূপদান করে। অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বলা হয় উৎপাদন। আধুনিক অর্থনীতিতে উৎপাদনের যত সংজ্ঞাই লিপিবদ্ধ থাক বস্তুর প্রয়োজনীয় রূপান্তর সাধন ও অদৃশ্য সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদান ছাড়া উৎপাদন আর কিছুই নয়। মানবীয় শ্রমশক্তিজাত এই উৎপন্নকে (উৎপাদিত বস্তুকে) যখন মানুষের প্রয়োজন মেটাবার কাজে ব্যবহৃত না হয়ে যখন তা ব্যক্তি মানুষ বা কোন গোষ্ঠী কর্তৃক কুক্ষীগত হয় তখন মানুষ আল্লাহ্ (রব)-এর প্রতিনিধিত্বের আসন থেকে বিচ্যুত হয়। মনীষী আবুল হাশিম মানুষের এই বিচ্যুতিকেই অধঃপতন বলে অভিহিত করেছেন। বিশ্ব পালক আল্লাহ্র পালনবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে যখন শোষণমূলক ব্যবস্থায় অধঃপতিত করা হয়েছে তখনই রব-এর প্রতিনিধিত্ব হারিয়েছে মানুষ। আল্লাহ্ মানুষের কোন কাজের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে না বা বাধা দেয় না বলেই আল্লাহ্র (রব)-এর পালনবাদী ব্যবস্থার অন্যথা সাধন করেও মানুষ তার প্রতিনিধিত্বের দাবী এখনও করতে পারছে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব—আশরাফুল মাখ্লুকাত। মহান আল্লাহই মানবজাতিকে এ সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু এ সম্মান রক্ষা করার জন্য মানুষের যা করা উচিৎ সে তা ভুলে গেছে। আল্লাহ্র সবগুলো গুণ মানুষের আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, তথাপি মানব জীবনের সর্বোত্তম কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হবার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ্ তায়ালার যে প্রকৃতি তার সৃষ্টিকে পালন করে তাকে বলা হয় 'রব,' মানুষ এই রবেরই প্রতিনিধি। কোরআনীয় আরাধ্যের ইস্মে-জাত বা ব্যক্তিত্ব (Personal) নাম হলো আল্লাহ্। মনে রাখা দরকার যে মানুষ এই আল্লাহ্র প্রতিনিধি নয়। মনীষী আবুল হাশিম আমাদের দৃষ্টি সেই দিকেই আকর্ষণ করেছেন।

মনীষী আবুল হাশিম কি স্বতন্ত্র কোন দার্শনিক মত প্রচার করেছেন? —না। তিনি তা করেন নি। তিনি বরং কালেমার বৈপ্লবিক বক্তব্য তুলে ধরে সমুদয় দার্শনিক বিতর্কের উপরেই ইতি টেনে দিয়েছেন। নিছক দার্শনিক বিতর্ক কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তর্ক অপ্রতিষ্ঠঃ। জগৎ সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যায় যে দু'টি দার্শনিক মতবাদ

www.pathagar.com

প্রচলিত আছে তার একটি ভাববাদী অন্যটি বস্তুবাদী। এই দুই মতবাদের দ্বন্দ্বের বর্ণনা, ব্যাখ্যা, প্রস্তাব ও খণ্ডনে হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে—কিন্তু বিতর্কের শেষ হয়নি। দু'টি সমান্তরাল সরল রেখা যেমন যতদূরই বিস্তৃত হোক কখনই এক সঙ্গে মিলিত হয় না এই দার্শনিক মতবাদ দু'টির ভাগ্যেও ঘটেছে তাই। আবুল হাশিম দেখিয়েছেন, এই দুইটি প্রধান দার্শনিক মতবাদ পরস্পরের খণ্ডনে সংখ্যাতীত যুক্তির অবতারণা করেছে কিন্তু উদ্দেশ্যের বিচারে সবই হয়েছে ব্যর্থ। কারণ যুক্তির অস্ত্র সাড়ম্বরে সন্ধান ও নিক্ষেপ সবই করা হয়েছে কিন্তু লক্ষ্য ভেদ হয়নি। অথবা এক পক্ষের যুক্তির অস্ত্রে অপর পক্ষ ঘায়েল হয়েও তুল্য শক্তির আর একটি যুক্তির অস্ত্র নিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতার ইতিহাসের আদিকাল থেকেই এ প্রক্রিয়া চলে আসছে। এতে কি সামগ্রীকভাবে দর্শন শাস্ত্র বিকশিত হয়েছে?

এ প্রশ্নের জবাব দেয়াটা একটু কঠিন, যদি বলি—বঁধা ঘোড়ার পিঠে বসে দার্শনিকরা আজীবন চাবুক হাঁকিয়েছেন, তাহলে পেশাদার দার্শনিকেরা ক্ষুন্ন হবেন। কিন্তু কার্যতঃ ঘটেছে তাই। সত্তার আদি কারণ সন্ধানে প্রথম যে বক্তব্য দিয়ে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল হাজারও বছর পরে এখনো তা অম্লান আছে। উভয় পক্ষে যুক্তির অস্ত্র শাণিত হয়েছে বিস্তর, ঠিক যেমন বর্তমান বিশ্বে দুই পরাশক্তি পরস্পরকে ঘায়েল করার জন্য সমরাস্ত্রের সম্ভার বাড়িয়ে চলেছে অথচ মূল লক্ষ্য জয় পরাজয় নির্ধারণ তা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। দার্শনিক মতবাদের প্রধান দু'টি পক্ষ শত শত সম্প্রদায়ে ও শাখা উপশাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে কিন্তু মূল জিজ্ঞাসার জবাব কেউ পায়নি।

এ ভাবে ইতিমধ্যে দার্শনিক সাহিত্যের কলেবর আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মনীষী আবুল হাশিম দার্শনিক সাহিত্যের এই আশ্চর্য কলেবর বৃদ্ধিতে অতিশয় বিরক্তি বোধ করতেন। এ বিষয়ে তার বক্তব্য ছিল খুবই স্পষ্ট। দার্শনিক সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধিই দার্শনিকতার মূল লক্ষ্য নয়। সত্যকে জানাই হলো দর্শনের উদ্দেশ্য। সত্তার সার সন্ধানে যুক্তির পর যুক্তি অন্বেষণ করার পরও দেখা যাচ্ছে, যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেছি। সম্ভবতঃ একেই তিনি বলেছেন দার্শনিক গোলক ধাঁ-ধাঁ। এ গোলক ধাঁ-ধাঁ থেকে মুক্তির জন্যই তিনি কালেমার বৈপ্লবিক বক্তব্য তুলে ধরেন।

www.pathagar.com

আবুল হাশিম ভারতীয় দর্শনের ছয়টি আস্তিক শাখা, যাকে সংক্ষেপে বলা হয়, ষড় দর্শন ও তিনটি নাস্তিক শাখার উপর গভীরভাবে পড়া-শুনা করেন। তিনি অতিশয় যত্নের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের প্রতিটি মতবাদের উৎস ও ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরনের প্রয়াস করেছেন। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব-মীমাংসা বা মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত এই ছয়টি আস্তিক সম্প্রদায় এবং লোকায়ত, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিনটি নাস্তিক সম্প্রদায়ের বহু প্রাচীন পুথি অধ্যয়ন করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চেতন পদার্থই জগৎ কারণ, না অচেতন পদার্থ জগৎ কারণ ঃ হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের এই মূল সমস্যার মীমাংসা কেউ করতে পারেনি। তিনি ইউরোপীয় দর্শনের প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারা গভীর মননশীলতায় পর্যবেক্ষন করেন। জার্মান দার্শনিক হেগেলের দার্শনিক গভীরতা ও সুক্ষ্মতায় তিনি বিস্মিত হন—কিন্তু গভীর পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করেন, হেগেলের সমগ্র দার্শনিক মতবাদটাই দাঁড়িয়ে আছে স্ব-বিরোধীতার উপর। হেগেল দর্শন যত উচ্চমার্গে উপনীত হয়েছে ততই তা আচ্ছাদিত হয়েছে স্ব-বিরোধীতার নতুন নতুন জটিলতায়। হেগেলের উত্তরসাধকেরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে গেলে হেগেল শিষ্য মার্কস ও এঙ্গেলস, হেগেলের মতবাদকে তাঁর পায়ের উপর দাঁড় করাবার দাবী করা সত্ত্বেও মূলতঃ কোথাও দাঁড় করাতে পারেননি! হেগেলের বিখ্যাত দ্বন্দ্বতত্ত্বকে আধিবিদ্যক পরিভাষার জটিলতা থেকে মুক্তি দেবার নামে তাকে প্রথম উলঙ্গ করে শেষে একটা ছালার চট পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব মার্কস এঙ্গেলসের হাতে পড়ে হয়েছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। হেগেলের জগৎ ছিল চিৎপরমাণুর প্রতিভাষ, আর মার্কস এঙ্গেলসের জগৎ হলো মহাজাগতিক বিবর্তন ও শ্রেণী সংগ্রামের পরিণাম।

বস্তুতঃ যে কোন দর্শনের অপেক্ষা না করেই জগৎ বর্তমান এবং এই জগতের যিনি স্রষ্টা তিনি কোন দর্শনতন্ত্রের ধার না ধেরেও আপন অস্তিত্বে মহীয়ান। এই বিষয়ের উপরেই মনীষী আবুল হাশিম জোর দিয়েছেন। মার্কস এঙ্গেলসের সঙ্গে সত্ত্বার সার সংক্রান্ত মূল বক্তব্যে বিরোধ সত্ত্বেও দার্শনিকরা এতকাল শুধু পৃথিবীকে ব্যাখ্যাই করেছেন, কিন্তু প্রয়োজন এর বদল করা।

www.pathagar.com

পরিদৃশ্যমান এই জগৎ ও মহাজাগতিক ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের পদ্ধতি হিসাবে আবুল হাশিম যেটুকু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষের আয়ত্বে এসেছে তারই উপর নির্ভর করে অনুসন্ধান চালাবার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ করে যুক্তির পিঠে যুক্তি রচনার পদ্ধতিকে মনে করেছেন মানব মনীষার অপব্যবহার। এ কথায় হয়তো অনেকে ভাবতে পারেন জ্ঞান চর্চাকেই বুঝি তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন—তা নয়। মানব জাতির প্রতি ইসলামের বিখ্যাত নির্দেশ—"জ্ঞান চর্চার জন্য দরকার হলে সুদূর চীন পর্যন্ত যাও"-এর প্রবল অনুসারী ছিলেন আবুল হাশিম। কোরআনই সমস্ত জ্ঞানের আকর—এ সত্ত্বেও জ্ঞান চর্চার জন্য চীনে যাবার নির্দেশের প্রতি তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সত্ত্বার সার সংক্রান্ত অন্তহীন দার্শনিক কচ্‌কচিকে তিনি শুধু মানব মনীষার অপব্যবহারই মনে করেননি ঃ জগৎ ও জগৎকারণ সম্পর্কে ঐশী গ্রন্থরাজির সুস্পষ্ট বক্তব্য সত্ত্বেও দার্শনিকবাদ বিতণ্ডাকে তিনি মানুষের পক্ষে সীমালঙ্ঘন বলেও মনে করেছেন।

মানব সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের প্রতি একটু মনোযোগী হলে সহজেই বাঝা যায়, প্রাচীন কাল থেকে বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত মানব জাতির সমুদয় দার্শনিক প্রচেষ্টা কালেমার বৈপ্লবিক বক্তব্যকে আদৌ অতিক্রম করতে পারেনি। প্রকৃতি বিজ্ঞানে নানা আবিষ্কার কলেমার বৈপ্লবিক বক্তব্যকে মানুষের সাধারণ বোধের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে। কিন্তু সত্তার সার সংক্রান্ত দর্শন তত্ত্বের প্রায় গোটা প্রচেষ্টাকেই প্রতিপন্ন করেছে অর্থহীন। ডিম এবং মুরগী কোনটা কারণ আর কোনটা ফল তা নিয়ে দার্শনিকেরা আরও লক্ষ বছর তর্ক চালাতে পারেন কিন্তু কালেমা এক কথায় সমুদয় বিতর্কের উপর ছেদ টেনে দিয়ে ঘোষণা করেছে সমুদয় কারণের কারণ মহান আল্লাহ্‌র একত্ব এবং স্রষ্টা হিসেবে তার অনন্য নির্ভর শক্তির।

কালেমার অনন্যসাধারণ বৈপ্লবিক বক্তব্যের সার কথা হলো, আল্লাহ্‌ সর্ব শক্তিমান ও সর্বতোভাবে অভাবহীন। অভাবহীন বলেই তিনি ইচ্ছা নিরপেক্ষ। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে কালেমার শিক্ষা বহু দেবত্ব ও নিরীশ্বরতার অহংকার নিমজ্জিত মানব-বুদ্ধিকে মুক্ত করে। কালেমার এই বৈপ্লবিক শিক্ষা ভুলে যাবার ফলে কিম্বা কালেমাকে একটা

www.pathagar.com

ধর্মীয় শ্লোগানমাত্র মনে করার ফলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। দিনের মধ্যে অসংখ্যবার কালেমা আওড়ানো একজন ব্যক্তি যখন এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে মাথা নত করে তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সে কলেমার বৈপ্লবিক তাৎপর্য বুঝতে সমর্থ হয়নি। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কালেমা যেমন মানুষকে আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রতি আনুগত্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করে—নৈতিক ক্ষেত্রেও তাই। আল-কোরআন প্রদর্শিত নৈতিকতা ব্যাতিত মানুষের আর কোন নৈতিকতা নেই।

বস্তুবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন মানুষের নৈতিকতা কিম্বা নৈতিক মূল্যবোধ সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় কিন্তু কথাটা সত্য নয়। মানুষ যখন কোন পাপাচরণ করে তখন বস্তুতঃ সে তার নিজেরই ক্ষতি সাধন করে। স্থান, কাল ও সমাজ নিরপেক্ষে মানুষ কর্তৃক মানুষ খুন একটি পাপাচার। আল্লাহ্র তরফ থেকে এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ এর জন্য রুষ্ট হন। আল্লাহ্ সর্বতোভাবে অভাবহীন বলেই তার পক্ষে রুষ্ট হবার প্রসঙ্গ ঘটেনা। তথাপি কালেমার নৈতিকতা অনুসারে এটা পাপ এই কারণে যে, এর ফলে নিহত মানুষটির বেঁচে থাকার হক নষ্ট হয়েছে। কালেমার মূল বক্তব্য অনুসারে আল্লাহ্ কুল মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি কারও সাহায্য নেননি। অন্যভাবে বিভ্রান্ত না হলে মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আল্লাহ্ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন—আমাদের লৌকিক জ্ঞানের অগম্য এক গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে। মহান আল্লাহ্র সে উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানের যতই অগম্য হোক, তার মধ্যে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নিহিত নেই। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। কালেমার বৈপ্লবিক বক্তব্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে মানুষকে মর্যাদার এক সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রতিটা মানুষই আল্লাহ্র সৃষ্টি —এর দ্বারা মানুষের সঙ্গে মানুষের সমানাধিকারের তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হয়। বলা বাহুল্য এই সমানাধিকার শুধুমাত্র নামাজের কাতারেই নয়, জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে—রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রেই মানুষের অধিকার সমান। মানব জাতির অধিকার পৃথিবীর কাছ থেকে আদায় করার নিয়মই কালেমার বিপ্লব।

মনীষী আবুল হাশিম, আল্লাহ্‌র যে প্রকৃতি বিশ্বকে পালন ও বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে সেই রবুবিয়তকেই সমুদয় ঐশ্বরিক গুণাবলীর উৎস বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আবুল হাশিমের ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট সম্ভবতঃ এখানেই যে, কালেমার চিরন্তন বাণীর বৈপ্লবিক বক্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মূলতঃ বস্তুবাদী নাফছানিয়াত থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। আবুল হাশিম নতুন কোন দার্শনিক মতবাদের প্রবর্তন করেননি। কিন্তু কালেমার মধ্যে যে বিপ্লবাত্মক দার্শনিক বক্তব্য নিহিত আছে এবং মানবজাতির দুর্ভাগ্য হিসাবে যে দিকে ইতিপূর্বে কোন ইসলামি চিন্তাবিদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি, কালেমার সেই বৈপ্লবিক বক্তব্যকেই তিনি উর্ধে তুলে ধরেছেন। সমস্ত নদী যেমন শেষ পর্যন্ত সাগরে পতিত হয় মানুষের সমুদয় দর্শন তন্ত্রও তেমনি কালেমার মধ্যে এসে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন-পত্রিকায়
প্রকাশিত ঃ অক্টোবর '৮২
সংখ্যা নং—২২/২

www.pathagar.com

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা ও সম্প্রসারণবাদী চক্রান্ত

আই, এন, এর (Indian National Army) বিদ্রোহী লোকদের মিলিটারীতে পুনর্বহাল প্রসঙ্গে মাউন্ট ব্যাটেন নেহেরুকে এই উদ্ধৃতি শুনিয়েছিলেন ; "হলফ নেয়া সৈনিক যারা একবার দেশের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে, বারবার তারা সরকার এবং জাতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করবেই (হাডসন)" ; বোধ হয় এটাই মহা সত্য এবং নিয়ম। তাই নেহেরু কথাটা শুনেছিলেন এবং ভারতীয় বাহিনীতে আই, এন, এর সৈনিকদের পুনর্বহাল করার তাগিদ আর কোন দিন দেননি।

বেশ কিছু দিন যাবৎ বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে একটা অভিযোগ আনা হচ্ছে যে, দেশে বিভিন্ন স্থানে নানা পেশায় নিয়োজিত বহু মুক্তি-যোদ্ধা যে গুপ্ত ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছেন তার পিছনে রয়েছে অত্যন্ত গভীর ও সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। আর '৭১-এর মুক্তি-যুদ্ধের ভাবমূর্তি ও আবেগকে ধ্বংস করে দেশকে পুনরায় পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার জন্যই এ চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। বিগত ৩০শে মে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতির নির্মম হত্যাকাণ্ড ও হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক বলে কথিত মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরের রহস্যজনক মৃত্যুর পর মুক্তিযোদ্ধা হত্যার নীল নক্সা সম্পর্কে কোন কোন রাজনৈতিক নেতা প্রকাশ্যেই মতামত ব্যক্ত করেছেন। কর্ণেল তাহের, বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান, মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুরসহ মুক্তিযুদ্ধের মোট ১১ জন সেক্টর কমাণ্ডার নিহত হয়েছেন এবং যশোর খুলনা সেক্টরের কমাণ্ডার মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিল ও মুক্তি যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল (অবঃ) এম, এ, জি, ওসমানী ও জেঃ মীর শওকত আলী ছাড়া (গুরুত্বপূর্ণ) মুক্তিযোদ্ধাদের খুব কমই নাকি এখন জীবিত আছেন।

মুক্তিযোদ্ধারা গুপ্ত ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছেন এর পিছনে যথার্থই কোন গুপ্ত চক্রান্ত আছে কিনা জানি না, তবে এ যাবত যত মুক্তিযোদ্ধা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের অধিকাংশেরই মৃত্যু হয়েছে

www.pathagar.com

নিজেদের মধ্যে খুনো-খুনির ও জাতীয় বিরোধীতা ও হিংসা বিদ্বেষের ফলে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত মুক্তি-যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে পারস্পরিক হানা-হানির ফলে মৃত্যুবরণের এ রকম নজীর আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। মুক্তিযুদ্ধে শত্রু পক্ষের হাতে নিহতের সংখ্যা বাদ দিয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এ যাবত কতজন মুক্তিযোদ্ধা মোটের উপর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন তার কোন নির্ভর-যোগ্য পরিসংখ্যান জানা যায়নি। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিলের বিভিন্ন জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে জানা যায় তাঁর দলের প্রায় ২০ হাজার কর্মী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশই মুক্তিযোদ্ধা। আওয়ামী লীগ মহল থেকে তাদের দলীয় কর্মীদের হত্যাকাণ্ডের যে সংখ্যা প্রকাশ করা হয় তাও প্রায় অনুরূপ। এ ছাড়াও ছোট ছোট দল, যেমনঃ বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (মনিসিং), মস্কোপন্থী ন্যাপ, ওয়ার্কাস্ পার্টি, শ্রমিক কৃষক, সমাজবাদী দল, একতা পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলও তাদের অনেক কর্মী রাজনৈতিক ও গুপ্ত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে দাবী করেছেন। বলা হচ্ছে যে, তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা।

১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল গুলির প্রতি নির্যাতনের কর্মপন্থা গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন, ছাত্রলীগ অল্প কিছু দিনের মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় এবং উভয় অংশই শেখ মুজিবের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে। প্রথম দিকে মুজিব দ্বিধা বিভক্ত ছাত্রলীগের দুই অংশের প্রতি সমান আশীর্বাদ বর্ষন করে গেলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে এক অংশের দিকে ঝুঁকতে হয়, কেননা দুই ছাত্র লীগ একই সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কাউন্সিল সম্মেলনের আয়োজন করে এবং শেখ মুজিবকে সম্মেলন উদ্বোধনের জন্য দাওয়াত দেয়। মুজিবকে এ সময় একটা অংশকে চূড়ান্তভাবে বেছে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। মুজিব যাদেরকে একদা তার সুলভ অথচ মূল্যবান আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করেন, ছাত্র লীগের সেই বিদ্রোহী অংশ অল্প দিনের মধ্যেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরোধী শক্তি হিসাবে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দলের জন্ম দেয়।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ সমর্থক ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধারা এই প্রথম প্রায় সমান সমান দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৭১-এর যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের অধিকাংশের মানসিকতায় এমন একটা অহমিকার জন্ম হয়েছিল যে, তাদের প্রতিটা আচরণে একমাত্র তারাই "দেশপ্রেমিক" বাকি সবাই দেশদ্রোহী—এই মনোভাব (অভিমান) ফুটে উঠতে দেখা যেত। পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশকে পাক-ভারত যুদ্ধের মাধ্যমে ছিনিয়ে এনে তারা দেশটাকে লুটের মাল বলে ভাবতে শুরু করেছিল। দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের প্রথম দিকেই হিটলার ফ্রান্স দখল করে। স্বাধীনতা হারাবার পর ফ্রান্সের কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি, ছাত্র প্রভৃতি সর্বস্তরেব জনতা দেশোদ্ধারের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু দেশকে শত্রুমুক্ত করার পর প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ পেশায় ফিরে যায়। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার দরুন কেউই বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল করতে চায়নি। অথচ আমাদের দেশে ঘটনাটা ঘটলো একেবারে উলটো। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করুক বা না করুক একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করে নিয়েই তারা দেশের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা বনে গেল। এ সময় তারা একটা শ্লোগান চালু করে, "স্বাধীনতা এনেছি স্বাধীনতা রাখবো"। বলা বাহুল্য এই স্বাধীনতা বলতে তারা বুঝাতো যা কিছুকরার, সোচ্চারের স্বাধীনতা। তারা নিজেরা যা খুশী তাই করবে এবং অন্যেরা তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিবে—মুজিব বাদীরা দীর্ঘদিন যাবত এই স্বেচ্ছাচার চালাতে পেরেছিল। মুজিবের জীবদ্দশায় তাদের স্বেচ্ছাচারে কেউ বাধা দিতে পারতো না এবং এ স্বেচ্ছাচার শেষ পর্যন্ত তাদের এত দূর পেয়ে বসেছিল যে, দেশ ও সমাজের জন্য কঠোর সংগ্রাম করে বৃদ্ধ হয়েছেন এমন প্রবীন নেতারাও তাদের লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পাননি। পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থনকারী মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী প্রমুখ দলের কথা বাদ দিলেও যারা বাংলাদেশের পক্ষে সংগ্রাম সমর্থন করেছিল অথচ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়নি কিম্বা রুশ ভারতের সহায়তায় স্বাধীনতা লাভের তত্ত্বে যারা বিশ্বাস করতো না এমন প্রতিটি দলকেই তারা শত্রু মনে করতো। এবং স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে তাদের যাকে খুশী অপমান করতো। সাবেক প্রধান মন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আতাউর রহমান খানকে

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের বল্গাহীন বাহিনী একবার প্রহার করে একটা ন্যাক্কারজনক ইতিহাস সৃষ্টি করে। আতাউর রহমানের দোষ হয়েছিল এই যে, তিনি একদিন তার বৈঠকখানায় বসে আওয়ামী লীগের ভারত প্রেমের মৃদু সমালোচনা করেছিলেন এবং মুজিব নগরী মুক্তি যোদ্ধাদের সংযত আচরণের পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। জনাব আতাউর রহমানের এই দৈহিক নির্যাতন ও অপমানের ঘটনাকে পল্টন ময়দানের এক জনসভায় মরহুম জননেতা মাওলানা ভাসানী তীব্রভাবে নিন্দা করে ক্ষমতাসীন শেখ মুজিবকে আতাউর রহমানের কাছে মাফ চাওয়ার আহবান জানিয়েছিলেন কিন্তু শেখ মুজিব তার জবাবে মৃদু হেসে ছিলেন, মাফ চাওয়া দূরের কথা, একটু দুঃখ প্রকাশও করেননি। ক্ষমতার শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে এই প্রকার প্রশ্রয় লাভ করেই মুজিব নগরী মুক্তি যোদ্ধারা ক্রমে দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। এদের মদমত্ত পদভারে বাংলাদেশের মাটি এতদূর প্রকম্পিত হয়ে উঠতো যে, ধরাকে সরাজ্ঞান জাতীয় উপমা দিয়ে এদের দৌরাত্ম্য বোঝানো সম্ভব নয়।

৭১-এর যুদ্ধের কনসেপ্ট নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহু ধরনের মতামত আছে। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে আলাদা করে যারা এই অঞ্চলে কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চায়নি তারা মনে করতেন শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের নিজস্ব শক্তিতেই সংগ্রাম করা উচিত। কারণ কোন অঞ্চলের জনগণ যদি দীর্ঘস্থায়ী ও শ্রমসাধ্য সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন না করে প্রতিবেশী কোন বৃহৎ পুঁজিবাদী ও বৈরী ভাবাপন্ন শোষণমূলক রাষ্ট্রের সামরিক সহায়তায় স্বাধীনতা লাভ করে তবে সে স্বাধীনতা তাদের জন্য কখনই ফলপ্রসূ স্বাধীনতা হয় না।

৭১-এর যুদ্ধে গণচীন বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করলেও রুশ-ভারতের সামরিক সহাতায় বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা যুদ্ধ সমর্থন করেনি। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত কমুনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে সেক্রেটারীর রিপোর্ট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংঘটিত অপকর্মের তালিকায় ভারতের মাধ্যমে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত করা ছিল একটি নক্সা, খুব স্বাভাবিক কারণেই ভারত পাকিস্তানকে দুর্বল করতে চেয়েছিলেন এবং এখনো চায়। পাকি-

www.pathagar.com

স্তানের পূর্বাঞ্চলের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার ভারত নীতিগত কারণে যে সমর্থন করেনি ভারতের বহু অঙ্গ রাজ্যের জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অত্যন্ত নিষ্ঠুর কায়দায় বন্দুকের নলের মুখে দমন করা থেকেই তার প্রমাণ মিলে !

বৃটিশ আমলে বর্তমান বাংলাদেশ ছিল কলকাতা বন্দরের পশ্চাৎ ভূমি। হুগলী নদীর দুই তীরে স্থাপিত প্রায় দু'শটি (২০০টি) জুট মিল চলতো বাংলাদেশের পাট দিয়ে। ছোট বড় আরও অসংখ্য শিল্প কারখানা কলকাতার আশে-পাশে গড়ে উঠেছিল আর কাঁচামালের যোগান যেত বাংলাদেশের এই অঞ্চল থেকেই। এক কথায় বাংলাদেশ ও আসাম ছিল পশ্চিম বঙ্গের শিল্প কারখানার কাঁচামালের যোগানদার আর উৎপাদিত শিল্প পণ্যের বাজার। এ কারণেই বাংলাদেশের উপর ভারত তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। ভারতের মাড়োয়ারী পুঁজির বিকাশের আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করতে যে ভারত সরকার বাংলাদেশের শোষিত জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশের কোন কোন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ভারতের পাকিস্তান ভাঙার অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিল বলেই ভারতের সহায়তা ছাড়াই নিজেদের শক্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু করেছিল। তবে বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন দলগুলি (যেমন মনিসিং এর দল ইত্যাদি) পাকিস্তানকে ঘায়েল করে মুসলিম মিল্লাতকে জখম করার উদ্দেশ্যে ভারতের সঙ্গে এক মত প্রকাশ করতো এবং এখনও করে।

'৭১ সালের ২৫শে মার্চের সামরিক অভ্যুত্থানের পর রুশ-ভারত সমর্থক কমুনিষ্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এবং আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা ও কর্মীরা ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী যুবকদের সমন্বয়ে যে "মুক্তি বাহিনী" গঠন করে তাদের সঙ্গে এদেশে অবস্থানকারী এদেশের গণ-মানুষের সঙ্গে প্রথম থেকেই সংঘাত বেধে ওঠে। যুদ্ধের নয় মাসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামীদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনী তড়ি ঘড়ি করে আওয়ামী লীগ সমর্থক মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রগামী করে বাংলাদেশ অভিযান পরিচালনা করে। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কাছে আত্ম সর্মপন করতে বাধ্য হয়। সবাই জানেন,

www.pathagar.com

ভারতীয় জেনারেল অড়োরা ও পাকিস্তানী জেনারেল নিয়াজীর মধ্যে যখন আত্মসমর্পনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, সে সময় বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর কথিত সর্বাধিনায়ক কর্ণেল এম, এ, জি, ওসমানী অন্যত্র ভোজ সভা আহবান করেছিলেন। ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর কথিত যৌথ কমাণ্ডের কাছে পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পন করেনি। কার্যতঃ এটা ছিল পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার যুদ্ধ।

ভারতীয় সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে ভারতের অন্ন খেয়ে যারা যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে ভারতের সম্প্রসারণবাদী অভি সন্ধি বুঝতে পারার মত রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল খুব কম লোকের। এদের মধ্যে জ্ঞান পাপীও যে ছিল না তা নয়। কিন্তু অধিকাংশ মুক্তি যোদ্ধাই ভারতকে ত্রাণ কর্তার ভূমিকায় দেখতে অভ্যস্ত ছিল। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তার সহযোগী রুশ, ভারত পন্থী ন্যাপ ও কমিউনিষ্ট পার্টি'র সমন্বয়ে দেশ প্রেমিক ঐক্য জোট নামে একটি জোট গঠন করে। ইতি মধ্যে নেতৃত্ব হালুয়া রুটি ও মতাদর্শ গত সামান্য বিরোধকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের অপেক্ষাকৃত জঙ্গী অংশটি বের হয়ে গিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করে। যাদেরকে অনেকেভারতের বি-টিম বলে মনে করতো। ভারতের ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তি যোদ্ধারা এই ভাবে মোটা-মুটি দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ পন্থী ও আওয়ামী লীগ বিরোধী। বাংলাদেশের মাটিতে থেকে যারা নিজেদের উদ্যোগে যুদ্ধের কলা-কৌশল আয়ত্ত করে সাম্রাজ্য-বাদ, সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী বক্তব্য নিয়ে মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করে মুজিববাদীরা তাদের নাম দেয় "নকশাল" শেখ মুজিব এদের দেখা মাত্রই গুলি করার জন্য পুলিশ, রক্ষী বাহিনী ও দলীয় কর্মীদের প্রতি আদেশ দেন। এবং তথাকথিত নকশালী তৎপরতা দমনের জন্য মুজিব সমর্থকদের সমন্বয়ে বিভিন্ন নামের নানা বাহিনী গড়ে তোলা হয়। মুজিব রাজত্বের সাড়ে তিন বছরে "নকশাল" দমনের নামে এদেশের কত হাজার দেশ প্রেমিক যুবককে যে হত্যা করা হয়েছে হিসেব কে দেবে।

মুজিবী রাজত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অথচ সবচেয়ে সাধারণ ঘটনা ছিল মানুষ খুন। মানুষ কর্তৃক মানুষ খুন।

www.pathagar.com

'৭০-এর ফেব্রুয়ারী থেকেই এ হত্যা যজ্ঞ শুরু হয় চট্টগ্রাম থেকে। মুজিববাদীরা সবাই মিলে তথাকথিত নকশাল পন্থীদের হত্যা করছে। কিম্বা তথা কথিত নকশাল পন্থীরা মুজিববাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। বাংলাদেশের হত্যার রাজনীতি এমন সরল রেখায় আর অগ্রসর হয়নি। বাংলাদেশ হবার পর প্রথম চোটে মুজিববাদীরা প্রতিহিংসা বশতঃ অনেক অমুক্তি যোদ্ধা যুবককে হত্যা করতে সমর্থ হলেও অল্প দিনের মধ্যেই দৃশ্য পটের পরিবর্তন ঘটে যায়। দেশের মুজিববাদ বিরোধীদের প্রতিরোধ সংগ্রাম দানা বেধে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মুজিববাদীদের মধ্যে আত্মকলহের সূত্রপাত হতে থাকে। মুজিব নগরী মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে দ্বিধা-তার পর-ত্রিধা, শেষে বহধা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং দ্বিধা বিভক্ত গ্রুপগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত এমনকি খুনো-খুনি শুরু হয়ে যায়। আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো, মুজিববাদী বনাম দল ছুট মুজিববাদীদের মধ্যেই খুনো-খুনিটা সীমাবদ্ধ থাকেনি। মুজিববাদীরা নিজেরাও পরস্পরের সঙ্গে হানাহানিতে মেতে ওঠে এবং এ হানাহানির এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে ৭ জন মুজিববাদী যুবক নিহত হয়। শেখ মুজিবের হিমালয় সমান (!) ব্যক্তিত্ব তার সমর্থকদের এই হানাহানি থেকে বিরত করতে পারেনি। মুজিববাদীরা নিজেরাও স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, মুজিববাদী ও দলছুট মুজিববাদীদের মধ্যে যত যুবক নিহত হয়েছে তার বেশীর ভাগের জন্য দায়ী খোদ মুজিববাদীরাই এবং এও সত্য যে, শেখ মুজিব সহ আওয়ামী লীগের কতিপয় শীর্ষ নেতার হত্যাকাণ্ডের জন্য একদা মুজিব সমর্থকরা ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। কাজেই আজ যাঁরা বলছেন স্বাধীনতা বিরোধী বিদেশী শক্তির এজেন্টরা মিলে একে একে সুপরিকল্পিত উপায়ে মুক্তি যোদ্ধাদের হত্যা করছে তাদের এ অভিযোগ প্রমাণ সিদ্ধ নয়। এ অভিযোগের পেছনে গণ সমর্থনও নেই। বস্তুতঃ মুক্তিযোদ্ধা বলতে সর্বকালে সর্বদেশে জনসাধারণের মনে যে অনাবিল গর্ব মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জাগে আমাদের দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে খুব কমই সেরূপ শ্রদ্ধার দাবী করতে পারেন। এটাকে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। পাকিস্তান আর্মী থেকে যারা বিদ্রোহ করে '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধে সামিল হয়েছিলেন সামরিক বাহিনীর এথিকস্ অনুযায়ী

www.pathagar.com

তারা পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীর সদস্য থাকার যোগ্যতা হারিয়েছিলেন। বুদ্ধিমানেরা শুনে শিখে বেকুফেরা দেখে শিখে আমরা এত অধম যে দেখেও শিখি না। তথাপি মুক্তিযোদ্ধা হিসাবেই সেনাবাহিনীতে তাদের পুনঃ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গেই তা করা হয়ে ছিল। কিন্তু এ মর্যাদা তারা ধরে রাখতে পারেনি। শেখ মুজিবের মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে সেনাবাহিনীতে বার দুই অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের ফলে বহু মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক প্রাণ হারায়। উল্লেখ বাহুল্য যে, মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধের ফলে এ প্রাণহানি ঘটেনি। শোনা যায় জিয়াউর রহমান তার শাসনামলে ১৭টা সামরিক অভ্যুত্থান দমন করেছেন। এ অভ্যুত্থানগুলির একটাও মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধা দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়নি। বরং বিদেশী শক্তির এজেন্টরা এ দ্বন্দ্বটাকে বার বার ব্যবহার করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। জিয়াউর রহমান যে বিদ্রোহের ফলে মৃত্যু বরণ করেন সরকারী শ্বেত পত্র থেকে জানা যায়, বিদ্রোহের নেতা মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকদের মধ্যে একরকম গুজব ছড়িয়ে ছিলেন যে, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা হবে। এগুলো যে নিছক গুজব সচেতন দেশ দেশপ্রেমিক সৈনিকেরা তা ভাল ভাবেই উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন।

দেশে প্রকৃত পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তি যোদ্ধার দন্দ্বের চেয়েও অনেক গভীর সক্রিয় দ্বন্দ্ব রয়েছে মুক্তি যোদ্ধাদের নিজেদের মধ্যে। সে দ্বন্দ্ব হল মুজিববাদী মুক্তি যোদ্ধা বনাম মুজিববাদ বিরোধী মুক্তি যোদ্ধা। মুজিববাদী মুক্তি যোদ্ধারা দুর্ভাগ্য বশতঃ গোড়া থেকেই এই বিশ্বাস পোষণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, মুজিববাদীরাই আসল দেশ প্রেমিক বাকী সবাই ফাও। দেশকে শাসন ও লুণ্ঠন করার একচ্ছত্র অধিকার কেবল তাদেরই রয়েছে। অস্ত্র ধরা হোক বা না হোক, দেশকে "শত্রু মুক্ত" করার কৃতিত্ব একমাত্র তাদের। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তারা দেশকে প্রায় তাদের বংশগত জমিদারীতে পরিণত করে এবং খুঁটির জোরে মেড়া কোঁদার নিয়মে মুজিবী শাসনের বদৌলতে তারা ধরাকে সরাজ্ঞান করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধা বলতে বিশ্ববাসীর মনে যে, শ্রদ্ধার ভাব ছিল এদের ঔদ্ধত্বের ফলে তা অচিরে ধ্বংস হয়ে যায়।

www.pathagar.com

মুজিববাদীদের ঔদ্ধত্য সর্বজন বিদিত, কিন্তু এ ঔদ্ধত্যের কারণ সবার কাছে পরিষ্কার নয়। একটা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী সৈনিক উদ্ধত হতে পারে এটা কল্পনাতীত। কিন্তু মুজিববাদীরা তা হয়ে ছিল এবং এখনও তাই আছে। এর কারণ কি? কারণ বহু হতে পারে তবে সবচেয়ে প্রধান ও মৌলিক কারণ হলো, আদর্শহীনতা। মুক্তি যুদ্ধের চেতনা বলে যা কল্পনা করা হয় মুজিববাদী অস্ত্রধারীদের মধ্যে তার লেশ মাত্র ছিল না। তারা শত্রু মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল। তারা পাকিস্তানী শাসকদের জায়গায় নিজেরা বসতে চেয়েছিল এবং বিজাতীয় প্রভুদের বসাতে চেয়েছিল এবং মুসলমান মালিকদের ব্যবসা, মিল ফ্যাক্টরী, বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট ইত্যাদি নিজেরা দখল করতে চেয়েছিল। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর তাদের সে মনঃস্কামনা বহুল পরিমাণে চরিতার্থও হয়েছিল। খুব ভাল ভাবেই আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, পাকিস্তানীরা চলে যাবার পর এ দেশের শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে আসেনি। ক্ষমতা যারা দখল করেছিল জনগণের মঙ্গল করার কোন আদর্শ তাদের ছিল না। মুজিবী শাসনের সাড়ে তিন বছরে এ দেশের জনগণের বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক জীবন এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা হীনতাই প্রমাণ করে মুজিববাদীদের কোন আদর্শ ছিল না।

বাংলাদেশ হবার দশ বছর পরে মুক্তি যোদ্ধা অমুক্তি যোদ্ধার প্রশ্নটি আবার যারা সামনে নিয়ে আসছেন তাদের উদ্দেশ্য জাতিকে বিভক্ত করে বিজাতীয় আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী চক্রান্ত কার্যকরী করা। প্রশ্নটি যারা তুলছেন, চোখ বুজে বলা যায় তাদের মধ্যে দেশ প্রেম নেই, থাকা সম্ভব নয়। দেশের মঙ্গল কামনা করেন দেশের প্রতি ভালবাসা আছে এমন প্রতিটি লোকই স্বীকার করবেন, দেশের জন্য আজ সর্বাধিক প্রয়োজন একতা, কেননা আগ্রাসী শক্তি যত প্রবলই হোক, কোন একতাবদ্ধ জাতিকে কেউ পদানত করতে পারে না। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে আমাদের উপর কেউ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কাজেই যারা আমাদের পদানত করতে চায়, তাদের প্রথম কাজ হলো আমাদের জাতীয় একতা ধ্বংস করা। যে কোন একটা উপলক্ষকে সামনে রেখে সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসী শক্তি তাদের অনুগৃহিত সেবাদাস, পঞ্চম বাহিনী দিয়ে এদেশের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে, এর

www.pathagar.com

মধ্যে কোন অতি কল্পনা নেই। বস্তুতঃ করাও হচ্ছে তাই। আজ বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসী শক্তি একের পর এক চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। '৭১ সালে যারা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ছত্র ছায়ায় ইন্দিরা গান্ধীর ভাত খেয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করে ছিলো তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এখন দেশ প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন। প্রকৃতই যারা দেশ প্রেমিক তাদেরকে মুজিব আমলে এবং তৎপরবর্তীকালে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উপায়ে মুজিব-বাদীরা শেষ করে দিয়েছে। অবশ্য এসব কথার অর্থ এই নয় যে, আমরা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারবো না। বরং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের চক্রান্তকারীদের সম্পর্কে দেশবাসী এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন হয়েছেন এবং একথা খুবই সত্য যে কোন দেশের পঞ্চম বাহিনী কোন দিনই জনগণের সম্মিলিত শক্তির চেয়ে পরিমাণে বেশী হতে পারে না। আল্লাহ আমারদেশকে হেফাজত করুন।

দৈনিক কিষাণ/২-১-৮২

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয়করণের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতি ও প্রশাসন

যদি কোন অর্থনীতিবিদকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আমাদের দেশের অর্থনীতির এই বিপর্যয়ের কারণ কি? তিনি অল্প কথায় ইহার জবাব দিতে পারিবেন না। পারিবেন না ইহার কারণ—আমাদের জাতীয় অর্থ-নীতির বিপর্যয়ের কারণ একটি-দুইটি নয় বরং অনেক এবং গুরুত্বের দিক দিয়া কোনটাই কোনটার চাইতে কম নয়। তবুও এক কথায় যদি কেহ ইহার জবাব দাবী করেন তাহা হইলে বলিতে হইবে—অসাধুতা। জাতীয় অসাধুতাই জাতীয় অর্থনীতির বিপর্যয়ের মূল কারণ।

আমাদের জাতীয় অর্থনীতির এই বর্তমান দশা একদিনে হয় নাই। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর শিল্প কল কারখানা, ব্যাংক বীমা ব্যবসায় ও আমদানী-রপ্তানীর বৃহদাংশ রাষ্ট্রীয়করণ হইয়াছে বলিয়াই জাতীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়াছে, তাহাও বলা যাইবে না কারণ ব্যক্তি মালিকানা হইতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় স্বত্বান্তরের ফলে অনেক দেশের অর্থনীতি নূতন গতি লাভ করিয়াছে। নড়বড়ে অবস্থা হইতে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ভিত্তি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে কিন্তু আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়করণের ফল হইয়াছে উল্টা। দশ বৎসরের কল্পিত বিরামহীন চেষ্টার পরও অধিকাংশক্ষেত্রে উৎপাদন '৭০-এর পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই। অথচ আশা করা হইয়াছিল, পর-শাসনের অবস্থা হইতে "মুক্তি" পাইলেই আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ আর কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

বিগত এক দশকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের এমনকি উন্নয়নশীল দেশেরও মাথা পিছু আয় বাড়িয়াছে কিন্তু আমাদের দেশে বাড়িবার বদলে সামান্য কমিয়াছে এবং ধনী দরিদ্রের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে উহা আগের তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। একটি জাতি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা অর্জনের পর জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে কর্মোদ্দম পরিলক্ষিত হয় এখানে তাহা হয় নাই। জাতীয় স্বার্থরক্ষা ও বিকাশের চেষ্টার পরিবর্তে এখানে দেখা গিয়াছে "যেমন করিয়া

www.pathagar.com

পারি কিছু করিয়া লই এই বেলা" এই মনোভাব। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করিতে কাহারো মনে কোন দ্বিধা জাগে নাই। রাজনৈতিক নেতাদের দেখা দেখি স্বভাবতঃ আত্মকেন্দ্রিক আমলারাও তাঁদের মেধা ও কর্মশক্তিকে নিজেদের বৈষয়িক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভের পিছনেই ব্যয় করিতেছেন এবং এই মানসিকতায় ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন। মধ্যখান হইতে সরকারের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যখন যাঁহারা আসীন হইয়াছেন কেহই সময়মত বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কখনও বুঝিয়া, কখনও না বুঝিয়া কখনও বা নিরুপায় হইয়া এই অবস্থা মানিয়া লইয়াছেন। কিভাবে এই প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে তাহা কম বেশী সবারই জানা। তবে গদী রক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ না করিয়া কেহই পারেন নাই। এই প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে দেখিতে পাই দুর্নীতিই বাংলাদেশের একমাত্র নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি যেন কাহারো নাই!

কল কারখানা, ব্যাংক-বীমা ব্যবসা প্রভৃতি রাষ্ট্রীয়করণ করার প্রধান ঘোষিত উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তি মালিকানা যাহাতে জনগণকে শোষণ করিয়া সম্পদের পাহাড় জমাইতে না পারে। কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়করণের ফলে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। কলকারখানা, ব্যাংক-বীমা প্রভৃতি প্রশাসক, আমলা ও শ্রমিক নেতাদের অনেকেরই সম্পদ ও সম্পদের প্রতি অধিকতর লালসা বৃদ্ধি করা ছাড়া তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী কোন ফলই প্রসব করিতে পারে নাই। উদাহরণস্বরূপ বি, আর, টি, সি—রাষ্ট্রপরিচালিত একটি পরিবহণ সংস্থা। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সামর্থের বিবেচনায় ইহা একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান। বিপুল পুঁজি লইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, ব্যক্তি মালিকানাধীন পরিবহণ সংস্থাগুলি যাহাতে জনগণের ঘাড় মটকাইরা যেমন খুশি বাস ভাড়া আদায় করিতে না পারে কিন্তু সে উদ্দেশ্য চরমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। বি, আর, টি, সি, জনগণকে কখনও সেই সুবিধা বা সেবা দিতে পারে নাই। বরং ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে বি, আর, টি, সিই সব সময় অগ্রপথিকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। টাউন সার্ভিসের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতেছি গুলিস্তান হইতে মীরপুরের ভাড়া যখন প্রাইভেট পরিবহণ

www.pathagar.com

সংস্থাগুলি এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা লইতেছে তখন বি, আর, টি, সি আদায় করিতে শুরু করিয়াছে এক টাকা আশি পয়সা। ইহার আগে বি, আর, টি, সি যখন এক টাকা হইতে এক টাকা চল্লিশ পয়সা বাড়ায় তখনও অনেক দিন পর্যন্ত প্রাইভেট বাস এক টাকা ভাড়াই চালু রাখিয়াছিল। অথচ হওয়া উচিত ছিল ইহার উল্টোটি। জনসেবার কাজে বি, আর, টি, সি'র এই ব্যর্থতার কারণ কি? বি, আর, টি, সি অগ্রণী হইয়া ভাড়া বাড়ায় কেন? এক কথায় ইহার জবাব হইল—দুর্নীতি। ভাড়া যাহা আদায় হয় সরকারী কোষাগারে জমা হয় তাহার একটা অংশ মাত্র। বাকিটা ড্রাইভার-কণ্ডাক্টর, পরিদর্শক ও অন্য কর্মকর্তারা মিলিয়া ভাগ করিয়া লয়। এই চুরি ঠেকাইবার জন্য অবশেষে বি, আর, টি, সি, কর্তৃপক্ষ বাসগুলি ঠিকায় বন্দোবস্ত দিয়াছে। প্রতি ট্রিপে একটি নির্দিষ্ট টাকা দিতে হইবে—আদায় যাহাই হউক।

কিন্তু তবুও দুর্নীতি বন্ধ হয় নাই। কাগজ কলমে বি, আর, টি, সি জনগণের সম্পদ হইলেও সম্পত্তিটা দখল করিয়াছে বি, আর, টি, সি'র শ্রমিক ইউনিয়নের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা। ইউনিয়নের নেতারাই এখন এ সংস্থার মা ও বাপ রক্ষক অর্থে নয়, ভক্ষক হিসাবে। সংস্থার এক শ্রেণীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার ভূমিকাও গৌণ নয়। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলি শিল্প কারখানা ও বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (যেমন ব্যাংক, বীমা, আমদানী-রফতানী বাণিজ্য) রাষ্ট্রীয়করণ দাবী তুলিত। তাহাদের যুক্তি হইল, ব্যক্তি মালিকানার পাশা-পাশি যদি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তাহা হইলে ব্যক্তি মালিক একচেটিয়াভাবে পণ্যের দাম বাড়াইয়া জনগণকে শোষণ করিতে পারিবে না। বিশেষ সমাজ ব্যবস্থায় এ কার্যক্রম হয়তো ভাল ফল দিতে পারে কিন্তু বাংলাদেশে এ পদক্ষেপ পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবনতাকে বাধাদান তো করেই নাই, এমনকি পণ্য মূল্যের বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছে। '৭০ সালে যে দিয়াশলাইর দাম ছিল পাঁচ পয়সা সেইটা এখন ৩০ পয়সা হইয়াছে। রাষ্ট্রীয়াত্ত দিয়াশলাই শিল্প দিয়াশলাইয়ের মূল্য কমাতে কোন সাহায্য করে নাই। এ ধরনের ভুরি ভুরি উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। বাংলাদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়াছে—আমরা ইহার বহু কারণের মধ্যে একটিকে সনাক্ত

www.pathagar.com

করিয়াছি—দুর্নীতি। সাম্প্রতিককালের এই দুর্নীতির একটা নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত দেখা দিয়াছে রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে।

একটা দেশে অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যাংকের ভূমিকা জীবদেহে ফুস্‌ফুসের ভূমিকার মত। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সব ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় লইয়া আসা হয় এবং নূতন দেশের চাহিদা অনুযায়ী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকগুলির শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে শিল্প ও কৃষি ব্যাংকের সব শাখা-প্রশাখা মিলাইয়া ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৩৬৯০টি। মোট কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৭২ হাজার। বর্তমানে একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যাইতেছে, ব্যাংকগুলি মুনাফা কম হইলেও কাগজে কলমে বেশী দেখাইয়া থাকে এবং অনেক সময় লোকসান হইলেও হিসাবের কারসাজিতে মুনাফা দেখাইয়া বোনাস আদায় করে। এই অভিযোগ যে কতখানি যথার্থ তাহা সরকারী মালিকানাধীন সাপ্তাহিক বিচিত্রার ১০ম বর্ষ ১৬ সংখ্যার "বে-আইনী ব্যাংক ধর্মঘট" শীর্ষক প্রতিবেদন হইতেই প্রমাণিত হয়।

নামে রাষ্ট্রায়াত্ত প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকগুলির বর্তমান লেনদেন পরিস্থিতির ছোট একটা হিসাব পরীক্ষা করিলেই প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। চলতি সালের গোড়া হইতে রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ডিপোজিট কমিতে শুরু করে। ৩১শে ডিসেম্বর '৮০তে যেখানে জনতা ব্যাংকের সবগুলি শাখায় মোট ডিপোজিট ছিল ৬৯৭ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা তাহা ৩১শে জানুয়ারী '৮০তে নামিয়া আসে ৬১৫ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকায়। রাষ্ট্রায়াত্ত সবগুলি ব্যাংকের পরিস্থিতিই এই রকম। প্রতি মাসেই ডিপোজিটের পরিমাণ কমিতেছে। কোন কোন ব্যাংকের ডিপোজিটের পরিমাণ গত ৫/৬ মাসে শতকরা ৫০ ভাগে নামিয়া আসিয়াছে। জনতা ব্যাংকের পুরানা পল্টন শাখায় ডিপোজিটের পরিমাণ ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা হইতে ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। অন্যপক্ষে বিদেশী ব্যাংকের ডিপোজিটের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। একটি বিদেশী ব্যাংকের দৈনিক লেন-দেনের পরিমাণ গত বছর যেখানে ছিল গড়ে ৩০ লক্ষ টাকা চলতি বছরে মে মাসে তাহা দাঁড়ায় ৯৫ লক্ষ টাকায়

www.pathagar.com

এবং গত মাসের (আগষ্ট '৮১) শেষের দিকে দৈনিক লেন-দেনের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়া ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে। অর্থাৎ দেশীয় ব্যাংকের লেন-দেনের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে আর অপর পক্ষে বিদেশী ব্যাংকের ব্যবসার পরিমাণ দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে এই হইল ব্যবসায়ের দিক। দেশীয় ব্যাংকের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বিনষ্ট হইতেছে। ইহাকে যদিও কোন ভাবেই তুচ্ছ করিয়া দেখা যায় না, তথাপি ইহা আপক্ষা মর্মান্তিক ঘটনা আরও আছে। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির এই প্রাণ কেন্দ্র যে কিভাবে দুর্নীতি আর স্বেচ্ছাচারিতার কবলে পতিত হইয়াছে একটি দুইটি তথ্য পরীক্ষা করিলেই তাহা পরিষ্কার জানা যাইবে। ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়নের '৭৯ এর নির্বাচনের পর হইতেই ইউনিয়নগুলি ব্যাংকের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ শুরু করে। কর্মচারী নিয়োগ ও বদলী, ঋণ ও আগাম মঞ্জুর ইত্যাদির উপর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অধিকার সীমিত হইয়া পড়ে। ইউনিয়ন ব্যাংক ব্যবস্থাপনার পাশা-পাশি একটি সমান্তরাল ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি করে এবং প্রসাশন কার্যের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত-গুলি ইহাদের মাধ্যমেই নির্বাহ হইতে থাকে।

ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়নের অংশগ্রহণকে এক কথায় খারাপ বলিয়া মন্তব্য করা আমার উদ্দেশ্য নয়। অবস্থা বিশেষে ইহার ফল ভালও হইতে পারে কিন্তু বাংলাদেশে সে রকম কিছু হয় নাই। ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া ইউনিয়নগুলি যে দুর্নীতি চালায় ইহার কোন নজীর নাই। ইহা ছাড়া এ যাবৎ বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করার ঘটনা ধরা পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি হইল ২৩শে সেপ্টেম্বর '৭৭, পূবালী ব্যাংক ব্রাহ্মনবাড়িয়া শাখায় ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী '৮১ পূবালী ব্যাংক কুমিল্লা শাখায় ৬১ লক্ষ ৬৯ হাজার ২ শত ৪০ টাকা। পূবালী ব্যাংক বঙ্গ বন্ধু এভিনিউ শাখায় ৩৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫ শত ৪২ টাকা। চট্টগ্রাম সি, ডি, এ, শাখায় ম্যানেজার কর্তৃক ৪১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। পূবালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে একজন ডি, জি, এম, কর্তৃক ২০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ। পরিতাপের বিষয় হইল এইসব আত্মসাতের ঘটনা ধরা পড়ার পর যথাযোগ্য তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও ইউনিয়নের চাপে এবং ক্ষমতাসীন দলের সংগে সম্পর্ক

www.pathagar.com

থাকার সুযোগে অনেকে সাজা এড়াইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছেন, এমনকি বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করার পরও পদচ্যুত না হইয়া পদোন্নতি লাভ করিয়াছেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে কর্মরত কর্মচারী ও বিভিন্ন স্তরের অফিসাররা এ যাবৎ যত অর্থসংক্রান্ত কেলেংকারির ঘটনা ঘটাইয়াছেন তাহার সবিস্তার বর্ণনা দিতে গেলে অষ্টাদশ অধ্যায় মহাভারত হইয়া যাইবে। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যাংকে কর্মরত মোট কর্মচারী ও অফিসারের সংখ্যা প্রায় ৭২ হাজার। ইহাদের মধ্যে সবাই নিশ্চয়ই দুর্নীতি পরায়ণ নহেন। তাহা হওয়াও সম্ভব নয়। তবে ব্যক্তিগতভাবে কে ভাল আর কে মন্দ তাহার চাইতেও প্রধান এবং বাস্তব সত্য হইল, ব্যাংক পরিচালনার বর্তমান ব্যবস্থাটি আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত একেবারে পঁচিয়া গিয়াছে। অবস্থা এমন যে, সিস্টেমের পরিবর্তন ছাড়া এই সীমাহীন ব্যাপক দুর্নীতির কোন খুচরা চিকিৎসার অবকাশ আর নাই।

ব্যাংক কর্মচারীরা কয়েক কোটি টাকা মেডিক্যাল ভাতা তুলিয়াছেন কিংবা শতকরা ৪ টাকা হারে কোটি কোটি টাকা গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। এসব অভিযোগ জাতীয় অর্থনীতির সামর্থ বিচারে যদিও অতিশয় গুরুতর তবুও প্রধান সমস্যা এখন দাঁড়াইয়াছে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে গেলেই যাহাদের লেজে পা পড়িবে তাহারা ফণা তুলিয়া গর্জন করিবে।

দেশ দুর্নীতিতে ছাইয়া গিয়াছে—এক নিঃশ্বাসে বলা যায় এই কথাটির প্রতিবাদ করিবেন বাংলাদেশে এমন কেহই নাই কিন্তু ইহার প্রতিকার কি? আমরা সবাই জানি, দেশে শিল্পের বিকাশ হওয়া দরকার। কারণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি মানেই দুর্বল অর্থনীতি। জাতীয় অর্থনীতির শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ অবদান কৃষির পাশাপাশি শিল্পের অবদান নয় ৯ শতাংশের বেশী নয়। এ অবস্থায় দেশে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশকে শিল্পে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে একটি সুষ্ঠু শিল্পনীতি গড়িয়া তোলা দরকার এবং দরকার তাহা কার্যকরী করা। বর্তমান সরকারের শিল্পনীতি জাতীয় আশা-আকাঙ্খা পূরণের পক্ষে কতটুকু সমর্থ তাহার চাইতে বড় প্রশ্ন হইল, যে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাহা কার্যকরী হইবে তাহার কাঠামো সবল কিনা এবং যে সব ব্যক্তির সমন্বয়ে যে ব্যবস্থাপনা কাঠামো গঠিত তাহারা দুর্নীতিমুক্ত কিনা। দেশ দুর্নীতিতে ছাইয়া গিয়াছে—এ অভিযোগ

www.pathagar.com

হইতে শিল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বাদ পড়ে না এবং প্রকৃত সত্য এই যে, শিল্প ব্যবস্থাপনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ও দুর্নীতি ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং বহাল তবিয়তে বাঁসা বাঁধিয়া বংশ বিস্তার করিয়া চলিয়াছে।

বাংলাদেশ হওয়ার পর যে কয়টি সরকার ক্ষমতায় আসীন হইয়াছেন সবাই দেশে শিল্প স্থাপনের উপর গুরুত্বদানের কথা ভাবিয়াছেন। এই মর্মে প্রচারও করা হইয়াছে প্রচুর কিন্তু লক্ষ্য করা গিয়াছে, শিল্প স্থাপনের চাইতে ট্রেডিং এর প্রতিই মানুষের ঝোঁক বেশী। ইহার কারণও আছে। খুব সহজে এবং স্বল্প সময়ে (বলিতে গেলে রাতারাতি) টাকা করার পথ বাংলাদেশে প্রচুর।

বাংলাদেশের বাজারে দেশীয় পণ্যের বলিতে গেলে কোন স্থান নাই। সমস্ত বাজারটাই দখল করিয়া আছে বিদেশী পণ্য। দেশে শিল্প স্থাপনের পর পণ্য উৎপাদন করিয়া সেই পণ্য বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা করার চাইতে বিদেশী পণ্য বিক্রির দালালী করিয়া পয়সা উপার্জন করা অধিক সহজ ও লাভজনক। বাংলাদেশ হওয়ার পর ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র অজস্র ইণ্ডেন্টিং ফার্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। যাহার তুলনায় বলিতে গেলে শিল্প কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। সরকার বেসরকারী পর্যায়ে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রচুর উৎসাহ দানের কথা প্রচার করিয়া থাকেন কিন্তু সে প্রচারে তেমন কেহই উৎসাহী হইতেছেন বলিয়া মনে হয় না। বাংলাদেশের পুঁজি মালিকদের শিল্প স্থাপনের অনীহাই ইহার কারণ নয়। সত্য কথা বলিতে গেলে বাংলাদেশী পুঁজি মালিকরা শিল্প স্থাপনে উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার কারণ শিল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি এবং সীমাহীন দুর্নীতি। শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা লইয়া যদি কোন পুঁজি মালিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তবে পর্যায়ক্রমে যতগুলি স্তর তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে প্রত্যেক পর্যায়েই তাহাকে কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য "ম্যানেজ" করিতে হইবে। মাসের পর মাস তাহাকে কাগজপত্র বগলে লইয়া কর্তৃপক্ষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিতে হইবে। ঘুরাঘুরি সহজে শেষ হইবে না। এমনও দেখা গিয়াছে ছয়মাস ঘুরিবার পর ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া অনেক উদ্যোগী ব্যক্তি শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছে। শিল্প স্থাপনে সরকারের উৎসাহ দান সংক্রান্ত প্রচারের সঙ্গে দেখা গিয়াছে প্রকৃত উৎসাহ দানের কোনই সম্পর্ক নাই। বাংলাদেশে শিল্প কারখানা যে যথেষ্ট পরিমাণে স্থাপিত হইতেছে না এ সবই তাহার প্রধান কারণ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে যে কোন কারণেই হউক আমলাতন্ত্র এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী। প্রয়োগিক ক্ষমতার বিচারে আমলাতন্ত্রকে সর্বশক্তিমান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এহেন আমলাতন্ত্র যদি সরকারী নীতির সহযোগী না হয়, সরকারের সাধ্য নাই দেশের ভাল করার। সরকার দেশের প্রধান প্রধান শিল্প কারখানা, ব্যাংক ও বীমা ব্যবসায় প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রাখিয়া আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে তাহা পরিচালনা করিতেছেন এবং ভাবিতেছেন এই উপায়ে দেশের সমৃদ্ধি আসিবে। নীতিগতভাবে ইহা সম্ভব কি অসম্ভব আমরা তাহা বিচার করিতে চাহিনা। আমাদের সার্বজনীন অভিজ্ঞতা হইল এই পন্থা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প কারখানায় অবিরাম ভর্তুকি দিয়াও বাঁচাইয়া রাখা যাইতেছে না। প্রশাসক কর্মকর্তারা মুনাফা দেখাইয়া যখন বোনাস আদায় করিতেছেন তখন ঐ প্রতিষ্ঠানটি হয়তো টিকিয়াই আছে ভর্তুকির উপর। সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একবার স্বখেদে বলিয়াছিলেন, "শিল্প কারখানা হইতে অধিকাংশ সময় মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়া হয়, লোকসান হইলেও সমালোচনার ভয়ে ও স্বার্থের বশবর্তী হইয়া মুনাফা দেখানো হয়"।

আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সম্পদের উপর ব্যক্তির অধিকারকে পবিত্র বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সম্পদ থাকিলে তাহা চুরি যাইবেই। এমনকি সমাজতন্ত্রের প্রথম পীঠস্থান সোভিয়েট রাশিয়াতেও এই চৌর্য কর্ম ইদানীং অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া জানা যাইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যাহারা পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত, তাঁহারা নূতন ব্যবস্থায় অনেকেই প্রচুর সম্পদের মালিক হইয়া বসিয়াছেন। শ্রমিকদের এই অভিজাত গোষ্ঠীটিই এখন বলিতে গেলে দেশের সমুদয় সম্পদের মালিক। বাংলাদেশে আমরা বীজাকারে যাহা দেখিতেছি সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন তাহাই মহীরূহ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

আমরা জাতীয় শিল্পের বিকাশ চাই। কারণ শিল্পের বিকাশ না ঘটিলে দেশের অর্থনীতি বলিষ্ঠ হইবে না। আমরা কৃষির আধুনিকীকরণ চাই। কেননা কৃষি আধুনিক না হইলে আমাদের বিপুল কর্মশক্তির সুচারু ব্যবহার সম্ভব হইবে না। আমরা নীলচক্ষু প্রশাসক ও পরিচালকমণ্ডলীর হাতে জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠিত হউক তাহা দেখিতে চাই না; কারণ লুণ্ঠিত হওয়ার মত সম্পদের প্রাচুর্য আমাদের নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক/১৩-১০-৮১

www.pathagar.com

শুধু অবাঞ্ছিতই নয় বিপজ্জনকও

মিঃ মুচকুন্দ দুবে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার। তিনি বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ সরকারের ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্সের একজন অফিসার ও গাড়ীর ড্রাইভারকে প্রহার করেছেন এবং গাড়ীর চাবি ছিনিয়ে নিয়েছেন বলে খবরের কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী শহর তো বটেই এমনকি গ্রামাঞ্চলেও এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে দারুণ। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতি এই ভদ্রলোককে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করার দাবী জানানো হয়েছে। আর ভারত সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে তাকে প্রত্যাহার করে নেবার। জাতীয় সংসদেও এই ঘটনার উপর আলোচনার প্রস্তাব উঠেছিল কিন্তু যেহেতু বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে কাজেই সংসদে এ নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি, কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে। মোটের উপর এই অবাঞ্ছিত ঘটনাটি বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ও বহুল আলোচিত ঘটনা।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এই ঘটনাটি দেশে যতটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে ঘটনাটি আসলে ততটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার মত নয়। তবু তা করেছে তার কারণ এর সঙ্গে নানা কারনে আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটিও জড়িয়ে গেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ মুচকন্দ দুবে একটা রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন, সে দলটি ভারতের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এ দলটি এমন কিছু ধ্যান-ধারণা পোষণ করে যা দেশের সচেতন জনগণ মোটেই ভাল চোখে দেখেন না। পত্রিকায় ভারতীয় হাইকমিশনারের এই ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সে বিশেষ ঐ রাজনৈতিক দলটির অফিসেও যাতায়াত করতেন সে বিষয়েরও আলোকপাত করা

www.pathagar.com

হয়। ফলে বাংলাদেশের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কর্মকর্তার উপর ভারতীয় হাই কমিশনারের আক্রমন ও প্রহারকে লোকে একটু বিশেষ তাৎপর্যময় ঘটনা বলেই মনে করতে বাধ্য হচ্ছেন।

অপর পক্ষে ভারতীয় হাই কমিশন অফিস থেকে এন, এস, আই কর্মকর্তার প্রহার ও চাবি ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনার অন্য রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম থেকেও একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ঘটনার। তারা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেছেন, ভারতীয় হাইকমিশনার ২৩শে নভেম্বরের পর আর কোনদিন দলের কেন্দ্রীয় অফিসে যাননি। তাছাড়া আওয়ামী লীগ পাল্টা অভিযোগ করেছে এই বলে যে, আওয়ামী লীগকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য একটি সুগভীর চক্রান্তজাল বিস্তার করা হয়েছে। মিঃ মুচকুন্দ দুবের সঙ্গে লীগের উর্ধতন কর্মকর্তাদের অন্তরঙ্গ সাক্ষাতকারের কাল্পনিক বিবরণটি সেই চক্রান্তেরই অংশ বিশেষ। খবরের কাগজে প্রকাশিত বিবৃতিতে আওয়ামী নেতারা বলেছেন—দেশে অনেক ঘটনাই অহরহ ঘটছে যা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর হুমকির সামিল । অনেক বিদেশী কূটনীতিক বাংলাদেশের যত্রতত্র ঘুরে ঘুরে সভা সমিতি করেছেন" এখানে বলে রাখা ভাল যে এই কূটনীতিকদের গতিবিধি গোপন নয়, সরকারের পূর্ব হতেই জানা এবং এদের বিবরণ খবরের কাগজেই পাওয়া যায়।

আওয়ামী লীগের এই বিবৃতির ফলে জনমনে সংশয় আরও ঘনীভূত হয়েছে। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর একের পর এক ঐ দলের নেতারা দেশের সার্বভৌমত্বের বিপন্নকারী যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাতে ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার মানসে তারা যে আরো গভীর চক্রান্ত জাল বিস্তার করবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সম্প্রতি সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় কিছু সংখ্যক দুস্কৃতিকারী ধরা পড়েছে যারা দেশের অভ্যন্তরে নানা রকম নাশকতামূলক কাজের সাথে জড়িত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে যারা ভারতে অবস্থানরত কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীর লোক বলে জানা গেছে। পত্র-পত্রিকায় এদের নাশকতামূলক কাজের বিস্তারিত বিবরণও প্রকাশিত হয়েছে। সরকার যখন অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে এই দুস্কৃতিকারী দলের সাথে বিশেষ রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের

www.pathagar.com

যোগসাজশ, তাদের অস্ত্র ও অর্থের উৎস, তাদের পরিকল্পনার নীল নকশা ইত্যাদি ব্যাপারে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহ করতে শুরু করেছে ঠিক সেই মুহূর্তেই ঐ দলটি বিচলিত হয়ে কাগজে বিবৃতি দেয়া শুরু করেছেন যে, ওদের সাথে আমাদেও কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য তাদের বক্তব্যের আদৌ কোন সত্য থাকতে পারে না তা নয়।

ঐ শ্রেণীর রাজনৈতিক দল ছাড়া বাংলাদেশের অন্য আরও কোন রাজনৈতিক দল বিদেশী শক্তির সহায়তায় দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করেছে—এই ধারণাটা জনগণের মধ্যে প্রচলিত নয়। স্পষ্টতই দলটির ভারত-প্রীতি প্রশ্নের অতীত একটি সত্য। একে ঐতিহাসিক বললেও ভুল হবে না। বস্তুতঃ পক্ষে মিঃ মুচকুন্দ দুবে যদি কোন ক্লাবে কোন বাঙ্গালীকে প্রহার করতেন কিংবা বাজারে গিয়ে কোন সবজীওয়ালাকে চপেটাঘাত করতেন তাহলে সেটা হতো অন্য ঘটনা। সে অবস্থায় বলা যেতো এই ভদ্রলোক কুটনীতিকের আদব-কায়দা জানেন না বা শিক্ষা দেওয়া হয়নি একে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হোক। কিন্তু ভারতীয় হাইকমিশনার মিঃ দুবে এ দেশের একজন এন, এস, আই কর্মকর্তাকে প্রহার করেছেন, কথিত এই অভিযোগে যে তিনি তাকে "হয়রানী" করছিলেন অর্থাৎ অনুসরণ করছিলেন। এতে করে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ রাজনৈতিক দলের অফিসে তাঁর যাতায়াত সম্পর্কে সন্দেহ ঘণীভূত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না এবং সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কতকগুলো ঘটনার সমন্বয়ে জনমনে এই সংশয় আরো দানা বেধে ওঠতে থাকে যে, আমাদের সার্বভৌমত্ব সত্যই হয়তো হুমকীর সম্মুখীন এবং সেই কারণে ব্যক্তি বিশেষ শুধু অবাঞ্ছিতই নয়, বিপজ্জনকও।

দৈনিক সংগ্রাম ; ৮-৩-৮২

www.pathagar.com

ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা

ভারতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণার তথ্যবহুল প্রতিবেদন আমাদের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মিজো সমস্যা, অর্পিত সম্পত্তি আইন, আসামের বহিরাগত চুক্তি—এগুলিই হলো প্রচারণার মূল বিষয়বস্তু। অবশ্য যদিও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতে একটা ঢিমেতালের প্রচারণা সব সময়ই চলে এবং প্রয়োজনমত সেটা জোরদার করা হয়, কিন্তু হঠাৎ করে গত রমজানের মাঝামাঝি থেকে এই প্রচারণাটি তুমুল হয়ে উঠলো কেন বোঝা যাচ্ছে না।

আমরা জানতাম, নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে হলেও বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্রমাগত উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং আশা করেছিলাম, সম্পর্কোন্নয়নের এ ধারা যদি অব্যাহত থাকে তবে খুব শীঘ্রই আমাদের জাতীয় অর্থ-নীতি বিকাশের অন্যতম প্রধান বাঁধন হিসাবে বিদ্যমান ফারাক্কা সমস্যা, আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত দক্ষিন তালপট্টি দ্বীপের মালিকানা সমস্যাসহ সমুদয় দ্বিপাক্ষিক সমস্যার অবসান হবে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণের পক্ষে আন্তরিকতা নিয়ে সৎ প্রতিবেশী-সুলভ শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে আর কোন বাধা থাকবে না। কিন্তু ভারতের মাটিতে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা যেভাবে তুমুল আকার ধারণ করেছে এবং করছে তাতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির আশা ক্রমেই সুদূরপরাহত হয়ে পড়েছে।

এ কথা সুবিদিত যে, ভারতের কিছু কিছু জাতীয় সমস্যা আছে এবং তার সমাধান খুঁজে বের করতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে নাস্তানাবুদ হয়ে যেতে হচ্ছে। 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' শব্দের প্রতি ভারত যতটা উদার দেখা যায়, ভারতের অভ্যন্তরের নিপীড়িত জাতি-সত্তাসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সে কিন্তু ততটা ঔদার্য্যের সংগে সমর্থন করছে না এবং মিজো ও অন্যান্য জাতিসত্তাসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নির্মমভাবে দমন করতে সে তারপক্ষে সম্ভব সবকিছুই করছে।

www.pathagar.com

ভারতের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক জাতিসত্তা রয়েছে। এসব জাতি-সত্তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে সহায়তা করার পরিবর্তে ভারত এদেরকে সবদিক দিয়ে নির্মমভাবে শোষণ করে চলেছে।

বর্তমানে ভারতে মিজো সমস্যা খুবই তীব্র হয়ে উঠেছে। এটা ভারতের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং এ কারণেই আমাদের পক্ষে মিজো সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু মিজো সমস্যার ব্যাপারে বাংলাদেশকে অবাঞ্ছিতভাবে জড়িত করে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এমন প্রচারণা চালানো হচ্ছে যে, আমাদের সৌজন্য বজায় রেখে চুপ করে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া এই আচরণ যদি ভারতীয় পত্র-পত্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে এর গুরুত্বকে আমরা কিঞ্চিত লঘুভাবেই বিবেচনা করতে পারতাম। কিন্তু ব্যাপারটি লঘুভাবে বিবেচনা করার অবকাশ আমাদের আর নেই।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ নরসিমা রাও সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন, "মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের গেরিলা তৎপরতা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা থেকে পরিচালিত হচ্ছে এ কথা ভারত সরকারের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।" যদি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইতিপূর্বে এই মর্মে বহুবার ভারত সরকারকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশ তার ভূখণ্ডকে কখনই ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কোন হিংসাত্মক তৎপরতা চালানোর কাজে ব্যবহৃত হতে দেবে না। কেননা উভয় দেশের সরকার সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা ও এ উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পরস্পরের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গত ২৯শে জুলাই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ নরসিমা রাও লোক-সভায় জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে (এসব প্রশ্ন ক্ষমতাসীন দল তৈরী করে দেয়) যখন এই বিবৃতি দিচ্ছিলেন, আমরা জানি না ভারতীয় লোকসাভায় কোন সহৃদয় সদস্য এর প্রতিবাদে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কি না। তবে ভারতের লোকসভায় ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে এ ধরনের বিবৃতি মাঝে মাঝেই প্রদান করা হয়। কয়েক দিন আগেই ভারতের উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী দক্ষিণ তালপট্টির ব্যাপারে লোকসভায় বাংলা-দেশ বিরোধী যে বিবৃতি দান করেছেন তার সংগে ২৯শে জুলাইয়ের বিবৃতির গভীর সম্পর্ক আছে বলেই অনুমান করা যায়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ বিরোধী এসব মন্তব্য ও প্রচারণার আসল তাৎপর্য কি? কথামালার নেকড়ে বাঘ ও মেষ শাবকের গল্পটা সবারই জানা আছে। প্রবল যখন দুর্বলের ছিদ্রান্বেষণ করতে শুরু করে তখন উদ্দেশ্যহীনভাবে সে তা করে না। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লোকসভায় যে বিবৃতি দিয়েছেন তা ভারতের জনগণের মধ্যে রেডিও-টেলিভিশন, সংবাদ-পত্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে বলেই অনুমান করতে হবে। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক তৎপরতা চালানো হচ্ছে বাংলাদেশের মাটি থেকে এই ঘটনাটাকে ভারতের জনগণ নিশ্চয় হাল্কাচিত্তে গ্রহণ করবে না। গ্রহণ করা স্বাভাবিকও নয়, উচিতও নয়, যেমন ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর কাদের সিদ্দিকী যখন ভারতের মাটি থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছিল সে ঘটনা বাংলাদেশের কেউ হাল্কাচিত্তে গ্রহণ করতে পারেনি। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। ভারতেও প্রায় ১৫ কোটি মুসলমান বাস করে। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড থেকে ভারত বিরোধী হিংসাত্মক তৎপরতা চালানো হচ্ছে—এই প্রচারণার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা জেগে উঠা খুবই সম্ভব। এমনিতেও কারণে অকারণে ভারতে মুসলমান বিরোধী দাংগা প্রায় সবসময় লেগে থাকে। ক'দিন আগেও দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক দাংগায় যে দু'ব্যক্তি নিহত হয়েছে তাদের দুজনই মুসলমান। ধর-পাকড় যা হয়েছে তার বেশীর ভাগই মুসলমান। দাংগার ফলে এখনও দিল্লীতে কারফিউ চলছে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ভারতের মাটিতে ন্যূনাধিক ৪ হাজার ২ শতবার সাম্প্রদায়িক দাংগা সংঘটিত হয়েছে। যেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার সমস্যাই প্রধান সমস্যা সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারে এমন কোন বিষয় কি প্রচার করা উচিত? তার উপর যদি সে বিষয়টি মিথ্যা হয়?

আজ একটা জিনিস খুবই লক্ষণীয় যে, দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের মালিকানা নিয়ে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ভারত সরকারের বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকার প্রতি দারুণ অসন্তোষ রয়েছে। ভারতের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন অনেকেই বিশ্বাস করেন দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের মালিকানা বাংলা-

www.pathagar.com

দেশের। ভারত বৃহৎশক্তি সুলভ দাম্ভীকতায় বাংলাদেশের ন্যায্য দাবীকে নস্যাৎ করার ফন্দী আঁটছে এবং ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার জনগণ সুষ্ঠুভাবেই বুঝতে পেরেছে যে, কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বজায় রাখার অজুহাতে ফারাক্কা বাঁধ নির্মান করা হলেও এটি আসলে নির্মাণ করা হয়েছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রেশার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত 'সত্যযুগ', দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়া টুডে' প্রভৃতি কোন কোন পত্রিকায় ফারাক্কা বাঁধের ব্যাপারে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মুখোশ উন্মোচন করে বলা হয়েছে, এই বাঁধ নির্মাণের ফলে শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়েছে তাই নয়, পশ্চিম বাংলার অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের মত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারকেও চাপের মুখে রাখবার উদ্দেশ্যে ফারাক্কাকে ব্যবহার করছে।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বহু দ্বিপাক্ষিক সমস্যা রয়েছে। ভারত এপর্যন্ত কোন সমস্যারই চুড়ান্ত সমাধান করেননি বা করতে চাচ্ছে না। কোন সমস্যা নিয়ে উপর্যুপরি বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠকের পর যখন কোন সমস্যা তার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের কাছাকাছি এসে যায় তখনই দেখা যায়, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলিতে নানা ধরণের আজগুবি প্রচার শুরু হয়ে গেছে এবং পত্র-পত্রিকায় প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী নেতাদেরও তখন বিবৃতি দানের প্রসঙ্গ এসে যায়।

ভারতীয় ইতিহাসের প্রতিটি ছাত্রেরই একথা জানা আছে যে, মারাঠার রাজ্য শুদ্র বংশোদ্ভূত শিবাজী মুসলিম জেনারেল আফজাল খাঁকে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপের জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। বিনা দ্বিধায় আফজাল খাঁ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে শিবাজীর সংগে সাক্ষাৎ করতে যান। আফজাল খাঁ শিবাজীকে বন্ধুভাবেই আলিংগন করতে গিয়েছিলেন কিন্তু ঠিক এই আলিংগন অবস্থাতেই শিবাজী তার কুখ্যাত 'বাঘ নক' দিয়ে আক্রমণ করে আফজাল খাঁকে হত্যা করেছিল। কোন মানব জাতির ইতিহাসে এ রকম বিশ্বাসঘাতকতার আর দ্বিতীয় নজির মিলবে না। আর এই মানব ইতিহাসের জঘন্য শিবাজীই হলো আধুনিক ভারতের জাতীয় বীর। এই

www.pathagar.com

জাতীয় বীরের চরিত্রই ভারতের সরকারী আচার-আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে কিনা কে জানে !

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের জনগণের জীবনে যে দুর্যোগের মেঘ চারিদিক থেকে ঘনিয়ে এসেছে তার নানা আলামত ইতিমধ্যে বিভিন্ন দিকে ফুটে উঠছে। শুধু বাংলাদেশের জনগণই নয়, বিশ্বের তাবৎ মুসলমানের জীবনই আজ দুর্যোগের ঘণঘটায় পূর্ণ। অথচ পরিতাপের বিষয় হলো, কি এদেশে, কি ওদেশে মুসলমানরা সর্বত্রই আজ আত্মবিস্মৃত। এই আত্মবিস্মৃতির সমস্যাই মুসলমাসদের জন্য প্রধান সমস্যা বলা যায়, সকল সমস্যার জনক।

দৈনিক সংগ্রাম ৩-৮-৮২

www.pathagar.com

বাংলাদেশ-ভারত অর্থনৈতিক সহযোগীতার প্রশ্ন

বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতির (ওকাব) এক চা চক্রে ভাষণদানকালে বিদায়ী ভারতীয় হাই কমিশনার মিঃ মুচকুন্দ দুবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিদ্যমান পরিস্থিতি এবং এর ভবিষৎ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একটা চিত্তাকর্ষক কথা বলেছেন। সাবেক পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বর্তমানের বাংলাদেশ যখন পূর্ব পাকিস্তান নামে অন্তর্ভুক্ত ছিলো তখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকেও মাঝে মাঝে কথাটা বলা হতো—সাবেক পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের অর্থনীতিতে পরিপূরকতা থাকা আর ভারত ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিপূরকতা থাকা খুব চিত্তাকর্ষক ব্যাপার বৈকি!

সাবেক পাকিস্তানী নেতাদের বক্তব্যের সাথে মিঃ মুচকুন্দ দুবের বিদায়ী বক্তব্যটি যে এখন খাপে খাপে মিলে গেল—এটা কি কোন কাকতালীয় ব্যাপার?

সবাই জানেন, বৃটিশ শাসিত ভারত ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই অংশে বিভক্ত হয়। দেশ বিভাগের পর, শিল্প কলকারখানায় শতকরা সাতাশি (৮৭%) ভাগ নতুন ভারতে পড়ে। অধিকাংশ শিল্প শ্রমিক (৯০%) টেকনিশিয়ান, বিশেষজ্ঞ এবং শিল্প ও বাণিজ্য পুঁজির সিংহভাগ ঐতিহাসিক কারণেই নতুর ভারতের ভাগে পড়ে যায়। পাকিস্তানের অর্থনীতির মৌল দুর্বলতা দাঁড়ায় এই যে, জাতীয় বাজেট তৈরী করতে হয় প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন ও তা রফতানীর উপর ভিত্তি করে। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের (বাংলাদেশের) অবস্থা ছিলো আরও করুণ।

তখন মার্কিন ডলারের সঙ্গে পাকিস্তানী টাকার বিনিময় হার ছিল—১ মার্কিন ডলার সমান ৪টা কা ১২ পয়সা। সে সময় বাংলাদেশের পাট, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া, চা ও অপ্রচলিত নানা দ্রব্য রফতানী করে আয় হতো ৪৫০ (প্রায়) কোটি

www.pathagar.com

টাকার মত। ঐ সময়ে পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় ১৫০০/২০০০ কোটি টাকার মাল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আমদানি করা হতো। এর মধ্যে থাকতো চাল, গম, কাপড়, তূলা, তূলাজাতদ্রব্য, খাবার তেল, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। একটি জিনিষ প্রথম থেকেই সবাই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন করে এবং কাঁচামাল রফতানি করে দেশ টিকিয়ে রাখা যাবে না। শিল্প গড়তে হবে। কিন্তু শিল্প গড়ার ব্যাপারে নবীন দেশটির অধিবাসীদের যতটা আগ্রহ ছিল শিল্প গড়ার বাস্তব পরিস্থিতি ততটা অনুকূল ছিল না। শুরু করতে হয়েছিলো বলতে গেলে একেবারে গোড়া থেকেই।

বৃটিশ শাসিত ভারত ছিলো একটা অর্থনৈতিক ইউনিটের মধ্যে। এটাকে দু'টি ইউনিটে ভাগ করার পর দেখা গেল মোট ৪১০ টা বস্ত্র-কলের মধ্যে পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে মাত্র ১৬টি, তন্মধ্যে ৪টি মাত্র বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) এবং ১৫৩টি চিনি কলের মধ্যে নতুন পাকিস্তানের ভাগে ১১টি তন্মধ্যে ৪টি মাত্র বাংলাদেশে। ৩৬০টি পাট-কলগুলোর সবই পড়েছে নতুন ভারতে। প্রতিটি কল-কারখানার মাত্র ১৩ শতাংশ আর শিল্প শ্রমিকের মাত্র ৭ শতাংশ নিয়ে পাকিস্তানকে যাত্রা শুরু করতে হয়। ওদিকে কয়লা ও লোহা সবই পড়েছে ভারতে এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ যেমন ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা ও অভ্র কিছুই পাকিস্তান পায়নি। কয়লা পেয়েছে নাম মাত্র। আর ভাগ্যক্রমে ভারতের তুলনায় খনিজ তেলটা পেয়েছে মোটামুটি ভাল (আটক)। এ অবস্থায় দেশ-বিদেশের অনেকেই পাকিস্তানের ভাগ্য সম্পর্কে এক মত ছিল যে, অর্থনৈতিক কারণে পাকিস্তান বেশী দিন টিকবে না— শীঘ্রই তাকে ভারতের সঙ্গে একীভূত হতে হবে। অধিকন্তু দেশ বিভাগের পর পরই কাশ্মীর নিয়ে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদের ফলে পাকিস্তানের অবস্থা আরও নাজুক হয়ে পড়ে। ৪০০ কোটি টাকার বৃটিশ ভারতীয় জমা মুদ্রার মধ্যে পাকিস্তানের ভাগে পড়ে মাত্র ১০০ কোটি টাকা কিন্তু এ সময় ভারতীয় নেতা প্যাটেল বলেন, কাশ্মীর বিরোধের নিষ্পত্তি না হলে পাকিস্তানকে এর কোন অংশ দেয়া হবে না। এটা ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের কথা। তার আগে একই সনের আগষ্ট মাসে আচার্য কৃপালনী বলেন, ভারতের সঙ্গে পুনরেকত্রীকরণে সম্মত না হলে কোন বিরোধেরই নিষ্পত্তি হতে পারে না।

www.pathagar.com

ভারত এ সময় পাকিস্তানের সাথে রফতানি বাণিজ্যে রফতানি শুল্ক মওকুফে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে---যদিও অন্যান্য দেশের সঙ্গে (একই পণ্যের জন্য) রফতানি বাণিজ্যের বেলায় সে শুল্ক মওকুফের নীতি বহাল রাখে।

পাকিস্তান বিষয়টা ১৯৪৯ সালে এজেন্সী কনফারেন্স অন ওয়ালর্ড ট্রেড (গ্যাট)-এর কাছে উত্থাপন করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ভারতের কাছে নির্ধারিত রফতানি শুল্ক ও অর্জিত মুদ্রার ভাগা-ভাগির প্রস্তাব করেও ব্যর্থ হয়। ঐ সময় আমাদের পাট কলিকাতা বন্দর দিয়ে রফতানি হোত।

দেশ বিভাগের পর দু'দেশের মধ্যে এই মর্মে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, দু'দেশের মধ্যে পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে কাস্টম ডিউটি ধরা হবে না। অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে একটা কাস্টম ইউনিয়ন গঠিত হয়। কিন্তু ভারত পাকিস্তানকে রফতানি শুল্ক থেকে বঞ্চিত করার ফলে তিন মাসের মধ্যেই এটি বিলুপ্ত হয়।

১৯৪৭ সালের ১৩ই নভেম্বর পাকিস্তান সরকার কাঁচা পাটের উপর রফতানি শুল্ক ধার্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। পাকিস্তানের শতকরা ৯০ ভাগ কাঁচা পাট এ সময় রফতানী করা হতো কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে। ঐ বছর জাতীয় বাজেটে রফতানি শুল্ক বাবত সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা আয় হবে বলে ধরা হয়। পাকিস্তানের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ অর্থের ক্ষতি বহন করার সাধ্য ছিল না কিন্তু ভারত পাকিস্তানের কাঁচা পাট রফতানির উপর শুল্ক আদায় করা প্রস্তাব বিবেচনা করতে রাজী হয় নাই। কারণ ভারতের জানা ছিল পাকিস্তানের দুর্বলতা কোথায়। পাকিস্তান কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে রফতানিকৃত কাঁচা পাটের তিন চতুর্থাংশের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ভারত পাকিস্তানকে রফতানি শুল্কের ন্যায্য অংশ দিতে অস্বীকার করে এবং এ সম্পর্কিত কোন চুক্তি সম্পাদনেও অসম্মত হয়। এরপর ভারত সরকার ঘোষণা করে যে, যেহেতু পাকিস্তান একটি ভিন্ন দেশ কাজেই দেশে প্রচলিত বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক আইন অনুসারেই পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, কায়-কারবার নিষ্পন্ন হওয়া উচিত। ভারত এমনি এক তরফাভাবে উভয় দেশের মধ্যে সম্পাদিত "ষ্ট্যাণ্ড ষ্টিল এগ্রিমেন্ট" বাতিল করে দেয়। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, অতঃপর পাকিস্তানকে কয়লা কিনতে হয় ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আর ভারতের কাঁচা তুলা কিনতে, হাতের কাছে সিন্ধু পাঞ্জাব থাকতেও ছুটতে হয় অন্যত্র দুরদেশে।

www.pathagar.com

তৎকালীন ভারতীয় নেতারা মনে মনে এই প্রত্যাশা পোষণ করতেন যে, কেবলমাত্র প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন ও তা রফতানি করে পাকিস্তান অর্থনৈতিক সমস্যা মেটাতে পারবে না এবং শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে পুনরায় একীভূত হতে বাধ্য হবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগীতার নীতি গ্রহণ করে। পাকিস্তান ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন সময়কার আচরণ ও দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা দেখে সতর্ক হয়ে যায় এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষে আপন শক্তি সামর্থের ওপর নির্ভর করার নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

১৯৪৯ সালে গ্রেট বৃটেন তার রফতানি বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য মুদ্রামান হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতীয় মুদ্রা বৃটিশ মুদ্রার সঙ্গে মান রক্ষা করত, তাই ভারতও তার টাকার মান হ্রাস করে। পাকিস্তান তার মুদ্রা মার্কিন ডলারের সঙ্গে মান রক্ষা করত। পাকিস্তান তার টাকার মান ঠিকই রাখে। এই নিয়ে ভারতীয় নেতারা পাকিস্তানের উপর বিষম চটে যায় এবং কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার যে পেট্রোল ও কেরোসিন আসতো তা বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আসাম পর্যন্ত রেল চলাচল সুবিধা বাতিল করে দেয়। এমনি ধারা ব্যবস্থা ও পাল্টা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে।

বৃটিশ শাসনামলে যে কলকাতা বন্দরে কলকাতা নগরী গড়ে ওঠে—কৃষি প্রধান বাংলাদেশ ছিল তার পশ্চাদভূমি এবং হুগলী নদীর দুই তীরে যে তিন শতাধিক পাটকল গড়ে উঠে বাংলাদেশের পাটই ছিল তার প্রধান নির্ভর। দেশ বিভাগের পর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী নেতারা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হন যে, স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হলে সমুদ্র বন্দরের উন্নয়ন সাধন করতে হবে এবং বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ পাট, কাঁচা পাট হিসেবে রফতানি করার পরিবর্তে পাটজাত দ্রব্য তৈরী করে তা রফতানি করতে হবে। এটা আমরা সবাই জানি যে, বাংলাদেশে একটিও পাটকল না থাকার অবস্থা থেকে (১৯৫২—১৯৬৯ পর্যন্ত) এই অঞ্চল অবহেলার শিকার হওয়া সত্বেও পাট কল স্থাপিত হয় মোট ৭৬টি। বস্ত্রকল স্থাপিত হয় ৫৯টি এবং চিনি কলের সংখ্যা দাঁড়ায় আগের

www.pathagar.com

৪টি সহ ১৪টি। এ ছাড়া ইস্পাত কারখানা, রাসায়নিক কারখানা, কাগজ কল, ঔষধের কারখানা, চামড়া ও জুতার কারখানা এবং এর সঙ্গে ফিডিং কারখানা স্থাপিত হয় অনেক।

১৯৭১ সালে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এ দেশের শিল্পায়ন অনেক দ্রুত গতিতে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তৎকালীন বাংলা দেশ সরকারের ইচ্ছাকৃত বা ভ্রান্ত নীতির দরুন সে সম্ভাবনা বহুলাংশে বিনষ্ট হয়েছে। বর্তমানে ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব দেশকে শিল্পায়িত করার পথে অবশ্য যথেষ্ট বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কিন্তু সাবেক সরকার সমূহের ভ্রান্তনীতি ও অদূরদর্শী কার্যকলাপের ফলে শিল্প পণ্যের আভ্যন্তরীণ বাজার ইতিমধ্যেই অনেকটা বে-দখল হয়ে গেছে বিদেশের পণ্যের দ্বারা এবং বিদেশের বাজারে আমরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীদের দ্বারা কোনঠাসা হয়েছি সাংঘাতিকভাবে।

বর্তমান বাংলাদেশ যে কোন শিল্পোন্নত দেশের পক্ষেই একটা লোভনীয় বাজার। এদেশের জনসংখ্যা বিপুল আর অর্থনীতিও কৃষিভিত্তিক। উঠতি শিল্প সমৃদ্ধ দেশ বা দেশগুলো চায় না দেশটা শিল্প সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। তারা চায়, বাংলাদেশ বরাবরের মত প্রাথমিক পণ্য রফতানি-কারক দেশ হিসাবেই থেকে যাক। বর্তমানে বিদেশের বাজারে আমাদের প্রতিযোগিতা করার মত একমাত্র পাটজাত পণ্য ছাড়া বিশেষ আর কিছুই নেই। বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের সম্ভাবনা ছিল অতি উজ্জ্বল কিন্তু নানা ভ্রান্তনীতি ও পদক্ষেপের দরুন বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্প লাটে উঠতে বসেছে এমনকি বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন বাজারও ছেয়ে গেছে বিদেশী বস্ত্রে, বিশেষ করে ভারতীয় বস্ত্রে।

বাংলাদেশের কাপড়ের বাজার ভারতীয় শাড়ীতে ছেয়ে গেছে—এই বিষয়টাকে কোন ভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। কেননা বিদেশী বস্ত্রের এই বন্যার তোড়ে আমাদের নিজস্ব বস্ত্র শিল্প বন্ধ হবার পথে। ইতিমধ্যে প্রায় সোয়া দু'লাক তাঁত বন্ধ হয়ে গেছে এবং বস্ত্রকল সংস্থার গোডাউনে লাখ লাখ গজ কাপড় বিক্রির প্রতীক্ষায় মওজুদ হয়ে আছে। ক্রেতা নেই, দাম বেশী—ফিনিশিং নিম্নমানের। সবচেয়ে পরি-তাপের ব্যাপার হলো, বাংলাদেশের বাজারে ভারতীয় বস্ত্র কোন প্রটোকলের মাধ্যমে আসছে না। আসছে চোরা পথে। দেশের সরকার

www.pathagar.com

ঐ চোরাকারবার বন্ধ করতে এখনও সমর্থ হননি। বস্ত্রকল সংস্থার পক্ষ থেকে বহু রঙের অজস্র পোস্টার ছাপিয়ে দেশবাসীর প্রতি স্বদেশের পণ্য কিনে ধন্য হবার আহবান জানানো হয়েছে বার বার কিন্তু সে আহবানে বিশেষ কেউ সাড়া দিয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ ভারতীয় বস্ত্র কেনা বেচার প্রবণতা কমেনি বরং বেড়েছে। বাংলাদেশের বাজারে প্রতিবছর কতখানা করে শাড়ী কেনা বেচা হয় সরকারের কাছে নিশ্চয়ই তার কোন হিসাব নেই। তবে বেসরকারী হিসাবে জানা যায়, প্রতিবছর কম করে হলেও তিন কোটি পিস ভারতীয় ছাপাশাড়ী বেচা কেনা হয়। এর দ্বারা লাভবান হচ্ছে কে? চোখ বুজে বলা যায় ভারতীয় শিল্পপতি আর বস্ত্র মালিকরা। আর এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কে? এর জবাবও দেয়া যায় চোখ বুজে—বাংলাদেশের অর্থনীতি। বাংলাদেশের কাপড়ের বাজার ভারতীয় বস্ত্র মালিকেরা দখল করে নিলে দেশের অর্থনীতি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়—আশা করি তা ব্যাখ্যা করে বলার কোন দরকার নেই।

বাংলাদেশকে প্রতি বছর গড়ে তিন কোটি পিস চোরা পথে আসা ভারতীয় কাপড়ের মূল্য শোধ করতে হচ্ছে মূল্যবান (Cashcrop) পাট ও বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানি করা বিদেশী পণ্যের মাধ্যমে। চোরাচালান পৃথিবীর সব দেশেই কম-বেশী হয়ে থাকে কিন্তু জাতীয় অর্থনীতির বিপর্যয় এমন মারাত্মক চোরাচালান বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে হয় বলে আমার জানা নেই। অন্য দেশে চোরাচালানের ফলে সংশ্লিষ্ট দুই দেশের সরকার আমদানি রফতানির দরুন প্রাপ্য শুল্ক থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে ব্যাপারটা হচ্ছে আত্মঘাতী। সীমান্তপথে বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম পণ্য পাট এবং বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানি করা বিভিন্ন পণ্য আর অপর দিক থেকে শুধু আসছে শিল্পজাত পণ্য। বাংলাদেশ হবার পর বাংলাদেশের বাজার এইভাবে ভারতীয় শিল্পপতিদের প্রায় দখলে যাবার ঘটনা আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করেছি। সাবেক সরকারগুলো এই অবস্থা মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দেশপ্রেমিক জনসাধারণ চোরাচালান দমনের প্রত্যেকটা খুচরো প্রচেষ্টার শোচনীয় ব্যর্থতা দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছে কিন্তু কিছু করতে পারেনি। অপরপক্ষে ভারতীয় নেতারা দুই দেশের অর্থনীতির মধ্যকার পরিপূরকতা নিয়ে অনেক শ্রুতিমধুর বক্তব্য প্রচার করেছেন—কিন্তু এই পরিপূরকতার একটা

www.pathagar.com

অর্থই আমাদের বোধগম্য হয়েছে তা হলো ভারতীয় শিল্পপণ্যের ধাক্কায় আমরা একদিকে নিঃশেষিত হয়েছি আর অন্যদিকে তারা হয়েছে ক্রমাম্বয়ে স্ফীত। কাজেই দুই দেশের অর্থনীতির পরিপূরকতার কথায় আনন্দবোধ করলেও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি না। ভারতীয় নেতারা আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আকাংখা করেন না কথাটা সৌজন্য সম্মত নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার স্বাভাবিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করে সুজলা-সুফলা বাংলাদেশকে প্রায় মরুভূমিতে পরিণত করে কারা অভিযোগটাকে ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত করতে চলেছেন, এটাই দুঃখ। এ দুঃখ দূর হলে আমরা প্রকৃত অর্থেই আনন্দবোধ করব। বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি যত অপরিবর্তিত থাকবে শিল্প সমৃদ্ধ দেশের ততই লাভ। এই সত্যটা যদি ভারতের জন্য প্রযোজ্য না হয়, তাহলে এই সত্যটাও প্রমাণিত হতে হবে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের বিকাশ ভারত যথার্থই আকাংখা করে। তার জন্য সীমান্ত চোরাচালান সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। গঙ্গার পানি প্রবাহ বাংলাদেশের জন্য মুক্ত করে দিতে হবেএবং আঙ্গরপোতা, দহগ্রাম ও তালপট্টি দ্বীপসহ যতগুলিদ্বি-পাক্ষিক সমস্যা আছে সব মিটিয়ে ফেলতে হবে এবং ফারাক্কাসহএসব সমস্যা জিইয়ে রেখে আমাদের উপর মুখে পরিপূরক অর্থনীতির কথা বলা যুক্তিযুক্ত মোটেই নয়।

আমরা জানি, বর্তমান বিশ্ব অসমবিকাশের নিয়মানুসারে এক জাতির অর্থনীতির সঙ্গে অন্য জাতির অর্থনীতি যতটা পরিপূরক, ক্ষেত্র বিশেষ তার চেয়ে অনেক বেশী দ্বন্দ্বমূলক। ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও শিল্প ক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশমান একটি আধুনিক রাষ্ট্র এবং তার অর্থ-নীতি সমাজতান্ত্রিক নয়—ধনবাদী, পৃথিবীর অন্যান্য ধনবাদী রাষ্ট্রের মত ভারতেরও প্রয়োজন তার শিল্পপণ্যের জন্য স্থায়ী বাজার এবং অফুরন্ত উৎসের। অপরপক্ষে বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী যে কোন কৃষিভিত্তিক দেশের মত বাংলাদেশেরও আকাংখা রয়েছে শিল্প বিকাশের। বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত প্রধান শিল্প হলো পাট শিল্প। এই পাট শিল্পের ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, পরিপূরক নয়। বাংলাদেশে পাট শিল্প বিকাশের এখনও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, এখনও সে বিশ্বের বাজারে ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ বেল কাঁচা পাট রফতানি করে থাকে। বাংলাদেশের পাট শিল্প আশানুরূপ বিকশিত হলে

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। বস্ত্র শিল্পের ব্যাপারে বাংলাদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার বিপুল সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সে সম্ভাবনা বিনষ্ট হচ্ছে। বাংলাদেশের বিশাল বস্ত্র বাজার এখন কার্যত ভারত ও জাপান প্রমুখ শিল্পোন্নত দেশের দখলে, বাংলাদেশের বস্ত্র বাজার হাতছাড়া হোক—এটা স্বভাবতই তারা চায়না।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেকার শীর্ষ সম্মেলনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী দুই দেশের মধ্যে যুক্ত অর্থ-নৈতিক ও কারিগরি কমিশন প্রতিষ্ঠায় খুব সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন "এতে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক আরও জোরদার হবে এবং উন্নয়ন প্রয়াসে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সম্পূরক ও পরিপূরণমূলক সহযোগিতা বাংলাদেশ ও ভারতের মত নিকট প্রতিবেশীর জন্য যথার্থ হবে।"

বর্তমান আলোচনায় আমি বাংলাদেশ ও ভারতের পরিপূরণমূলক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও সমস্যার উপর কিঞ্চিত আলোকপাত করেছি। তবে এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, সদিচ্ছা থাকলে বৃহৎ কোন প্রতিবেশী দেশ তার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার দেশের অর্থনীতিতে পরিপূরণমূলক উপাদান সংযোজিত করতে পারে। রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে, স্বাভাবিক বৈরী দ্বন্দ্বকে অবৈরী দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত করা। অবশ্য নিকট ও দূর অতীতে ভারত সে রকম কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে না পারলেও ভবিষ্যতে পারবে না, এমন মনে করা উচিৎ নয়। তবে সমকালীন বিশ্বে সীমিত স্বাধীনতা ও যৌথ সার্বভৌমত্ব তথা পরিপূরক অর্থনীতির যে তত্ত্ব যে বিশেষ একটি পরাশক্তি তার আশ্রিত ও সহযোগী দেশসমূহের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—ঘটনাচক্রে ভারত তার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ। আমাদের ভয় হয়, শেষ পর্যন্ত শ্রীরামের সঙ্গে সুগ্রীবও না এসে যায়। পূর্বাঞ্চলে চীনের বিরুদ্ধে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের বৃহত্তর পরিকল্পনার ফাঁদে পড়ে আমরা ফেঁসে না যাই সেদিকে আমাদের দৃষ্টি অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।

২২৯ পৃঃ দেখুন

দৈনিক সংগ্রাম ১৩-১০-৮২

www.pathagar.com

হিংসা

চার-স্তম্ভ

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি রিপু শাসিত জীব হলো, মানুষ। এমন আদমজাত খুব কমই আছে যে, এই রিপুসমূহের অধীন নয়। অথচ আমরা আদম জীবন বলতে সেই জীবনকেই বুঝি যে, জীবন রিপুর দাস নয়। কিন্তু সে রকম জীবন লাভ কি যথার্থই সম্ভব?

প্রশ্নটা খুবই পুরাতন। মানুষের সভ্যতার প্রায় সমান বয়সী তবে এই প্রশ্নটার জবাব মানুষ আজও খুঁজে পায়নি তা কিন্তু নয়। বিশেষ বিশেষ মানুষ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে (ধ্যান ও অনুশীলন) রিপুর দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করতে পেরেছেন কিন্তু নির্বিশেষ মানব সমাজ রিপুর অধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। অর্থাৎ এই সত্যটা এখনো সার্বজনীন যে, যতদিন মানুষের জীবন আছে ততদিনই রিপুর প্রাধান্য আছে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা প্রজ্ঞার একটা বিশেষ উচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারলে সেখানে আত্ম ও পর-এর মধ্যে অভেদ অনুভূত হয় সেখানে রিপুর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয় ব্যক্তি মানুষ। যাদেরকে আমরা সমাজে চলতে ফিরতে দেখি, নানারূপ অর্থকরী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যারা জীবিকার সংস্থান করে বিবাহের মাধ্যমে যারা মানুষের বংশবৃদ্ধি করে, সন্তান পালন করে, সন্তানের ভবিষ্যৎ নিষ্কন্টক করার জন্য যারা বিষয় সম্পত্তি করে সেই সব সম্পত্তিচেতন সাধারণ মানুষ কখনও রিপুর দাসত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। কারণ প্রকৃতির গতি বা কর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চলেছে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই রিপুই হলো জৈবিক প্রবনতা এবং এই জৈবিক প্রবনতাই হলো জীবনের অভিব্যক্তি।

তা হলে কি আমরা বলবো, সাধারণ মানুষের জীবন কেবল মাত্র ষড়রিপুর দ্বারাই পরিচালিত হয়—এই রিপুসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কোন শক্তি সাধারণ মানুষের আয়ত্তে নেই? না, আমরা তা বলতে পারিনে। আমরা জানি, সবাই জানেন, সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র ষড়-রিপুর দ্বারাই পরিচালিত হয় না, ষড় রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার মাঝে একটা শক্তি কাজ করে, সে শক্তিকে বলা হয় বিবেক, ভাল ও মন্দ সম্পর্কে জ্ঞান। এই বিবেককেই কখনো কখনো বলা হয় মূল্যবোধ।

www.pathagar.com

ষড় রিপুর নিয়ন্ত্রক এই বিবেক বা মূল্যবোধ মানুষের দেহেরই ধর্ম কিনা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। আধ্যাত্মবাদীদের দাবী অনুসারে মানুষের মধ্যেকার এই বিবেক বিধি দত্ত। ইদানিংকালে মানুষ আল্লাহকে যত ভুলে যাচ্ছে মানুষের মধ্যেকার বিবেকও ততই নির্জীব হয়ে পড়ছে। শুধু-মাত্র পৃথিবীতে আপন আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্য নিউট্রন বোমার মত নিদারুন লোকক্ষয়কারী মারনাস্ত্র তৈরী ও মওজুদ করতেও মানুষের বিবেকে বাধছে না। কথাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। মানুষ যত খোদাকে ভুলে যাচ্ছে ততই হারাচ্ছে বিবেককে আর অধীন হয়ে পড়ছে নফসের ষড় রিপুর।

বাংলাদেশের মানুষের বিবেকের এই মৃত্যু আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করছি। আমরা লক্ষ্য করছি মানুষ ক্রমেই জিঘাংসা পরায়ন হয়ে উঠেছে। দিন দিন মানুষের হিংসাবৃত্তি এতই তীব্র হয়ে উঠেছে যে, দুজন মানুষের মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটির ফলেই উত্তেজনা চরমে উঠে যাচ্ছে এবং একজন অন্য জনের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে কিছু মাত্র দ্বিধা করছে না।

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান মানুষের মধ্যেকার এই জিঘাংসা বৃত্তির নানা রকম ব্যাখ্যা দিতে পারে। কিন্তু আমরা অতিশয় উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সমাজ পতিরা এই জিঘাংসা বৃত্তির অপনোদনের চেষ্টা না করে তা নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। হিংসায় হিংসা বাড়ে এটা একটা সাধারণ সত্য। যে কোন একটা রাজনৈতিক বা সামাজিক ইস্যুকে উপলক্ষ্য করেই পক্ষে-বিপক্ষে বিস্তর লোক জমে যাচ্ছে এবং পরস্পরের মধ্যে হানাহানিতে মেতে উঠছে। যত দিন যাচ্ছে ততই এই পরিস্থিতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ নিরীহ মানুষের ধন ও প্রাণের নিরাপত্তা ক্রমেই বিপন্ন হয়ে উঠছে।

সম্প্রতি একটি দৈনিক কাগজে প্রকাশিত একটি খবরের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। খবরটি হলো, এক কোটি টাকার মাদক দ্রব্য আটক। একটি সামুদ্রিক জাহাজের গোপন কক্ষে এই বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং মাদক দ্রব্য পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি করার জন্য। বাংলাদেশে মাদক দ্রব্য সেবীর সংখ্যা এত বিপুল! কথাটা জানা জানি হবার আগে ধারণা করাও সম্ভব

www.pathagar.com

ছিল না। বাংলাদেশের মত একটা ছোট দেশে এত টাকার মাদক দ্রব্য বিক্রি হতে পারে!

অনেকেই জানেন মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সামাজিক অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধির একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। আমাদের দেশে সামাজিক অপরাধের ঘটনা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে সংগঠিত অপরাধের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের জন্য দায়ী দেশের তরুণ সমাজ। এবং পুলিশের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে এসব তরুণদের অধিকাংশই মুসলমান বিত্তবান ঘরের ও এদের প্রায় সবাই মাদক দ্রব্য সেবী। আমাদের এতদিন জানা ছিল, দেশের নিম্নস্তরের কিছু লোক গাঁজা, ভাঙ আফিম ও দেশী মদের সাহায্যে নেশা করে থাকে। খুব সামান্য পরিমাণ আফিম ছাড়া আর সব দেশেই তৈরী হয়। যারা বিলাতি মদ খেয়ে নেশা করেন তারা পারিবারিক অশান্তির কারণ হলেও সচরাচর সামাজিক অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় না। কিন্তু ইদানিং আমাদের সে ধারণা পাল্টাতে হচ্ছে। যারা গাঁজা, ভাঙ, দেশীয় মদ ও আফিম খেয়ে নেশা করে তারা আধুনিক মাদক দ্রব্যের নামও জানে না। যে এক কোটি টাকার মাদক দ্রব্য বিদেশ থেকে চোরাচালান হয়ে আসছিল তার মধ্যে রয়েছে উন্নত ধরণের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রস্তুত বিভিন্ন রকমের ড্রাগস্। এর মুর্ছাজনন ক্ষমতা এতই তীব্র যে অনভ্যাসে এর একটা মাত্র ক্যাপসুল খেলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাদক দ্রব্য সেবী তরুণরা নেশার জন্য দিনে ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ক্যাপসুল খেয়ে থাকে।

মানুষের মধ্যে হিংসাবৃত্তি বাড়ছে এই মন্তব্যটা যত সহজে করা যায় তত সহজে কেন বাড়ছে তার উত্তরটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা কতক গুলি ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি। মানুষের মধ্যে হিংসাবৃত্তি বাড়ছে। সমাজে অপরাধ প্রবনতা বাড়ছে। ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে। এই তিনটি ঘটনার কোনটা কোনটার কারণ তা আমরা বলতে পারবো না কোনটা কোনটার ফল তাও জানি না। তবে এই তিনটাই যে পরস্পর সম্পর্কিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং এমনও হতে পারে যে, সমাজে বিদ্যমান এই তিনটি প্রবনতারই জন্ম সমাজেরই একটা উৎস থেকে যার সন্ধান আমরা অনেকেই জানি না। যাঁরা বলছেন,

www.pathagar.com

খোদাকে ভুলে যাওয়াই এর কারণ তাঁরা কেবল আর একটি সামাজিক প্রবনতার কথাই বলছেন কিন্তু খোদাকে মানুষ কেন ভুলে যাচ্ছে তা তাঁরাও বলতে পারছেন না কেন ?

আমরা এই ১৯৮১ সালে বাংলাদেশকে একট ভয়াবহ অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। একটা সিগারেটে আগুন জ্বালানো আর একটি যাত্রী বোঝাই চলমান বাস এর গায়ে আগুন লাগানো এই দু'টি ঘটনার মধ্যে এখানে কোন পার্থক্য নেই। এ হিসাব করার মত কারো কোন সময় নেই যে, যে বাসটা পোড়ানো হচ্ছে তার মালিক দেশের জনগণ, সরকার নয়। দশ বিশটা বাস পুড়িয়ে দিলে সরকারের কোন ক্ষতি হয় না। যারা হিংসার উত্তেজনায় বাস-এর গায়ে আগুন লাগায় তারা জানেও না যে, সরকার হলো জনগণের কাঁধে সওয়ার হওয়া একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

জাতীয় সম্পদের অপচয় ঘটালে তার দায় শেষ পর্যন্ত জনগণকেই বহন করতে হয়। সরকারকে বড়জোর ব্যবস্থাপনার জন্য কিঞ্চিৎ ঝামেলা পোহাতে হয় মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। মানুষের মধ্যেকার এই হিংসা যেসব সামাজিক উপাদানকে আশ্রয় করে উন্মাদ হয়ে উঠছে, আমাদের মনে রাখা দরকার সেই উপাদানগুলির জন্ম এই সমাজেই। সমাজের যাঁরা প্রতি তাঁরা তাদের পতিত্ব রক্ষা করার জন্য কিংবা আরো সঠিকভাবে বললে বলতে হয়, সমাজে তাদের কর্তৃত্বের পরিধি আরো বিস্তৃত করার জন্য এ উপাদানগুলি লালন-পালন করছেন তাঁরাই। সমাজে তারুণ্য একটি শক্তি। এ শক্তির গঠনমূলক ব্যবহার যেমন করা যায় তেমনি একে ধ্বংসাত্মক কাজেও লাগানো যায়। বলা বাহুল্য আমাদের দেশের ক্ষমতাসীন শাসকরা আমাদের তারুন্যের এই শক্তিকে দেশ গঠণের কাজে সঠিকভাবে ব্যবহার করার চিন্তা কখনো করেননি। দেশে যুব মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু যুব শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য তাদের কোন সঠিক পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয় না। তারা যুব শক্তির তরফ থেকে সব সময় কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের ভয়ে অস্থির থাকেন। কাজেই দেশ গঠণের কাজে যুব শক্তির সঠিক ব্যবহারের পরিবর্তে তাদেরকে নিজেদের পক্ষে রাখার প্রয়োজনে তাদের এটা ওটা দিয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা চালান। সম্প্রতিককালে গ্রামাঞ্চলের হাট-

www.pathagar.com

বাজারের খাজনা আদায়ের দায়িত্বে গ্রামীন যুবকদের নিযুক্ত করা এরূপ একটি পদক্ষেপ। এ কাজের পেছনে যুক্তি যাই দাঁড় করানো হোক, যে কোন বিবেকবান লোকই স্বীকার করেন এর ফলে গ্রামীন যুবকদের নেতৃ-স্থানীয় অংশকে অধঃপতিত করার রাস্তাই পরিস্কার করা হয়েছে।

যুব শক্তিকে যে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোস্তাফিজুর রহমান ও স্বীকার করেছেন। গত ৪ঠা অক্টোবর টাইগার ইন্টারন্যাশনালের সমাবেশে তিনি বলেছেন সঠিক ভাবে পরিচালনা না করার জন্য যুব সমাজ বিপদগামী হয়ে পড়ে। ঐ একই সমাবেশে ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন অভিযোগ করেছেন, যুব শক্তির প্রতি আমাদের সরকারের দৃষ্টি ভঙ্গি ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

আমরা লক্ষ্য করছি, দিন দিন যুব সমাজের মধ্যে জিঘাংসা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের দায় দায়িত্ব নিয়ে আমরা নতুন করে আর কোন অভিযোগ তুলতে চাই না তবে হিংসাকে মহত্বের আবরণ পড়িয়ে এবং শ্রেণী বিশেষের প্রতি শ্রেণী বিশেষের তথাকথিত শ্রেণী হিংসা কাজে লাগিয়ে যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়, যে কারণেই হোক সরকারও তাদের পদাংকই অনুসরণ করছেন। দেশে যতগুলি রাজনৈতিক দল আছে ততগুলি শ্রেণী নিশ্চয় দেশে নেই। তথাপি এক দলের প্রতি অন্যদল শ্রেণী হিংসা প্রচার করে চলেছে। বেওকুফের হিংসার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের তত্ব ইসলাম স্বীকার করে না। অথচ আমাদের দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক ইসলামে বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও এখানে হিংসাশ্রয়ী রাজনীতিই প্রচারিত ও প্রসারিত হচ্ছে বা হতে পারছে। ইসলাম সহ অন্যান্য ধর্মেও বলা হয়েছে, মানবিক বৃত্তি নিচয়ের মধ্যে হিংসা বৃত্তি জঘণ্যতম। অথচ আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি যুব সমাজের স্বাভাবিক প্রতিবাদ স্পৃহাকে হিংসায় রূপান্তরিত করতে একটুও দ্বিধাবোধ করছে না। আধুনিক ধনতন্ত্রের কদর্য পটভূমিকায় নিরিশ্বরবাদী বস্তু তন্ত্র মানুষের পরিচ্ছন্ন চিন্তাকে আচ্ছন্ন করছে। ভালবাসা ঈর্ষায় পরিণত হচ্ছে। আমরা আদর্শগতভাবে ইসলামের মহান সাম্যবাদ (রবুবিয়ত) থেকে বিচ্যুত হয়ে শয়তান প্রদর্শিত নফছানিয়তের চর্চায় মেতে উঠেছি। ইসলাম যে খানে ব্যক্তির স্বার্থের চেয়ে মিল্লাতের স্বার্থকে বড় করে দেখেছে

www.pathagar.com

আমরা সেখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী ভ্রান্ত দর্শনের প্রভাবে দিন দিন অধঃপতনের দিকে ধেয়ে চলেছি। ব্যক্তির সামান্য লাভের বিনিময়ে মিল্লাতের নিদারুন ক্ষতি করতেও দ্বিধাবোধ করছিনে। এরই মধ্যে আমরা আমাদের প্রকৃত জাতি সত্বা হারিয়েছি, হারিয়েছি কৃষ্টি ও ঐতিহ্য এবং দেশটাকে স্থাপন করছি ভিন্নতর চারটি স্তম্ভের উপর (১) হিংসা, (২) ষড়যন্ত্র, (৩) সন্দেহ (৪) অবিশ্বাস। জানি না আমাদের এ চলার শেষ কোথায়।

দৈনিক সংগ্রাম
২৮-১০-৮১

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ

প্রখ্যাত রবিন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী মরহুম জাহেদুর রহিমের স্মরণে বাংলা একাডেমীতে তিন দিন ব্যাপী রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলন সম্প্রতি শেষ হয়েছে। সম্মেলনের শেষ দিনে গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। তিনি তার ভাষণে সংস্কৃতি ও রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। "সংস্কৃতির মধ্যে একটি বিপুল জনগোষ্ঠী আত্মার সম্পদ খুঁজে বেড়ায়।" "রবীন্দ্র সঙ্গীতের সংস্পর্শে এসে আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথকেই পাইনা, একটি জাতির প্রাণস্পন্দনও শুনতে পাই।"

অধ্যাপক সিদ্দিকীর এ সব মন্তব্যে সংস্কৃতি সম্পর্কে এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে তার ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে। বুঝা যাচ্ছে সংস্কৃতিকে যারা জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার বলে মনে করেন তিনি তাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং রবীন্দ্রনাথকে যারা বিদেশী কবি বলে মনে করেন তিনি তাদের দলেরও নন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সংস্পর্শে এসে যে জাতির প্রাণের স্পন্দন তিনি শুনতে পান—ভাবজগতে যে জাতির সঙ্গে তিনি হয়তো একাত্ম কিন্তু যে জাতির সঙ্গে তিনি বাস করেন, রবীন্দ্র সঙ্গীতে সেই জাতির সংখ্যাগরীষ্ঠের প্রাণ যে আদৌ স্পন্দিত হয় না দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সংবাদটা অধ্যাপক সিদ্দিকী হয়তো রাখেন না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষার বিশ্ববরেন্য শ্রেষ্ঠ কবি—তাতে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলা দেশের জাতীয় কবি কিনা তা নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। এ বিতর্ক ষাঠের দশকে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের রাজনৈতিক অবস্থান এই দেশের সংখ্যা গুরুজনগণের সঙ্গে সমতলে ছিলনা। তাই পরবর্তীকালে তাদের রাজনৈতিক পরাজয়ের পর ধরে নেয়া হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বক্তব্যের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়েই গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় কবির আসনে চিরকালের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন? বলা বাহুল্য এ ধারণা সঠিক ছিলনা।

www.pathagar.com

এ কথা স্বীকার করাতে কোন দোষ নেই যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক কবি। রবীন্দ্রনাথের মনের দুর্লভ ভাবগুলি যে সব বাণীর আশ্রয়ে কবিতা হয়ে উঠেছে সে বাণী জনবোধ্য নয়। আদৌ নয়। রবীন্দ্রনাথের গান যে সুরে গীত হয়—সে সুরও গণমানুষের হৃদয়ে কোন স্পন্দন সৃষ্টি করে না। গ্রামাঞ্চলের একশ' জন নিবিষ্ট শ্রোতার মধ্যে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে ও ভাবে মুগ্ধ হবার মত শ্রোতা একজনও আছে কিনা সন্দেহ। রেডিও বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের অনুষ্ঠানে যখন রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশিত হয় তখন সাধারণ শ্রোতা রেডিও বন্ধ করে দেয় অথবা নিজেদের মধ্যে আলাপে মশগুল হয়। শহর ও গ্রামের বিদগ্ধজন এর জন্য নিরতিশয় বিরক্তি-বোধ করতে পারেন কিন্তু এটাই বাস্তব। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের কিছু শিক্ষিত ও উপর তলায় বসবাসকারী রুচিশীল জনগোষ্ঠীর একাংশের কবি এবং রবীন্দ্র-নাথের কবিতার এক পঙক্তি না পড়েও যারা রবীন্দ্ররচনাবলীর বাঁধানো ভলিউম বৈঠকখানায় আলমারিতে সাজিয়ে রাখেন, যাদের ঘরের মেয়েরা বিয়ের আগের প্রস্তুতি হিসেবে রবীন্দ্র সঙ্গীতে গলা সাধাসাধি করে রবীন্দ্র-নাথ তাদেরও কবি।

আমার এই বক্তব্যে অনেক রবীন্দ্রভক্ত ক্রুদ্ধ হতে পারেন এবং এই বিশ্বাস মনে মনে আরও জোরে আঁকড়ে ধরতে পারেন যে, এই মুমূর্ষু জাতি এখনো বাঁচে, যদি রবীন্দ্রচর্চায় উদ্যোগী হয় কিন্তু এই ধারণা একেবারেই ভুল। কারণ রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কৃতির ধারক সে সংস্কৃতি পরশ্রমজীবি তথাকথিত ভদ্রলোকদের সংস্কৃতি বলেও নয়, সে সংস্কৃতির কোন লোকায়ত সম্ভাবনা নেই। আমি জানি বাংলাদেশের রবীন্দ্র অনু-রাগী অগ্রণী বিদ্যানরা মনে মনে এই ক্ষুব্ধ সংকল্প পোষণ করেন যে, ব্যাপক রবীন্দ্র চর্চার মাধ্যমে তারা একদিন এ দেশের বিপর্যস্ত মূল্য-বোধ পুনরুদ্ধার করতে পারবেন এবং "অপসংস্কৃতির" আগ্রাসনকে রবীন্দ্র অস্ত্রেই প্রতিরোধ করতে পারবেন। তাদের এ প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা থাকলে যথার্থই খুশীর ব্যাপার হতো কিন্তু তা হবার নয়। দেশের সংখ্যাগরীষ্ঠ জনগণের অর্থনৈতিক সংগ্রাম ও আশা আকাঙ্খা যে সংস্কৃতিকর্মের মধ্যে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না কিংবা যে

www.pathagar.com

সংস্কৃতির মধ্যে সংখ্যাগরীষ্ঠ জনগণ তাদের বৈষয়িক ও আত্মিক জীবন সংগ্রামের প্রেরণা খুঁজে পায় না, তাকে যদি অপসংস্কৃতি বলতে হয় তাহলে রবীন্দ্র অস্ত্রে সে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কেননা রবীন্দ্রনাথ ও যথার্থ বিচারে ঐ কাতারেই পড়েন। অবশ্য রবীন্দ্র ভক্তদের এ দাবী কেউ অস্বীকার করেন না যে, রবীন্দ্র চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তির রুচি মার্জিত হয়, রসবোধ সূক্ষ্ম হয় এবং উপলব্ধি পরিশীলিত হয় কিন্তু যেহেতু ব্যক্তি নিয়েই সমাজ কাজেই রবীন্দ্রচর্চা যত ব্যাপক হবে সমাজ ততই উপকৃত হবে, বলা বাহুল্য নয় যে, এই তত্ত্ব গান্ধীজির 'হৃদয় পরিবর্তন' তত্ত্বের মতই নিষ্ফল আর ভ্রান্ত। কোন জাতির একাংশে কোন কারণে যদি লাম্পট্য ব্যবহার হঠাৎ বেড়ে যায়, তা যেমন বেলের পাতার রস সেবনের ব্যবস্থাপত্র প্রচার করে সারানো যায় না তেমনি রবীন্দ্র সাহিত্য ও কাব্য পাঠের ব্যাপক আবেদন জানিয়ে আর ঘন ঘন রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসর বসিয়ে জাতির রুচিকেও পরিশীলিত করা যায় না, মূল্যবোধের পুনরুদ্ধারও সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ অপসংস্কৃতির আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে হলে গণসংস্কৃতির অস্ত্রেই তা করা সম্ভব। আর সাধারণ জনগণের বোধের আওতায় জনগণের কাতারে-রবীন্দ্রনাথকে কোন দিনই নামিয়ে আনা যাবে না তা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া উন্নত রুচির অধিকারী রবীন্দ্রভক্তদের এটা খুবই কর্ণকটু সংবাদ যে, এদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক মুসলমান। যাদের ঈমান ও আকিদার সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতির দার্শনিক বৈপরীত্ব প্রায় আগুন আর পানির। কোন জয়ীফ ঈমানদারের পক্ষেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা সম্ভব নয় যে, "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে।" এ কথা সর্বাস্বীকৃত যে, নানা দুর্ভাগ্যজনক কারণে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ দেশী-বিদেশী মুষ্টিমেয় পরশ্রম-জীবীর সীমা লংঘন প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। তারা তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও আকিদা নিয়ে আর অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারছে না। বহুযুগের অর্জিত মূল্যবোধ ভেঙে গুড়ো গুড়ো হয়ে যাচ্ছে। এ দিকে জাতির বিবেক বলে পরিচিত যে শিক্ষিত সমাজ তার বৃহদাংশও আজ আত্মসমর্পন করে বসে আছে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর কাছে। জানি না এ আত্মবিস্মৃতির শেষ কোথায়।

www.pathagar.com

এবারে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলনে আগত গুণীজনেরা রবীন্দ্র সঙ্গীতের সংস্পর্শে এসে যে জাতির প্রাণস্পন্দন শুনতে পেয়েছেন, জানি না সে এক মহাহিন্দু রাজ্য পাশে আবধ্য মহাভারতীয় জাতি কিনা। এ কথা প্রসিদ্ধ যে, শ্রী রবীন্দ্রনাথ একদা এক মহাহিন্দু রাজ্যপাশে মহা-ভারতীয় জাতিসত্বাসমূহকে আবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে সে স্বপ্ন দেখার লোক ভারতে এখনো কম নেই বরং ভারতের শাসন দণ্ড যারা পরিচালনা করেন আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী এক মহা-ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তারা আজো ছাড়তে পারেন নি। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের সেই আকাঙ্খার স্বপ্নের সঙ্গে জাতি হিসাবে আমাদের আকাঙ্খার যথেষ্ট বিরোধ রয়েছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে যে জাতির প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হয়—সে জাতি আমরা নই, কোন দিন সে জাতি হয়ে উঠতেও আমরা চাইনে।

বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ কৃষিজীবী—রবীন্দ্রনাথের বিপুল সাহিত্যকর্মের মধ্যে এই কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর আশা আকাঙ্খা কোন দিন প্রতিফলিত হয়নি—এই বহুকথিত অভিযোগ এনে রবীন্দ্রনাথকে আমরা নাকচ করতে চাইনে। রবীন্দ্রনাথ এখন ক্লাসিক্স-এর মর্যাদা লাভ করেছে। আমরা জানি এই চিরায়ত সাহিত্য কর্মের জন্য রবীন্দ্রনাথকে যদি তার প্রাপ্য সম্মান না দিই আমরা নিজেরাই অশ্রদ্ধেয় হয়ে যাব। কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে কিংবা তাঁর সুললিত কবিতার মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণস্পন্দন শুনতে যাই তাহলে জাতি হিসাবে আমাদের কপালে নিজেদের হাতেই লানত তুলে দেয়া হবে। আত্মবিস্মৃতি ঘটেনি এমন কে আছেন, যিনি এ অবস্থা মেনে নেবেন!

রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলনের ঘোষনাপত্রে বলা হয়েছে.—শিল্পীরা যদি সামাজিক দায়িত্ব থেকে দূরে সরে থাকেন, তাহলে তারা তাদের অজ্ঞাত-সারেই আত্মহননের পথে পা বাড়াবেন। সুতরাং তাদেরকে সংকীর্ণ চিন্তা চেতনা ও সাম্প্রদায়িক ভাবনা ত্যাগ করেই শাশ্বত সত্যের পথে যাত্রা করতে হবে।" এতক্ষণের আলোচনায় শিল্পীদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা আশাকরি ভালভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। সমাজের উপর তলায় বসবাসকারী একাংশের সঙ্গীত ও কাব্যরুচির চাহিদা পূরণের মধ্যে সংকীর্ণ চেতনা এড়াবার কোনো সুযোগ নেই বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর সাম্প্রদায়িক ভাবনা ত্যাগ করার প্রসঙ্গটা আমাদের বোধগম্য হয় নি। কারণ বাংলাদেশের সংখ্যাগরীষ্ঠ জনগণের বিশ্বাস ও আকিদার পরিপন্থী যে শিল্পকর্ম আমরা মনে করি; সেটাই সাম্প্রদায়িক। এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রবীন্দ্র সঙ্গীত ও কাব্যের মধ্যে শাশ্বত সত্যের পথ অন্বেষণ করবে--এমন আশা করাটা কি বাস্তবসম্মত?

দৈনিক সংগ্রাম ১৩-২-৮২

www.pathagar.com

যৌথ সার্বভৌমত্ব ও সীমিত স্বাধীনতার তত্ত্ব
(আফগান প্রসঙ্গে)

ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদ উভয়দর্শনই এই গ্রহের প্রতিটি মানুষের যা অবিচ্ছেদ্য অধিকার সেই বিধাতা প্রদত্ত স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে। এই মৌলিক বিচ্যুতির জন্য ইতিমধ্যেই ফ্যাসিবাদ ধ্বংশ হয়ে গেছে এবং সাম্যবাদের দেউলিয়াত্বের যে দিকটি নগ্নভাবে সকলের কাছে প্রকাশ পেয়েছে তা হলো—"ইহা যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে দক্ষ কিন্তু নিজেদের জনগণের খাদ্য যোগাতে সক্ষম নয়।"

কথাগুলি দুনিয়ার অন্যতম প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেছেন বলেই যে গুরুত্ব পূর্ণ তা নয় বরং একথাগুলি অন্য যে কেউ বললেও সমান গুরুত্ব বহন করতো। বস্তুতঃ এই দুইটি মতাদর্শই (ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদ) স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং মানুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার বিপরীত এক যৌথ ও সামাজিক স্বাধীনতার তত্ত্ব প্রচার করে। প্রেসিডেন্ট রিগ্যান বলেছেন এই মৌলিক বিচ্যুতির জন্যই ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে ফ্যাসিবাদ চিরকালের মত বিদায় নিয়েছে কি নেয়নি, সেই প্রশ্ন আপাততঃ মুলতুবি রেখে "সাম্যবাদ" সম্পর্কে তার পরবর্তী বক্তব্যটি বিচার করে দেখা যাক।

"ইহা যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে দক্ষ কিন্তু নিজেদের জনগণের খাদ্য যোগাতে পারে না"—মিঃ রিগান এই বাক্যটি বলার সময় নিশ্চয়ই সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সাম্যবাদ অর্থাৎ মানুষে মানুষে সমানাধিকারের তত্ত্ব ও মানব সমাজের যৌথ সার্বভৌমত্বের বুলি মুখে নিয়ে বস্তুত পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে এক আগ্রাসী শক্তি হিসাবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তির দ্বন্দ্বে লিপ্ত, কিন্তু তার জনগণের খাদ্যের জন্য তাকে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গমের বস্তার দিকেই চেয়ে থাকতে হয়। এই বাস্তবতা সত্ত্বেও সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য

www.pathagar.com

করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার আগ্রাসনের থাবা বিস্তার করেছে। চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীর পর তার নগ্ন আগ্রাসনের জঘন্য দৃষ্টান্তটি স্থাপিত হয়েছে আফগানিস্তানে। এই আফগানিস্তানে কি ঘটেছে—আন্তর্জাতিক নানা সংবাদ প্রতিষ্ঠানের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থেকে তা নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয়।

তবে এ কথাটা খুব প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলা যায় যে, সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণকে, সীমিত স্বাধীনতা, যৌথ সার্বভৌমত্ব ও অভিন্ন অর্থনীতির তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে যে পরিমাণ বুলেট খরচ করেছে, সাফল্য লাভ করেছে সেই তুলনায় খুবই কম।

প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক দেশেই যেমন দেশপ্রেমহীন (আপাতত মধুর প্রলোভনে দালাল গোষ্ঠী) টাউটের অস্তিত্ব থাকে, আফগানিস্তানে ও তা কিছু আছে এবং দরিদ্র ও স্বল্প শিক্ষিত দেশ হিসেবে বোধ করি কিছু বেশিই আছে। আফগানিস্তানে এমন দেশদ্রোহী নিশ্চয় কিছু আছে যারা সোভিয়েত রাশিয়ার তথাকথিত সাম্যবাদী তত্ত্ব গলাধঃকরণে নারাজ নন। কিন্তু সাধারণ জনগণ যারা তাদের পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে পাওয়া তৌহিদবাদকে ও নিজ স্বাধীনতাকে জীবনের চেয়ে অধিক মনে করে, তারা সোভিয়েত রাশিয়ার জড়বাদী সাম্যতন্ত্রের প্রলোভনে কিছুতেই ভুলবেন না। সংখ্যায় তারাই অধিক এবং বিগত দুটি বছর ধরে তারা খেয়ে না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধেই অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত দখলদার সোভিয়েত সেনা ও তাদের দেশীয় তাবেদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

এ কথা অস্বীকার করলে অন্যায় হবে যে, আফগানিস্তানের মোজাহিদ বাহিনী মুক্তি সংগ্রামে যে পরিমাণে বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছে বিজয় অর্জন করতে পারছে সেই তুলনায় কম। পশ্চিমা দেশগুলি এখানে খেলছে এক ধরণের' ক্যাট এণ্ড মাউস" খেলা। কারণ সুবিদিত। প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে, আফগানিস্তান মূলতঃ মুসলিম অধ্যুসিত দেশ। কিন্তু এর জন্য কি এ কথা ভাবা যায় যে, এ অসম যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী শেষ পর্যন্ত হেরে যাবে আর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করবে দখলদার সোভিয়েত ও তাদের তল্পিবাহক বাহিনী? পৃথিবীর ইতিহাসই তাহলে লিখতে হবে ভিন্ন ভাবে।

www.pathagar.com

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত এ রকম নজীর একটাও স্থাপিত হয়নি যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রামীদের পরাজয় হয়েছে আর দখলদার বাহিনী জিতে গেছে। মুক্তি সংগ্রামের বিজয় অর্জন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। আফগান মুসলিমদের বিজয় সুনিশ্চিত।

যাহোক সোভিয়েত রাশিয়া যে মার্কসবাদী সাম্যতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে প্রচার করে থাকে সেই মার্ক্সীয় দর্শনেই পররাজ্য আক্রমণকে অতীব ঘৃণ্য কাজ বলে বলা হয়েছে। তাহলে মার্ক্সবাদী দর্শনের পতাকা হাতে নিয়ে সোভিয়েত বাহিনী কিভাবে আফগানিস্তান আক্রমণ করলো? এ প্রশ্নের জওয়াব খুঁজতে হলে একটু পিছনের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। অতীতে দেখা গেছে মার্ক্সবাদের পতাকা ধারণ করেও সোভিয়েত রাশিয়া নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী সুবিধামত সময়ে সময়ে মার্ক্সবাদের নতুন নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জারী করেছে। অধুনা সম্প্রচারিত সোভিয়েত মার্ক্সবাদের এক নতুন ভাষ্যে পররাজ্য গ্রাসকেও ন্যায্য বলে বিধান দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েতের বর্তমান ক্ষমতাসীন নেতারা এই নতুন ভাষ্যেরই উদগাতা। আফগানিস্তানে আক্রমনকারী সোভিয়েত সমরনায়কেরা তাদের কাজের সাফাই গাইতে গিয়ে বলেছেন ঃ- আফগানিস্তানের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্ষা করতে গিয়ে এবং সমাজতন্ত্রের সাধারণ দুষমন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমনের আশংকাকে প্রতিহত করতে গিয়েই সোভিয়েতের পক্ষে আফগানিস্তানে সেনাবাহিনী পাঠানো জরুরী হয়ে পড়েছিল। তারা আরও বলেছেন যে, আফগানিস্তানের "মহান" জনগণের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রক্ষার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করতে হলে তাদের পক্ষে নাকি এ ভূমিকা গ্রহণ ছাড়া পথ ছিল না।

দখলদারিত্বের স্বপক্ষে আধুনিক মার্ক্সবাদের এ কৈফিয়ৎ বস্তুতঃ ঐতিহাসিক। অতীতে বৃটিশ উপনিবেশবাদীরাও এ ধরণের কৈফিয়ৎ দিয়েছিল। এবং ভারতে বৃটিশ শাসনের ন্যায্যতা প্রতিপন্নের জন্য দেশীয় অনেক বুদ্ধিজীবিই সেদিন বৃটিশ শাসকদের সুরে সুরও মিলিয়ে ছিলেন। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে, ভারতে বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনের পেছনে বৃটিশ বণিকদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষা ছাড়া কোন মহৎ ইচ্ছার অস্তিত্ব ছিল না। আফপানিস্তানে সোভিয়েত আধিপত্যবাদের নয়া ঔপনিবেশিক স্বার্থ

www.pathagar.com

ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান ক্ষমতাসীন কর্তারা পররাজ্যগ্রাসের অনুকূলে যে এক নতুন তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন, সোভিয়েত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অনেকেই তা জানেন। এ তত্ত্ব অনুসারে সাম্রাজ্যবাদের (মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের অনুসারীদের) হুমকীর সম্মুখীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির কোন আলাদা সার্বভৌমত্বের প্রয়োজন নাই। এ তত্ত্বকে বলা হয়েছে, "সীমিত সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব।" মার্ক্সীয় অর্থনীতি ও তার লেলিনবাদী ব্যাখ্যার যুগোপযোগী সংস্কারের নামে তারা নতুন এক অর্থ-নৈতিক তত্ত্বও খাঁড়া করেছেন। এ তত্ত্বের উদগাতা হলেন, এ, লিয়েন টিয়েভ নামের জনৈক রুশীয় অর্থনীতিবিদ। তার মতে সাম্রাজ্যবাদের অর্থ-নৈতিক আগ্রাসন থেকে মুক্তির জন্য তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নকামী দেশগুলির অর্থনীতি হওয়া উচিত সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে সমন্বিত। অন্য কথায় সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির আঁচলের তলায় এইসব দরিদ্র দেশের অর্থনীতি যেন "পুষ্টিলাভ" করতে পারে। এই তত্ত্ব অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, যেসব দরিদ্র দেশের কাঁচামাল আছে অথচ শিল্প নেই, তাদের শিল্প গড়ে তোলার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করা উচিত নয়। বরং তারা তাদের কাঁচামাল সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠাবে এবং বিনিময়ে আনবে তাদের প্রয়োজনীয় শিল্প পণ্য! যদিও সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক মিত্র দেশ ও সোভিয়েতের এই সর্ব-নাসা টোপগিলতে রাজি হয়নি, তবুও এই সর্বনাসা সীমিত সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব প্রচার ও বিস্তারে সোভিয়েত কর্মকর্তাদের কোন ক্লান্তি নেই।

সোভিয়েত প্রচারনায় অহরহ বলা হচ্ছে যে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদার বাহিনীর বিরোধীতা করছে শুধু আফগানিস্তানের সাবেকী সামন্ততন্ত্রের ধারক বৃহৎ ভূমিপতি শ্রেণী এবং তাদের বশংবদলোকেরা। যাদের রাজনৈতিক সচেতনতা অত্যন্ত নিম্নমানের ভূম্যধিকারীদের যেমন কিছু আশ্রিত ব্যক্তিও নাকি প্রতিক্রিয়ার হাতের পুতুল হিসাবে না বুঝে এই অন্যায় সংগ্রামে সামিল হচ্ছে। কিন্তু যতই প্রচারনা চালানো হোক না কেন একথা আজ আর কারো অবিদিত নেই যে, সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান ক্ষমতাসীন নেতা ও তাদের দেশী-বিদেশী সেবকেরা ছাড়া তাদের এই প্রচার কেউ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করছেন না। কারণ বিগত দুটি বছর যাবত সোভিয়েত দখলদার বাহিনী যে গণহত্যা চালিয়েছে

www.pathagar.com

তাতে তাদের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব রক্ষার অজুহাতটি হয়ে গেছে একেবারেই অচল। এ হত্যাকাণ্ডের যারা শিকার হয়েছে কোন অর্থেই তারা সমাজ প্রগতির শত্রু বলে চিহ্নিত হতে পারে না। মার্ক্সীয় সাম্যতন্ত্রের আধুনিক প্রচারকেরা যদি শিল্প শ্রমিক, ক্ষুদ্র কৃষক, ধনী মালিকদের বেতন-ভুক রাখাল, ছোট ছোট দোকানদার, দরিদ্র কুটির শিল্পী ও স্বাধীন কারিগরদিগকে সামাজিক বিপ্লবের মূল নির্ভরশক্তি বলে স্বীকার না করে আফগানিস্তানের সামরিক বেসামরিক অভিজাত সৈন্য ও তাদের মদদদার সোভিয়েত দখলদার বাহিনীকেই সমাজ বিপ্লবের নির্ভরশক্তি বলে মনে করে, তাহলে এইটুকুই কেবল বলা যায় যে, মানবজাতির জন্য এ ধরণের বিপ্লবের কোন প্রয়োজন নেই।

যতদুর জানি মার্ক্স-এঙ্গেলস্, লেলিন এই তিনজন মার্ক্সীয় তাত্বিক ও ব্যাখ্যাকারের কেউই মার্কসবাদকে ঐকান্তিকভাবে প্রচারনির্ভর তত্ব বলে মনে করেন নি। তাদের মতে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের ফলে পুরানো সমাজব্যবস্থা বদলে যায় এবং সেই স্থলে নতুন সমাজব্যবস্থার জন্ম হয়। সমাজের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এ দ্বন্দ্ব নিহিত থাকে বলেই বাইরের প্রচার সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করতে পারে না। মার্ক্সবাদীরা নিজেরাই বলেন, বিপ্লব রপ্তানীযোগ্য কোন পণ্য নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সোভিয়েত রাশিয়ার নয়া মার্ক্সবাদীরা মনে করেন "বিপ্লব" রপ্তানীযোগ্য পণ্য তো বটেই এমনকি কোন দেশের মেহনতী মানুষের বৃহদাংশ যখন সে বিপ্লব পছন্দ নাও করে, তখন মেরে কেটে তা তাদের পছন্দ করাতেই হবে। তাই দেখে আফগান জনগণ যখন সোভিয়েতের সাম্যতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী দখলদারদের মোটেই পছন্দ করছে না, তখনও তারা গায়ের জোরে দেশটাকে দখল করছে। শুধু তাই নয়, যেহেতু প্রচারের দৌলতেই তারা দুনিয়াকে বুঝাতে প্রয়াস পাচ্ছে (না) যে, আফগানিস্তান দখল করার কোন ইচ্ছেই তাদের নেই, শুধু আফগানিস্তানের সমাজ-তন্ত্রকামী এক "বৈধ" সরকারের অনুরোধেই তারা সেদেশে সসৈন্যে প্রবেশ করেছেন এবং শুধুমাত্র সাম্যবাদী বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্যই তাদের এ ঝকমারী পোহাতে হচ্ছে। আরও মজার কথা এই যে, প্রচার-ণার কৌশলে তথাকথিত বিপ্লব রক্ষার প্রয়াসকে "মহান" বলে প্রচার করতেও তাদের আটকাচ্ছে না।

www.pathagar.com

নাৎসী হিটলারের অন্তরঙ্গ কমরেড পল জোসেফ গোয়েবলস্ এর প্রসিদ্ধ তত্ত্বটিকে অনেকেই জানেন যে, একটা মিথ্যাকে পৌনপুনিক প্রচারের দ্বারা সত্যে পরিণত করা যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান ক্ষমতাসীন নেতারা এই হিটলারী তত্ত্বটাকে বোধ করি খোদ হিটলারের চেয়েও কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। জলজ্যান্ত আগ্রাসনকেও তারা শুধু-মাত্র প্রচারের জোরে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, এটা আগ্রাসন নয়, বিপ্লব রক্ষা। অথচ সবাই জানেন যে, এই বিপ্লব রক্ষার প্রচারণার আড়ালে তারা কত দেশে যে তাদের ভাড়াটে সৈন্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন তার কোন ইয়াত্তা নেই। বস্তুতঃ আজকের দিনে সোভিয়েত প্রচার ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে বলা যায় বিস্ময়কর। সপ্তাহে ৮৩টি বিদেশী ভাষায় দুই হাজার ঘন্টা প্রচার চালানো হয় রেডিও মস্কো থেকে। রেডিও "শান্তি ও প্রগতি" নামের আর একটি ষ্টেশন থেকেও চালানো হয় অনুরূপ প্রচারণা। এ প্রচার মাধ্যমকে অবিশ্রান্তভাবে সহযোগিতা করে থাকে দুটি সরকারী নিউজ এজেন্সী "তাস" এবং "নভোস্তি"। এরা সবাই মিলে অহরহ একটা কথা প্রচার করে চলে আর তা হলো সোভিয়েতের সাম্যবাদ হচ্ছে "ওয়েজ অব দি ফিউচার" তাছাড়া শান্তি আর নিরস্ত্রীকরণের বুলী তো তাদের মুখে লেগেই আছে। শুধুমাত্র "শান্তির" এই বার্তা প্রচার করতেই প্রতি বছর ক্রেমলিনের খরচ পড়ে ২,০০০ মিলিয়ন ডলার। সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট লিউনিদ ব্রেজনেভকে যারা এ যুগের হিটলার বলে অভিহিত করেন, তারা নিশ্চয় প্রচার বাবদে হিটলারী পন্থা অনুসরণ করার জন্য যে তাঁকে এ নামে অভিহিত করেন তা নয় সবাই স্বীকার করবেন যে আগ্রাসী শক্তি হিসাবে ব্রেজনেভ হিটলার-কেও ছাড়িয়ে গেছেন।

সুতরাং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান যে বলেছেন, সাম্যতন্ত্র যুদ্ধাস্ত্র নির্মানে যতটা পটু তার জনগণের খাদ্য যোগাতে ততটা পারদর্শী নয়—সে কথাটা আজ সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। খাদ্য শস্যে একদা উদ্বৃত্ত সোভিয়েত রাশিয়া এখন বিপুল খাদ্য ঘাটতির দেশ। মার্কিন গমের এক নিয়মিত বাঁধা খদ্দের হল রাশিয়া। এই অবস্থা তার একদিনে হয়নি। একদা 'পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদ" এর বিরুদ্ধে তত্ত্বগত সংগ্রাম দিয়ে শুরু করে সোভিয়েত রাশিয়া

www.pathagar.com

নিজেই এক আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে। এবং এর জন্য তাকে মূল্য দিতে হচ্ছে অনেক। হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ করতে হচ্ছে সামরিক খাতে এবং সে যে সাম্যতন্ত্রের মেষচর্মের আড়ালে নেকড়ে বাঘ নয় তাই প্রমাণ করার জন্য খরচ করতে হচ্ছে শতশত কোটি রুবল। "শান্তি আর প্রগতির" নামে এক রেডিও ষ্টেশন খুলে চালাতে হচ্ছে ৮৩টি বিদেশী ভাষায় "অবিরাম প্রচারে মিথ্যা ও সত্যে পরিণত হয়" এই গোয়েবলসীয় তত্ত্বের অনুশীলন। কিন্তু সত্যই কি অবিরাম প্রচারে মিথ্যা সত্যে পরিণত হয়? হলে কি হিটলারকে তার পরিণতিবরণ করতে হতো?

দৈনিক দেশ, ১০-৩-৮২

www.pathagar.com

এ্যাকাউন্টিবিলিটি

(পরলোক-বিলোপবাদ)

সম্প্রতি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা অনেকদিন পর দেশবাসীকে একটি ব্যাতিক্রমধর্মী সংবাদ উপহার দিয়েছে। ব্যাতিক্রমধর্মী এই কারণে যে, এরকম সংবাদ সচরাচর প্রকাশিত হয় না। ব্যাতিক্রমধর্মী হলেও সংবাদটি আকাঙ্খিত এবং দেশবাসী আকাঙ্খা করে যে এই ধরণের সংবাদ প্রকাশের প্রসঙ্গ ঘটুক, তার পর সমাজ থেকে এই দুটি চক্রের পরমায়ু শেষ বারের মত শেষ হয়ে যাক। কিন্তু দেশবাসীর সেই বহু প্রত্যাশিত আকাঙ্খার বাস্তবায়ন হবে কি ?

১ নং সংক্ষিপ্ত সামরিক আইন আদালত এন, এস, আই, এর জনৈক সাবেক ডেপুটি ডিরেক্টরকে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রাইভেট পতিতালয়গুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করা, পতিতালয়ের তত্বাবধায়কদের কাছ থেকে নিয়মিত অর্থ গ্রহণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের বাধাদানের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন।

আদালত এই ডিপুটি ডিরেক্টর সাহেবকে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বৎসর ৯ মাস কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই সংবাদটি পড়ে দেশবাসী একাধারে খুশীও হয়েছেন স্তম্ভিতও হয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীবিমল মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থে "পদ্ম রানীর ফ্ল্যাট" ও তার নেপথ্য পরিচালক জনৈক কংগ্রেস নেতার কাহিনী অনেকেই পড়েছেন। অনেকেই পড়েছেন পশ্চিম বঙ্গের সামাজিক বাস্তবতায় সে কাহিনী অবিশ্বাস্য নয়, যদিও সেই কাহিনীর সঙ্গে ক্ষমতাসীন জাতীয় কংগ্রেসের জনৈক উর্ধতন নেতার, যিনি খদ্দর ছাড়া পরেন না, শিবপূজা না করে জল গ্রহণ করেন না এবং বৃহত্তর জনগণের প্রভূততম কল্যাণের নিমিত্তে দীর্ঘ যামিনী বিনিদ্র যাপন করেন, যোগসূত্র বড়ই কৌতুককর ও মর্মঘাতী।

www.pathagar.com

তবু শত হলেও সে কাহিনী উপন্যাসের, অতএব কল্পনার প্রচুরতম সুযোগ সেখানে বর্তমান, কিন্তু বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত সংবাদটি উপন্যাসের কল্প কাহিনী নয়, বাস্তব এবং জনসাধারণের পক্ষে হৃদয়ঘাতী হলেও সত্য।

এই কাহিনী আমাদের মনে যুগপত অনেকগুলি প্রশ্নের জন্ম দেয়। এন, এস, আই-এর মত একটি মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি ডিরেক্টর-এর মত একজন দায়িত্ববান কর্মকর্তার পক্ষে এ ধরণের অপরাধ অনুষ্ঠান করা আদৌ সম্ভব হল কি করে—তা নিয়ে আমাদের মনে বিস্ময় যতই থাকুক, এ ক্ষেত্রে আমরা প্রাথমিক প্রশ্নটিই উত্থাপন করতে পারি—১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ তিনি কি করে এই জঘণ্যতম অপরাধ চালিয়ে আসতে পারলেন? এই দশ বছরের মধ্যে কি একবারও তার অপরাধের বিষয় কর্তৃপক্ষের নজরে আসেনি? কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এবং জবাবে যাই বলা হোক—একথা সত্য যে, আদালতে শাস্তি লাভের পূর্বে তিনি বহাল তবিয়তে সমাজে বিচরণ করেছেন, কেউ তার কেশস্পর্শ করতে পারেনি। এবং এ থেকে আমরা এই মোক্ষম শিক্ষাটিই লাভ করতে পারি যে, ইহ সংসারে আমাদের তাবৎ কর্মকাণ্ডের হিসাব নিয়ে একদিন যে আমাদের সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে এবং হিসাবে কোন রকম কারচুপি করা চলবে না—এই কথাটিই আমরা ভুলে বসে আছি কিংবা আদৌ আমরা তা বিশ্বাস করিনি। বিনা টিকেটে রেল ভ্রমনের সময় কিছু দুস্কৃতিকারী যাত্রী যেমন মনে করে গেট পেরুবার সময় গেট ম্যানের হাতে কিছু গুজে দিলেই চলবে, পরলোকে হিসাব দানের ব্যাপারটাকেও হয় আমরা সেই দৃষ্টিতে দেখছি অথবা পরলোক একটা কুসংস্কার মাত্র—মনে করে ইহলৌকিক সুখ সুবিধার জন্য যা খুশী তাই করছি।

এ কথা সত্য যে আমাদের আলোচ্য ডিপুটি ডাইরেক্টর সাহেব শার্লক হোমস্‌ের কোন প্রতিনায়কের মত নিরঅতিসয় ধুরন্ধর অপরাধী ছিলেন বলেই যে দীর্ঘ দশ বৎসর যাবত শাস্তি এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন তা নয়। অপরাধ হিসাবে তার কৃত কর্মটি যতই জঘণ্য হোক—বাংলাদেশের বাস্তবতায় এটি "পান্থা ভাত" এবং কিছু দিন আগে পর্যন্তও এ ধরণের নৈতিক অপরাধ সংঘটনের জন্য কোন আড়াল আবডালেরও প্রয়োজন হয় নি।

www.pathagar.com

আমাদের দেশে পতিতাবৃত্তি—বৃত্তি হিসাবে বেআইনী কোন বৃত্তি নয়। যে কোন প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা জীবিকা অর্জনের জন্য এই বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে। এর জন্য কেবল তাকে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই মর্মে বিবৃতি দিতে হবে যে, সে স্বাধীন ইচ্ছায় এই পেশা গ্রহণ করছে—একাজে সে কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়নি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে তাকে এই পথে জীবিকা অর্জনের জন্য লাইসেন্স দেবেন। আমাদের দেশে পতিতাবৃত্তি বিরোধী জনমত যতই প্রবল থাকুক কিংবা পতিতাবৃত্তির জন্য পরিবেশ যতই প্রতিকূল হোক এই ৫৪ হাজার বর্গ মাইলের এই দেশে প্রায় ১০ হাজার মহিলা আইন সম্মতভাবে এই পেশার মাধ্যমে জীবিকার সংস্থান করছে। পক্ষান্তরে সরকারের কাছ থেকে যথারীতি লাইসেন্স না নিয়ে এই পেশায় নিয়োজিত আছে তাদের সংখ্যা কত কেহই বলতে পারে না। মোটের উপর আমাদের সামাজিক বাস্তবতা হলো এই। প্রথাটি অতিশয় পুরানো এবং মানব সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক। মানুষের সমুদয় মানবিক গুণের অপহারী এই সামাজিক প্রথাটি এখনো টিকে আছে কেন সে আলোচনা বর্তমান পরিসরে সম্ভব নয়, আমরা এই প্রথাসাপেক্ষে প্রশাসনিক দুর্বৃত্তপনার একটা স্থূল দিক নিয়ে কিছু বলবো।

সরকার অনুমোদিত পতিতালয় গুলিতে লাইসেন্স পাওয়া পতিতার সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স বিহীন অনেক মেয়ে থাকে যাদের লাইসেন্স পাবার বয়স হয়নি-অথচ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার লোকের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা খদ্দের পাকড়াও করে—কেউই কিছু বলে না। আমাদের দেশ ব্যক্তি-স্বাধীনতার দেশ। একটি বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে যখন স্বেচ্ছায় জীবিকা হিসেবে এই বৃত্তি গ্রহন করে তখন সরকার তাকে তার স্বাধীন ইচ্ছার বাধাদান না করার নীতিতে লাইসেন্স দেয়। কিন্তু সরকারের চোখের সামনে শত শত কিশোরী মেয়ে যখন ব্যাপারটি ঠিকমত বুঝতে পর্যন্ত শেখেনি, মুখে রং মেখে খদ্দের পাকড়াও করার জন্যে গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন সরকার তার ব্যক্তি স্বাধীনতা বোধের বিবেককে কোন কৌশলে ঘুম পাড়িয়ে রাখে আমি বুঝতে পারিনে। নিতান্ত একজন নাবালকেও বোঝে, এই সব অপাপবিদ্ধ মেয়েদের দিয়ে এক শ্রেণীর দুরাত্মা কোন কোন সরকারী কর্মকর্তার সাহায্যে দেহব্যবসা চালাচ্ছে। সমাজ পতিরা দেখছেন, নিপীড়িত মানবাত্মার দুর্দশায় বুক ফেটে যায় বলে

www.pathagar.com

যাদের রাতে ঘুম আসেনা তারা দেখছেন, এককথায় যাদের কপালের উপর দুটো চোখ আছে তারা সবাই দেখছেন কিন্তু এর কোন প্রতিকার হচ্ছে না। এই মেয়েরা এখানে স্বেচ্ছায় আসেনি। এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত সমাজের সদর মহলে প্রতিষ্ঠা আছে এমন এক শ্রেণীর ছদ্মবেশী দুরাচারের পৃষ্ঠপোষকতায় নানা অপকৌশলে সমাজের নীচু স্তর থেকে এদের সংগ্রহ করে এই পাপ পল্লীতে এনে জড় করেছে এবং তাদের দিয়ে দেহ ব্যবসা করে মুনাফা লুণ্ঠন করছে। শুধু দু'বেলা দু'মঠো খাওয়া এবং ব্যবসার জন্য পরিধেয় ছাড়া এদের আর কিছু দেয়া হয় না। রোগের চিকিৎসা টুকুও এদের ভাগ্যে জোটেনা। সবচেয়ে আফসোসের ব্যাপার হলো ব্যাপারটা দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ণধাররা সবাই জানেন, কিন্তু এক দুর্বোধ্য কারণে সবাই না জানার ভান করে থাকেন। আমি জানি, আমার এ প্রশ্ন অভ্রভেদী পর্বতের নির্জন সানুদেশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করার মতই নিষ্ফল, কারণ—আমার প্রশ্ন আমার কানেই প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসবে আমি এর জবাব পাব না। যদি এমন হতো যে, আমি একটা সমাজিক অপরাধের গোপনে অনুষ্ঠিত ঘঠনার বিবরন দিচ্ছি যা কেউ জানেনা—তাহলেও এর একটা প্রতিকার আশা করা যেত! কিন্তু এ বিষয়টা সবাই জানেন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার লোকজনেরা আমার চেয়ে অনেক বেশী জানেন। তবু একজন মুসলমান হিসেবে মহান আল্লার দরবারে এর প্রতিকার প্রার্থনা করার আগে আমি দেশবাসীর বিবেকের কাছে আমার এই ফরিয়াদটি জানাতে চাই যে, এই জঘন্য নারকীয় জীবনের বন্দী দশা থেকে এদের রক্ষা করুন।

জানামতে বাংলাদেশে একলাখ সাইত্রিশ হাজার মসজিদ আছে এবং সেখানে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান নিয়মিত সালাত কায়েম করে থাকেন। কয়েক হাজার ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর শিক্ষকরা প্রায় সকলেই মুসলমান বলে পরিচিত তৎসত্বেও এদেশে কার্যকরী ভাবে যে মতাদর্শটি প্রাধান্য বিস্তার করে চলছে তা পরলোক বিরোপবাদ।

জগৎ সংসারে আমাদের যাবতীয় কাজকর্মের জন্য আমাদেরকে একদিন বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং হিসাব দিতে হবে-এই বিশ্বাসটি এখন আমাদের প্রাণে ক্ষীন প্রভাবও রাখতে পারছে না। আমরা মুখে যে যাই বলি, একদিন সবকিছুর হিসাব দিতে হবে—এই বিশ্বাস যথার্থভাবে

www.pathagar.com

কেউ করিনা। যদি করতাম আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব এমন অবলীলায় আমরা এড়িয়ে যেতে কিছুতেই পারতাম না।

তথাপি অনেকের মত আমিও বিশ্বাস করি, এই পরলোক বিলোপবাদী তত্ত্ব আমাদের দেশের মাটি থেকে জন্মলাভ করেনি। আমাদের দুর্ভিক্ষের সময় যে দেশ থেকে গম আসে, প্রতিরক্ষার জন্য যেদেশ থেকে অস্ত্র আসে উন্নতমানের জীবন যাপনের জন্য যে দেশ থেকে নানা সমগ্রী আসে, দেশ গড়ার নামে আসে ডলার রুবল এবং রুপি আর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আসে বিদ্যা ও বিশেষজ্ঞ সেই সব দেশ থেকেই আসে পরলোক বিলোপবাদ আর বিতরন হয় এই দেশের বিতণ্ডাবাদী এজেন্টদের দ্বারা। জানি না এই পরলোক বিলোপবাদ এর হাত থেকে আমরা কোনদিন পরিত্রান পাব কিনা-আর দেশের প্রশাসক এর কোন খেয়াল করবেন কিনা।

দৈনিক কিষাণ ১০-৬-৮২

www.pathagar.com

বস্তুবাদী রাশিয়ায় ভাববাদী রবীন্দ্র চর্চা

সম্প্রতি জানা গেল, রুশ জনসাধারণ রবীন্দ্র চর্চায় খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, নাটক ও উপন্যাস, রুশ ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে প্রচারিত তো হচ্ছেই, মূল বাংলা ভাষাতেও রবীন্দ্র রচনাবলী পাঠের অভ্যাস রুশ জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে। রবীন্দ্র চর্চায় রুশ জনসাধারণের এই উৎসাহ রাশিয়া থেকে প্রকাশিত একাধিক পত্র-পত্রিকায় মহোৎসাহে প্রচারিত হয়েছে ও হচ্ছে। রবীন্দ্র-নাথের প্রতি রুশ জনসাধারণের এই আগ্রহের খবর বাংলাদেশের একাধিক রুশ ভক্ত পত্র-পত্রিকাতেও প্রচারিত হতে দেখা যাচ্ছে।

ঘটনাটি আমার কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। প্রবাদ আছে "বানরে সঙ্গীত গায়, শিলা জলে ভেসে যায়, দেখিলেও না করো প্রত্যয়" কিন্তু এক্ষেত্রে প্রত্যয় না করে উপায় নেই—কারণ এটা নাকি প্রকৃতই একটা ঘটনা। রুশ দেশের জনগণ পরমোৎসাহে রবীন্দ্র চর্চায় ব্রতী হয়ে উঠেছেন। দুনিয়ার মানুষ জানে রবীন্দ্রনাথ একজন মরমী কবি। তাঁর কবিতার মূল বিষয় হলো লোকাতীত ভাববাদ। এবং আমার জানামতে আধুনিক সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়েছে ভাববাদী জীবন ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের উপর।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আধুনিক বস্তুবাদের প্রবক্তা দার্শনিক ও সমাজ বিজ্ঞানী কার্লমার্ক্স জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে তত্ত্ব দিয়ে গেছেন, তাঁর মৃত্যুর পর ভি, আই, লেলিনের নেতৃত্বে রুশ দেশে প্রথম তা বাস্ত-বায়িত হয়। বিপ্লবের পর একাধিক জন সভা, পার্টি মিটিং ও উচ্চতর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমাবেশে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, এখান থেকে ভাববাদের অবসানের যুগ সুচিত হলো—আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ পরিচালিত হবে বস্তুবাদী সমাজ-দর্শনের উপর ভিত্তি করে। ভাববাদী সংস্কৃতিকে আমরা ধীরে ধীরে রুশ সমাজ থেকে উৎপাটিত করব। এবং এখন থেকে শোষক শ্রেণীর দর্শন ভাববাদের স্থলে বস্তুবাদের দর্শন প্রতিষ্ঠা করাই হবে আমাদের প্রধান

www.pathagar.com

সোভিয়েত রাশিয়ায় ভি, আই, লেনিনকে এখনও মহান বিপ্লবী ও সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান নেতা হিসাবে গণ্য করা হয়। অথচ ভাববাদ সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও একজন ভিন্নদেশী ভাববাদী কবিকে সোভিয়েত রাশিয়ার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এটা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি? রুশ জনসাধারণ রবিন্দ্র চর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠেছে এর একটা কারণ এই হতে পারে যে, তারা (রুশ জনসাধারণ) রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এমন কিছু পেয়েছে যা ভাববাদ বিরোধী বস্তুতান্ত্রিক কিংবা রবীন্দ্রকাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে এমন কিছুর সন্ধান পাওয়া গেছে যা বিশ্ব প্রকৃতির লোকায়িত ব্যাখ্যাকে অনুমোদন করে। বস্তুতই এটা হওয়া অসম্ভব। যদিও পরিদৃশ্যমান এই বিশ্ব জগৎকে প্রপঞ্চময় মায়া বলে তিনি স্থূল মায়াবাদীর মত হাতের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাননি, তবে তিনি ছিলেন, প্রাচীন ও আধুনিক কালের সব অগ্রণী মায়াবাদীদেরই সমগোত্রীয় বেদান্তবাদী ঔপনিষদিক। ঔপনিষদ বেদান্তের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ দেশ-বিদেশে সর্বত্রই মোটামুটি প্রসিদ্ধ। কাজেই তাঁর পক্ষে লোকায়িত বস্তুবাদী হয়ে উঠবার কোন সুদূরতম সম্ভাবনাও দেখা যায় না। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কবি সেতো তাঁর অনবদ্য আধ্যাত্মিক রচনার জন্যই।

এহেন রবীন্দ্রনাথকে সোভিয়েত ভূমিতে এত তোড়-জোড়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য কি? তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, খোদ সোভিয়েত রাশিয়াই তার বস্তুবাদী দর্শন থেকে বিচ্যুত হয়েছে? বলাবাহুল্য সম-কালীন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সোভিয়েত রাশিয়া যে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে চলেছে তাতে এমত অনুমানের কোন অসঙ্গতি নেই।

তাছাড়া সোভিয়েত রাশিয়ায় রবীন্দ্র চর্চা প্রসঙ্গে আমরা অন্য একটা ঐতিহাসিক ঘটনাও স্মরণ করতে পারি। ইউরোপে বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপেও এক সময় রবীন্দ্র রচনা পাঠ ও রবীন্দ্র চর্চার উৎসাহের প্রবল জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। ইউরোপের সাধারণ জনগণ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তেমন উৎসাহী হয়ে না উঠলেও ক্ষমতাসীন শ্রেণীর বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজ রবীন্দ্রনাথকে কালের কবি বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। ভারতে বৃটিশ উপনিবেশবাদের পতনের দুই দশক আগে থেকেই অবশ্য সে উৎসাহের

১৪—

www.pathagar.com

জোয়ারে ভাটা পড়ে। বোঝা যায় সেটা ঘটেছিল রাজনৈতিক কারণেই। কেন না "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের জোয়ার প্রবল হয়ে উঠবার আগে পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের বিদ্বৎসমাজ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অতুলনীয় উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর গ্রন্থটি "সর্বাধিক বিক্রিত"-এর তালিকায় স্থান পায়। ১৯১৩ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে গীতাঞ্জলীর ১৩টি মুদ্রণ হয়। শুধু ব্যবসায়িক সাফল্যের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি সীমাবদ্ধ ছিল না। অযাচিতভাবে আরও অনেক সম্মান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে "নোবেল" পুরস্কার দেয়া হয়।

কিন্তু একথা সত্য যে ইংল্যাণ্ডের অনেক কবি লেখকই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশী উচ্ছ্বসিত হবার পক্ষপাতি ছিলেন না। কবি ইয়েটস্, এডমণ্ড গসকে লেখা একটা চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে "একাডেমী" সদস্যভুক্ত করার প্রচেষ্টা শুধু স্মরণীয় বা প্রসংসনীয়ই নয় ভারতে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দিক দিয়েও তা বিচক্ষণতার পরিচায়ক হবে। কিন্তু এডমণ্ড গস্ সে প্রস্তাবে সায় দেন নি। রবীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও সম্মানিত করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল কিন্তু সে সব প্রস্তাব উপেক্ষা করে লর্ড কার্জনের পত্র এল "ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেক রয়েছেন।" অর্থাৎ লর্ড কার্জন রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এতটুকু সম্মানই মঞ্জুর করতে রাজি ছিলেন যতটুকু ঔপনিবেশিক স্বার্থের জন্য তাঁর প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত কবি টি. এস. এলিয়ট রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে বরাবরই নীরব ছিলেন। কিন্তু এই ডামার্ডোলের এক পর্যায়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বললেন, "রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব নিয়ে বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছে।" বাড়াবাড়ি যে সত্যই হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

যাইহোক, ইউরোপে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে উৎসাহে সাংঘাতিকভাবে ভাটা পড়ে। এবং এর কারণ যে রাজনৈতিক, তা সমকালীন ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। অবশ্য একথাও ঠিক যে, সাহিত্য রুচির পরিবর্তনের কারণেও রবীন্দ্রনাথের পাঠক সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে। যেমন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের মহৎ কবি লেখকেরা পাঠক হারিয়ে এক সময় শুধু "মহৎ লেখক" এই হিসাবেই স্বীকৃতি

www.pathagar.com

পেয়ে থাকেন। কিন্তু এতকাল পরে সোভিয়েত রাশিয়ায় রবীন্দ্র চর্চার জোয়ার এমন প্রবল হয়ে উঠলো কেন? সাহিত্য রুচির দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন দেশেও এখন সেকেলের। দেশে একাডেমিক প্রয়োজন ছাড়া রবীন্দ্র চর্চা নেই বললেও চলে। বঙ্গ ভাষাভাষী বিদগ্ধজনদের মধ্যে প্রতিবছর রবীন্দ্র জন্ম তিথিতে এ ধরণের খেদোক্তিও শোনা যায় যে, আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভুলে গেছি। প্রতিবছর ২৫শে বৈশাখ বা ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের স্মরণে রবীন্দ্র কাব্য পাঠ ছাড়া সাধারণ সুধী পাঠকেরা অন্য সময় রবীন্দ্রকাব্য ছুয়েও দেখেন না। রবীন্দ্র সঙ্গীতের চর্চাটা কোন কোন মহলে কিছু কিছু আছে। কিন্তু দেশের বৃহত্তর সঙ্গীত পিপাসু জনগণের মধ্যে রবীন্দ্র সঙ্গীতের কোন কদর নেই। আগেও ছিল না। এহেন রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রতিক কালে সোভিয়েত রাশিয়ার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করার তোড়জোড় চলছে, এটা অতি বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি? কিন্তু অনেক সময় অনেক বিস্ময়কর ব্যাপারের পেছনেও যে কারণ থাকতে পারে তা সাধারণের সহজবোধ্য। ঐতিহাসিকভাবে ঘটনাটা পর্যালোচনা করলে তা পাওয়া যায়।

ইউরোপে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উচ্ছ্বাসের দুটি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। শিল্পবিপ্লবের পর ইউরোপের বৈষয়িক উন্নতি ঘটেছিল বিস্ময়কর দ্রুত-গতিতে। সমুদ্র বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে সারা পৃথিবী থেকে সম্পদ জড়ো হবার ফলে ইউরোপের জীবন যাত্রার মান দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। যন্ত্রসভ্যতা এত বিকাশ হয়েছিল যে, মানুষ একসময় জীবন যাত্রার সাধারণ পরিবেশ হারিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল। সে সময় বস্তুতান্ত্রিক ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে খুব সঙ্গত কারণেই আধ্যাত্মিক পিপাসা বেড়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় হয় মোটামুটি এই সময়। দ্বিতীয় কারণটা রাজনৈতিক এবং প্রধান। ঔপনিবেশের একজন মরমী কবিকে প্রচুর রাজকীয় সম্মান দিয়ে ইংল্যাণ্ড ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণের জ্বালা জুড়াতে চেয়েছিল। বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীকে দেখাতে চেয়েছিল, "দ্যাখো, আমরা গুণীজনের কদর দিতে জানি।"

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রাশিয়া রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উচ্ছসিত হচ্ছে কেন? প্রথমতঃ আধ্যাত্মবাদী সাহিত্যিক হিসাবে বস্তুবাদী রাশিয়ার পক্ষে রবীন্দ্র অনুরাগ শুধু বিস্ময়কর নয়, বস্তুতঃ অসম্ভব, যদি না বস্তুবাদী দর্শন

www.pathagar.com

থেকে সোভিয়েতের বিচ্যুতি ঘটে। দ্বিতীয়তঃ ১৯৪৭ পূর্ব ভারতবর্ষ ইউরোপের যেমন ঔপনিবেশিক স্বার্থ ছিল তেমন কোন স্বার্থোদ্ধারের প্রশ্ন যদি দেখা দেয় তাহলে অবশ্যই রবীন্দ্র চর্চার মাধ্যমেই সে পথটাকে কিছু প্রসস্ত করা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান ভূমিকা থেকে দু'টা অনুমানই সত্য বলে প্রতিয়মান হয়। রাশিয়ার বস্তুবাদী-দর্শন (মার্কসবাদ) পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মবাদী দর্শন গ্রহণ করার আরও অনেক নজীর ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে—যেমন রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বিশ্বসাহিত্যের আরও আধ্যাত্মবাদী বহু কবি সাহিত্যিকের রচনা পাঠ করার ব্যাপারে সোভিয়েত সরকার প্রচুর উৎসাহ যোগাচ্ছে। তথাপি ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারে একটু বেশী মাত্রায় উচ্ছাস প্রকাশের অন্য কারণ রয়েছে—সেটা প্রধানতঃ রাজনৈতিক। ভারতে বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথের পাঠক সংখ্যা যতই হ্রাস পাক রাজনৈতিক কারণে ভারতের অভিজাতিক শাসক গোষ্ঠীর চোখে রবীন্দ্রনাথ এখনও "ঋষিক" সম্মানের অধিকারী। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষিত মহলে তাঁর ভাবমূর্তি হয়ত এখনও যথেষ্ট উচুঁ। এমন একজন সম্মানিত গতায়ু কবির প্রতি সম্মান বোধে উচ্ছসিত হয়ে উঠলে ভারতবাসীর মন জয় করা সহজ হবে—এটা খুব সহজ হিসাবের কথা এবং ভারতের মনতুষ্টি সোভিয়েত রাশিয়ার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়ও বটে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েতের একজন দৃঢ় সমর্থক হলো ভারত। তাছাড়া ভারতে সোভিয়েত রাশিয়া হাজার হাজার কোটি টাকার পুঁজি খাটাচ্ছে; বিশেষ বিশেষ কায়দায় যা ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পরিপূরক এর ভূমিকা পালন করে চলেছে। বলতে গেলে ভারতের পাবলিক সেক্টারের বিপুল শিল্পদ্যোগের প্রায় সবটাই সোভিয়েত রাশিয়ার পুঁজি ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। এর দ্বারা ভারতই শুধু লাভবান হচ্ছে তা নয়, এসব শিল্প কারখানার মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়া বিপুল পরিমাণ প্রসেসকৃত ইস্পাত নিজের দেশে নিয়ে যেতে পারছে। অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে উভয় পক্ষই পরস্পর মুনাফার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আবদ্ধ। এবং এ সম্পর্কের উপর সাংস্কৃতিক মাধুর্যের প্রলেপ লাগানোর কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ শতকের প্রথমভাগে বৃটিশ ঔপনিবেশবাদের হাতে যেমন হয়েছিলেন।

দৈনিক সংগ্রাম
০৬/১১/৮২

www.pathagar.com

বাংলাদেশ-ভারত অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রশ্ন (২)

(১৯৩ পৃষ্ঠার পর)

বিগত ১৬/১৭ই অক্টোবর '৮২ দিল্লীতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ অর্থ-নৈতিক কমিশনের বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব এ, আর, শামসুদ্দোহা যিনি এই কমিশনের কো-চেয়ারম্যান, কমিশন গঠনের মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে এর প্রথম বৈঠক "সাফল্য-জনকভাবে" অনুষ্ঠিত হওয়ায় খুব সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বিগত সেপ্টেম্বরে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এইচ, এম, এরশাদ ও ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে যে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই বৈঠকেই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এই যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে এই কমিশন খুব বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে বলে সরকার গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করলেও ওয়াকিবহাল মহলে এ ব্যাপারে মিশ্র-প্রতিক্রিয়া হতে দেখা যায়।

বিগত ১৩ই অক্টোবর '৮২ দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রশ্ন শীর্ষক এক নিবন্ধে এই ওয়াকিবহাল মহলের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কিছু ঐতিহাসিক আলোচনা করেছিলাম। মুসলমানদের চেতনা কট্টর হিন্দু সম্প্রদায়িকতারই ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর সাবেক পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশ পূর্ব বাংলা নামে অন্তর্ভুক্ত থাকার সময় ভারতের কংগ্রেস সরকার দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক অনেক চুক্তি একতরফাভাবে ভঙ্গ করে বাংলাদেশের অর্থনীতি বিকাশের অনেক সম্ভাবনাকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ধ্বংস করেছিল—ওয়াকিফহাল অনেকেরই তা স্মরণ থাকার কথা। ১৯৪৭ সালের ১৩ই নভেম্বর সাবেক পাকিস্তান সরকার স্বাভাবিকভাবে কাঁচা পাটের উপর রফতানি শুল্ক ধার্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। তৎকালীন পূর্ব বাংলার ৯০ ভাগ কাঁচা পাট রফতানি করা হতো কলকাতা বন্দরের

www.pathagar.com

মাধ্যমে। ভারত সরকার পূর্ব বাংলার কাঁচাপাট রফতানির উপর রফতানি শুল্ক আদায় করার প্রস্তাব বিবেচনা না করলে কেবলমাত্র একটা মৌসুমে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার (যখন ডলার 1=4·12) রফতানি শুল্ক আয় থেকে বঞ্চিত করে। দেশ বিভাগের পর দু'দেশের মধ্যে পণ্য চলাচলের উপর কোন কাস্টম ডিউটি ধরা হবে না বলে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে একটি কাস্টম ইউনিয়নও গঠিত হয়। কিন্তু ভারত সরকার এসব চুক্তির প্রস্তাবক হওয়া সত্ত্বেও এক তরফাভাবে চুক্তি ভংগ করতে কখনও দ্বিধাবোধ করেনি। ভারত চুক্তিভংগ পাকিস্তানের সংগেই করেছে, অন্যদেশের সঙ্গে করেছে বলে আমার জানা নেই। অতীতের এসব তিক্ত ইতিহাস স্মরণ করা কারো কারো বিবেচনায় হয়তো এখন রুচিকর না হতে পারে, কিন্তু সাবেক পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যকার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পথে প্রতিবেশী ভারত যেসব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তা একেবারে বেমালুম ভুলে যাওয়াই কি সম্ভব, না উচিত? তবে দার্শনিক হেগেলের ভাষায় "ইতিহাসের বড় শিক্ষা এই যে, ইতিহাসের শিক্ষা কেউ গ্রহণ করে না"। বোধ হয় আমরা এর প্রধান ছাত্র।

সম্প্রতি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ নেপাল সফর শেষে দেশে ফিরে বলেছিলেন, "গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য প্রাক সম্ভাব্যতা পর্যালোচনায় নেপাল সহযোগিতা করতে রাজী হয়েছে। যৌথ নদী কমিশনের পরবর্তী বৈঠকে বিষয়টি আলোচনা হবে এবং কিভাবে নেপালকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে পন্থাও খুঁজে বের করা যাবে।" তিনি সে সময় গভীরভাবে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, যৌথভাবে নেপালকে অন্তর্ভুক্ত করার কোন বাধা সম্ভবতঃ আসবেনা। কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই দেখা গেল 'বাধা' এসেছে। এবং সে বাধা এসেছে অত্যন্ত প্রবলভাবে কোন পেঁচা-পেচীর পক্ষ থেকে নয় ভারতের কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী খোদ কেদার পাণ্ডে মহাশয় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "আমরা ত্রি-পক্ষীয় হতে দিতে রাজী নই। বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের প্রস্তাবে ভারত রাজী হতে পারে না। পরিষ্কার কথা গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই করতে নেপালকে অন্তর্ভুক্ত করার বাংলাদেশী প্রস্তাবে ভারত সরকার রাজী নয়" ভারতীয়

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রীর এই খোলামেলা কথার পর এ ব্যাপারে প্রত্যাশা করার আরো কোন সুযোগ আছে বলে আমাদের মনে হয় না—তবু চেষ্টাতো আর তা বলে ছেড়ে দেয়া যায় না।

আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের পথে দুস্তর বাধা বর্তমান। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো মোটের উপর কৃষিভিত্তিক এবং কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত আহরণ করেই কেবল সাফল্য-জনকভাবে দেশে শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের কৃষিখাত থেকে এখন পর্যন্ত কোন উদ্বৃত্ত আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই অবাঞ্ছিত অবস্থার পশ্চাতে ভূমি মালিকানা কাঠামোসহ আরও নানা কারণ বিদ্যমান। তবে এখন পর্যন্ত প্রকৃতি-নির্ভর আমরা আমাদের আবাদী জমির খুবই সামান্য একটা অংশকে মাত্র (১৩ শতাংশ) এ যাবত সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশ একটা বহুশ্রুত ও কীর্তিত নদীমাতৃক দেশ হওয়া সত্ত্বেও শুকনো মৌসুমে বহু নদীতে পানি থাকে না এবং বড় বড় নদীগুলির পানি প্রবাহ নিদারুণ-ভাবে কমে যায় ও নাব্যের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃত পক্ষে যে সময় ফসলের ক্ষেতে পানি সেচ দেয়া প্রয়োজন, সেই খরার মওসুমেই বড় বড় নদীতে পানি প্রবাহ অস্বাভাবিকভাবে কমে যায় আর ছোট ছোট নদী নালা খাল-বিলগুলিতে গিয়ে দেশটা সাময়িকভাবে পরিণত হয় প্রায় মরুভূমিতে। সমস্যাটা বহুল আলোচিত এবং বাংলাদেশে এমন কেউ নেই যে এই বিষয়টা সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। আমরা জানি এবং পূর্বাপর সরকার পক্ষ থেকেও আমাদের বহুবার জানানো হয়েছে যে, আমরা আমাদের আবাদী জমির সবটা না হলেও অধিকাংশকে যদি সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনতে পারি তাহলে আমাদের খাদ্য ঘাটতি তো থাকবেই না উপরন্তু আমরা অচিরেই খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হব। কথাটা মিথ্যা নয়। কারণ বাংলাদেশের জমির মত উর্বর জমি পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। আমাদের একর প্রতি ধান উৎপাদনের রেকর্ড আছে ১৪০ মণ। অথচ একর প্রতি আমাদের উৎপাদন হয় মাত্র ১৫ মণ। এ অবস্থায় খুব সহজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আমাদের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রধান অন্তরায় হলো পানি এবং আমাদের মহৎ প্রতিবেশী দেশ ভারতই আমাদের অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

বিকাশের প্রধান এবং আদি হেতু। পানির স্বাভাবিক সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করে আমাদের জাতীয় অর্থনীতির গলায় ফাঁসি পরিয়ে দিয়েছে। কাজেই পানি সরবরাহের ব্যাপারে ভারত যদি তার নিজেরই আরোপিত বাধা অপসারণে সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে না আসে তবে 'যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠন করে ভারত আমাদের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন সাধন করে দেবে তা ভাবা বালখিল্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩

তৃতীয় বিশ্ব ও পরিবেশ পরিকল্পনা বিষয়ক দু'জন নামজাদা বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি মত প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশ ও ভারতের পানির চাহিদা পূরণের জন্য গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে নেপালে গঙ্গার উজানে জলাধার নির্মাণ করা। যুক্তরাজ্যের ওপেন ইউনিভারসিটি থার্ড ওয়ার্ল্ড এ্যাফেয়ার্সের অধ্যাপক ডঃ বেন এবং জাতিসংঘের পরিবেশ পরিকল্পনা বিভাগের নির্বাহী পরিচালক ডঃ অমিত বিশ্বাস বি. বি. সি'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—নেপালে পানিধার নির্মাণ করা হলে শুধু গঙ্গা নদীতে পানি প্রবাহই বৃদ্ধি পাবে না বরং বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের জন্য বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনাও সৃষ্টি হবে। এই বিশেষজ্ঞদ্বয়ের মতে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের জন্য জলাধারের পানি ও বিদ্যুতের অংশ নির্ধারণ একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে করা যেতে পারে। এর ফলে সবচেয়ে বেশী সুবিধা হবে অবশ্য নেপালের। জলাধার নির্মিত হলে নেপালের অর্থনীতি উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধনের সুযোগ লাভ করবে।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের গঙ্গা নদীর পানির হিস্যা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছে দীর্ঘদিন। ইতিপূর্বেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনেক বিশেষজ্ঞ এই বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে নেপালকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবে ভারত কর্ণপাত করেনি। বরং ভারত অদ্ভুত রকমের বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করেছে! সে প্রস্তাবটা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ খাল খনন করে ব্রহ্মপুত্রের পানি গঙ্গায় চালান করে গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধি করার। ভারতের পক্ষে এ প্রস্তাবটি চানক্য কুটনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অতি উত্তম। সংযোগ খাল খনন করা হবে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে এবং গঙ্গা নদীর সঙ্গে এই খালটি যে স্থানে সংযুক্ত হবে সেটি বর্তমানে ভারতীয় ভূ-খণ্ড! অর্থাৎ সংযোগ মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্রের পানিও ভারতীয় পক্ষের করায়ত্ত হবে। কি খালের চমৎকার প্রস্তাব!

www.pathagar.com

আজ ভারতের কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে হয়ত আমাদের সরকারের সম্পর্ক ভাল আছে। কিন্তু সে সম্পর্ক চিরকাল ভাল থাকবে—তার কোন গ্যারান্টি আছে কি? (খোদা না খাস্তা) পরিস্থিতি যদি এমন হয় অর্থাৎ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের যদি অবনতি ঘটে! এক গঙ্গার পানি প্রবাহ ক্ষীণ হয়ে যাবার ফলে আটটি জেলা প্রায় মরুভূমির দশায় পরিণত হয়েছে, তখন সমগ্র বাংলাদেশটাই পরিণত হবে মরুভূমিতে। বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের এই সংযোগ খাল খননের প্রস্তাব বিবেচনা করার আগে আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, আমরা কি এমন পদক্ষেপ গ্রহণের ঝুঁকি নেব—যাতে চিরকাল ভারতের সঙ্গে আমাদেরকে যেকোন অবস্থায় সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে বাধ্য থাকতে হবে? এ সম্পর্কে অধ্যাপক বেন পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, "ব্রহ্মপুত্রের সংগে গঙ্গার সংযোগ সাধনকল্পে সংযোগ খাল নির্মাণের ভারতীয় প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে পানির নিয়ন্ত্রণ ভারতীয়দের হাতেই থাকবে। ফারাক্কা এখনও ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এরপর ব্রহ্মপুত্রের পানিও ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। যদি কোন কারণে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিন্ন হয় সেক্ষেত্রে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে। সংযোগ খাল সেচের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য ফলদায়ক হলেও তার পরিণাম খুবই সামান্য কিন্তু খালের জন্যে যে জমি খনন করতে হবে তার মূল্য অনেক বেশী। সংক্ষেপে এই খাল বাংলাদেশের জন্য সাংঘাতিক অপচয়।" বাংলাদেশের ফারাক্কার প্রভাব প্রসঙ্গে জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ ডঃ অমিত বিশ্বাস বলেছেন, "বাঁধের ফলে বাংলাদেশের শুষ্ক মৌসুমে সেচের জন্য পর্যাপ্ত পানি থাকে না। অধিকন্তু দেশের নৌ-পরিবহন ব্যবস্থাতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে এবং পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় সমুদ্র থেকে নদীতে লোনা পানি প্রবেশ করছে।"

বাংলাদেশে গঙ্গার বিভিন্ন উপনদী ও শাখা নদীতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফল যে কি মারাত্মক হয়েছে আমরা সবাই তা জানি। খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল সহ অনেক কল-কারখানার জন্য বার্জে করে অনেক দূর থেকে মিঠা পানি আনতে হয়। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় অনেক বেড়ে যায় এবং লোনা পানি প্রবাহে মেশিনপত্রের আয়ুষ্কালও অনেক কমে যায়। সুতরাং আমাদের জাতীয় শিল্পের বিকাশের পথে লোনা পানির সমস্যাও

www.pathagar.com

একটি প্রচণ্ড সমস্যা যা আমরা অনেকেই যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারিনে।

আলোচনার শুরুতে আমি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে বলে উল্লেখ করেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এটাও বলতে চাই যে, বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের ব্যাপকতম সম্ভাবনাও রয়েছে যা নানা রকম সংস্কারবশতঃ আমরা সঠিক উপলব্ধি করতে পারছিনে। আমরা সবাই জানি, আমাদের জাতীয় অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক আর তা খুব দুর্বল। এ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে আমাদের অবশ্যই জাতীয় শিল্পের বিকাশ ঘটাতেই হবে। এরজন্য আমাদের যেখানে যেটুকু সম্ভাবনা আছে তার সবটাই কাজে লাগাতে হবে। আমাদের আছে বিশ্বের সর্বাধিক উর্বর জমি এবং প্রচুর শ্রমশক্তি। আমাদের একরপ্রতি ধান উৎপাদন হয় গড়ে মাত্র ১৫ মণ। এটা অবশ্যই একরপ্রতি ১০০ মনে উন্নীত করা যায়। তার জন্য প্রয়োজনীয় যতদূর সম্ভব বেশী বেশী জমি সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা। এ প্রসঙ্গে ডঃ বেন বলেছেন, "বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত কোন ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের বলিষ্ঠ সংকল্প থাকা সত্ত্বেও এটা সম্ভব হচ্ছে না—তার কারণ ফারাক্কা বাঁধের দরুন গঙ্গা নদীতে পানি প্রবাহ অনিশ্চতার অজুহাতে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি সংস্থাসমূহ বাংলাদেশকে পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য দিচ্ছে না।" ডঃ বেন-এর এ বক্তব্য খুবই সঠিক। বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মূল চাবিকাঠিটি রয়েছে ভারতের হাতে। এ ব্যাপারে মনোভাব অনুকূল না হলে বাংলাদেশের পক্ষে ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠিত হয়েছে সে ব্যাপারে ভারত অনেক ভাল ভাল কথা বলেছে। ভারতীয় পক্ষ থেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে, তারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কামনা করে এবং এ বাবদে তারা সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা দিয়ে যেতে সর্বদা প্রস্তুত। ভারতের এ বক্তব্যে অনাস্থা পোষণ করতে চাইনে—কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো গঙ্গানদীর পানি প্রবাহ আটকে রেখেছে কেন? এবং গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধি করতে হলে যেখানে নেপালের সহযোগিতা অপরিহার্য সেখানে

www.pathagar.com

নেপালকে অন্তর্ভুক্ত করতে ভারতের এত আপত্তির কারণ কি? আমরা জানিনে এর পেছনে ভারতের অন্য কোন গুঢ় অভিপ্রায় আছে কি না?

এক সময় নেপাল বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নেপাল-বাংলাদেশ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারতের কাছে ভারতীয় এলাকা (প্রায় ১১ মাইল রেলপথ) ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি করে কিন্তু ভারত সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। ভৌগোলিক কারণে নেপালের পক্ষে বিশ্ব-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতে হলে ভারতের সাহায্য প্রয়োজন। ভারত সম্মত হলে একটা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে আমরাও নেপালের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ লাভ করতাম। নেপালকে আমাদের চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের বিনিময়ে কিছু আর্থিক সুবিধা দিতে হতো। সে সুবিধা থেকেও ভারত আমাদের বঞ্চিত করেছে। এখন গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির ব্যাপারে নেপালকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে আমাদের সবারই সুবিধা হয়। কিন্তু ভারত অন্যের সুবিধা হয়—এদিকে নেই। ভারত তার পূর্বেকার বক্তব্যেই অনড় থেকে যাচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি না, আমাদের জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিকর একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভারত যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের মাধ্যমে আমাদের কি মঙ্গলটা সাধন করবেন! সবাই জানেন, ভারত মূলতঃ একটি কৃষিভিত্তিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও শিল্পে দ্রুত বিকাশমান একটি আধুনিক রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে। তার শিল্পের বিকাশ এখন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী স্তরে না পৌঁছালেও অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকায় বাজার দখল ও কাঁচামালের স্থায়ী উৎস সন্ধানের আকাঙ্খা তার চরিত্রে অনুপস্থিত নয়। তাছাড়া বাংলাদেশ ও ভারতের অর্থনীতি পরস্পর পরিপূরক বলে উল্লেখ করা হলেও দু'দেশের অর্থনীতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক উপাদানও বর্তমান। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রধান শিল্প পাটের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

যাই হোক তবুও আমরা আশা করব বৈষয়িক অবস্থা যা-ই বিদ্যমান থাকুক এবং অতীতে যাই ঘটুক প্রতিবেশী হিসেবে ভারত আমাদের জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে অনুকূল সহযোগিতা যুগিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

কলাবরেটর

'বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি নিল চুপে চুপে বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে।' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামের ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে এসেছিল একদা বাণিজ্য ব্যপদেশে এবং বাণিজ্য করতে করতেই এ দেশের বর্ণ হিন্দুদের প্ররোচনায় সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ক্রমশঃ তাদের মনে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ বণিকের দাঁড়ি পাল্লার দণ্ডটা একদিন রাত পোহালে মাত্র দেখা গেল যে, শাসকের রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে, ব্যাপারটা অত সহজও ছিল না আকস্মিকও নয়। বিশেষতঃ বঙ্গ অর্থাৎ বাংলার মুসলিম জনগণ ইংরেজ বণিকের তুলা দণ্ডের রাজদণ্ডে রূপান্তরকে সহজে স্বীকার করেও নেয়নি। তবে সবসময় যেমন হয়ে থাকে বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধা শিকারী লোক তাদের নতুন প্রভুকে গঙ্গাজলে অভিষিক্ত করে নিয়েছিল ঠিকই এবং একান্ত জন নিন্দিত এই ঘটনাটা তারা ঘটিয়েছিল নিতান্ত চুপে চাপে তাও ঠিক।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার কবি। বলা হয়ে থাকে তিনি বাংলাভাষাভাষী জনগণের কবি। আপন সৃষ্টি প্রতিভায় বাংলাভাষাকে তিনি বিশ্বের দরবারে স্থান দিয়েছেন সুতরাং তিনি বিশ্বের কবি। এই বিশ্ববরেণ্য বাঙ্গালী কবি যখন লিখলেন, বাংলার জনগণ বণিক ইংরেজের শাসক শক্তিতে উত্তরণের ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন (গঙ্গাজলে অভিষেক) তখন কি তিনি ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছিলেন? নাকি এটা তার ব্যাঙোক্তি? তাঁর স্বদেশের মানুষ একদা বণিক ইংরেজের শাসক ইংরাজে পরিণত হবার তৎপরতাকে কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হননি বলেই কি স্বজাতির প্রতি এই ভাষায় তিনি অভিমান প্রকাশ করেছেন? উপমহাদেশে শাসন ক্ষমতায় সভ্য ইংরেজের প্রতিষ্ঠাকে তিনি ইতিহাসের এক অনিবার্য শুভ সূচনা বলে মনে করেছিলেন যেমন অনেক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকই করে থাকেন। যে বিখ্যাত "শিবাজী উৎসব" শীর্ষক

www.pathagar.com

কবিতা থেকে এই পংক্তি দু'টি চয়ন করা হয়েছে সেই কবিতাটি যারা সযত্নে পাঠ করেছেন এবং তথাকথিত পতিত ভারত ভূমিতে সভ্য ইংরাজের শাসনকে পরমেশ্বরের আশীর্বাদ বলে বর্ণিত, আরও কিছু কবিতা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, রবীন্দ্রনাথ বস্তুতঃই ইংরাজের রাজদণ্ডকে পতিত পাবনী ন্যায়দণ্ড মনে করেছিলেন, "গঙ্গোদ"কে অভিষেক কথাটি সুতরাং তিনি সদার্থেই ব্যবহার করেছেন। এটা মোটেই তাঁর ব্যাঙোক্তি ছিল না।

কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্নের কষাঘাতকে আমরা কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারি না। বাংলাদেশের জনসাধারণ ইংরাজের রাজ্যলাভকে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, আদৌ তেমন সহজে গ্রহণ করেনি। অথচ বাংলাদেশের তথা উপ-মহাদেশের ইতিহাসে অজস্র রক্তপ্রাত আর অশ্রুপাতের ঘটনায় সে কাহিনী ক্লেদাক্ত হয়ে আছে, সেই ঘটনাবলীকে তিনি অমন আশ্চর্য সুষমায় মণ্ডিত করলেন কি করে? বাংলাদেশের জনগণের শত-বর্ষব্যাপি মুক্তি সংগ্রামকে উপেক্ষা করে তিনি কি করে বলতে পারলেন, বর্ণিত ইংরেজের রাজদণ্ডকে বাংলার জনগণ গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করে নিলো চুপে চুপে, সামান্য কিছু ব্যাতিক্রম ধর্মী কবিতা ও কবিতাংশ বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যকৃতির মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসের চরমতম কৌতুক হলো এই যে, উপমহাদেশে দখলদার বৃটিশ উপনিবেশবাদের একজন সোচ্চার সমর্থক ও কলাবরেটর হওয়া সত্ত্বেও জালিনওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে একদা গৃহীত তাঁর স্যার উপাধি বিনীতভাবে পরিত্যাগ করেই তিনি হয়ে গেলেন সেরা দেশপ্রেমিক, প্রকৃতপক্ষে কবি রবীন্দ্রনাথ উপমহাদেশে বৃটিশ উপনিবেশ-বাদের সমর্থক বা কলাবরেটর ছিলেন দেশপ্রেমিকের দৃষ্টিতে এটা যদি চারিত্রিক বিচ্যুতি হয় তাহলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে একা রবীন্দ্রনাথ এই বিচ্যুতির জন্য দায়ী ছিলেন না।

মরহুম মোতাহার হোসেন চৌধুরী শান্তি নিকেতনে কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আপনার লেখায় ইসলাম ও বিশ্বনবী সম্পর্কে কোন কথা নেই কেন। উত্তরে কবি বলেছিলেন: কুরআন পড়তে শুরু করেছিলাম, বেশী দূর এগুতে পারিনি, আর তোমাদের রসূলের জীবন চরিত্রও ভাল লাগেনি। এটাই স্বাভাবিক। এখানে রবীন্দ্রনাথ সত্তার পরিচয় ছিয়েছেন তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তার কাছে অন্য কোন আদর্শ ভাল না লাগারই কথা।

www.pathagar.com

এটাই সাংস্কৃতিক দাবী। তাই তার সৃষ্টি হিন্দু সংস্কৃতির বাহক। এটাকে যাঁরা ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতির রূপ দিতে প্রয়াস পাচ্ছে, তারা রবীন্দ্রনাথ নামের প্রতি অবিচার করছেন। সংস্কৃতি যেহেতু বিশ্বাসের ফসল তাই তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণে যাদের মাথা নত করে পূজা করার রীতি তাদের গুরু কবির কণ্ঠে স্বাধীনতা হরণকারী ইংরেজ প্রভুর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয় মহা উল্লাসে, "তব করুণার রাগে, নিদ্রিত ভারত জাগে তব চরণে নত মাথা" আর্ষ কবি রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় খ্রীষ্টান বণিক-দিগকে বরণে "জনগণ মন অধিনায়ক ভারত ভাগ্য বিধাতা" এবং "এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খ্রীষ্টান।"

রবীন্দ্রনাথ যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সম্প্রদায় সামগ্রীকভাবেই উপমহাদেশে বৃটিশ দখলদারীত্বকে বরণ করে নিয়েছিলেন সানন্দে। বাণিজ্য উপলক্ষে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতে আসে, তখন ভারতীয় উপমহাদেশের একচ্ছত্র শাসক ছিলেন মুসলমানরা। মুসলমানদের কাছ থেকেই তারা রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হিন্দুদের সহযোগিতায় কেড়ে নেয়। অন্য পক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে বৃটিশ বণিকের এই রাজ্য লাভ ছিলো অনেক আকাঙ্খিত ঘটনা। এবং নতুন শাসকদের কাছে তাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু মুসলমানদের কাছে এটা ছিলো একটা মর্মান্তিক ঘটনা। রাজকীয় অধিকার থেকে শাসিতের অবস্থানে নেমে আসার গ্লানিতো ছিলই, তার উপর ছিলো রাষ্ট্রশক্তি পুনরুদ্ধারের সুকঠিন দায়িত্ব ও দুর্ভাবনা। সে ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে এটা ছিল নেহায়েতই প্রভুবদল। এই অন্যথা বিচিত্র ঘটনার ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা যাই হোক উপমহাদেশের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের কাছে উপমহাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছিলো দুই রকম। মুসলমানরা যখন বৃটিশ শক্তির কাছ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য প্রাণান্ত সংগ্রাম করে চলেছে, তখন হিন্দু সম্প্রদায় উপ মহাদেশে বৃটিশ শাসনকে পাকাপোক্ত করার জন্য এগিয়ে চলেছে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে।

১৭৫৭ সালের আগে প্রায় দীর্ঘ হাজার বছর ধরে দু'টি সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করেছিলো। মুসলমান নৃপতিরা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি—কিন্তু

www.pathagar.com

তাতে কোন সুদূর প্রসারী ফল হয়নি। সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রতি-বেশীসুলভ মৈত্রীর অভাব না হলেও "উচ্চ বর্ণের" বহিরাগত হিন্দুদের মধ্যে সর্বদা সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি জাগ্রত ছিলো এবং বৃটিশ শাসকরা 'বিভক্ত কর এবং শাসন কর' এই নীতির ভিত্তিতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে সাম্প্রদায়িক জিঘাংসায় রূপান্তরিত করার জন্য এক সম্প্রদায়কে নানা রকম অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কাছে টেনে নেয় এবং অন্য সম্প্রদায়কে আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে দূরে সরিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য বৃটিশ উপনিবেশবাদে এই কৌটিল্যনীতি তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আশ্চর্য-রকম ফলদায়ক হয়েছিলো। মুসলমানরা যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিলো পলাশীর প্রহসনমূলক মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকেই (১৭৬৩ সাল) সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুরা বস্তুতঃ প্রথম অংশগ্রহণ করে মাত্র ১৯০৫ সালে। বৃটিশ ভারতের গভর্ণর লর্ড কার্জন বাংলাদেশের মুসলমানদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার খেসারত স্বরূপ যখন বঙ্গ প্রেসিডেন্সীকে ভেঙ্গে বাংলা ও আসাম নিয়ে মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গ গঠণ করেন তখনই কেবল হিন্দু জমিদার ও বণিকরা বঙ্গ ভঙ্গ রদের দাবী নিয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শুরু করেন। কিন্তু ইতিহাস পাঠকরা জানেন, হিন্দু অভিজাততন্ত্র ও হিন্দু বণিকদের সেই রাজনীতি আদতেই বৃটিশ বিরোধী ছিল না, ছিল মুসলমান বিরোধী এবং সে রাজনীতি ছিলো মুখ্যতঃ আবেদন আর নিবেদনের। এ কথা সবারই স্মরণ থাকতে পারে যে, উপমহাদেশে বহিরাগত হিন্দু অভিজাতদের উদ্যোগে প্রথম যে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগ্রাম সংগঠিত হয় তা বৃটিশ বিরোধী ছিল না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পাঁচজন সভাপতি ছিলেন বৃটিশ।

বাংলাদেশে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় সুরেন্দ্র নাথের নেতৃত্বে। একই সময় বৃটিশের বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দু যুবকরা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস "আনন্দমঠ"-এর দ্বারা অনুপ্রাণীত হয়ে অনিয়মতান্ত্রিক সন্ত্রাসবাদ শুরু করে। এই সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের সঙ্গে মুসলমান বাঙালীর কোন সম্পর্ক ছিল না। কারণ এই সন্ত্রাসবাদ ছিলো পুরোপুরিভাবে সাম্প্রদায়িক এবং হিন্দু দেবী "কালীর" মন্দিরের চৌকাঠ স্পর্শ করে এই সন্ত্রাসবাদী মন্ত্রে

www.pathagar.com

দীক্ষা নিতে হতো। এই নিয়মের কোন ব্যাতিক্রম ছিল না বলে ঈমান ও আকিদা বহির্ভূত এই প্রথা স্বীকার করে কোন মুসলমানের পক্ষে এর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। এদেশের মুসলমানদেরকে বস্তুতঃ সংগ্রাম করতে হয় দুই শক্তির বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে বৃটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এবং দেশীয় জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং পলাশীর প্রান্তরে উপমহাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে শোচনীয় নাটকটির অভিনয় শেষ হবার পর থেকেই মুসলমানদের এ সংগ্রামের শুরু হয়েছিল। ১৭৬১ সালে মজনুশাহ এবং ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন পর্যন্ত এ সংগ্রাম ছিলো অব্যাহত।

১৭৫৭ সালের পলাশীর বিপর্যয়ের পর থেকে ১৯০৫-এর বঙ্গ-ভঙ্গ পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১৪৮ বছর ধরে এদেশের মুসলনানরাই এককভাবে বৃটিশ দখলকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। এদেশের হিন্দুদের এ সংগ্রামে কোন অবদানতো ছিলই না; বরং ইংরাজ দখলদারীত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্রতী ছিলেন। বৃটিশ কর্তৃত্বে আসার পর উপমহাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর নিদারুণ এক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। মুসলমানরা বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে যখন নিদারুণ দুঃখ কষ্ট বরণ করছিল আর বৈষয়িক জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করছিলো তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপুলসংখ্যক লেখক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবির জন্ম হয়। এ সব সাহিত্যিকবর্গের মধ্যে একটা বক্তব্যে সবাই সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে যে, এদেশে মুসলমানরা বহিরাগত—সুতরাং এদেশে তাদের বহিরাগতদের মর্যাদা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এসব লেখক ও প্রচারকদের মধ্যে সম্রাট ছিলেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বলে রাখা প্রয়োজন যে, উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ থাকতে পারে বলে এখনও বিশ্বাস করে না। বহিরাগত আর্যরা মধ্য ভারতেই বসবাস করে এবং এখন যারা ভারত শাসন করছে তারা বহিরাগত আর্যদেরই বংশধর এবং ইদানিং হিন্দু নামে পরিচিত।

এই সাহিত্যের আকাশে সম্রাট পদবাচ্য এই ("বঙ্কিমচন্দ্র") ভদ্রলোকের সাহিত্য কৃতির মূল প্রতিপাদ্য ছিল এদেশের হিন্দুদের। শুধুই হিন্দুর! এদেশের "বহিরাগত" অন্যান্য ম্লেচ্ছ যবনদের মত মুসলমান-

www.pathagar.com

রাও যবন ও ম্লেচ্ছ। বলাবাহুল্য মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ শুধুমাত্র কাব্য সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বৃটিশের বৈষয়িক আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সম্প্রদায় রাজনৈতিকভাবেও মুসলিম বিরোধী বক্তব্য প্রচার করতে শুরু করে। প্রসঙ্গতঃ আর্য সমাজের প্রখ্যাত নেতা লালা হরদয়াল (১৯২৪ সালের ২০শে জুনের) "তেজ" পত্রিকায় যে নীতিগত ঘোষণা প্রচার করেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) হরদয়ালের নীতি ঘোষণাটি হলো ঃ—হিন্দুর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে চারটি স্তম্ভের উপর, এগুলি হলো ঃ—

(ক) হিন্দুদের সামগ্রিক সংহতি।

(খ হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

(গ) মুসলমানদের সার্বিক হিন্দুকরণ বা এদেরকে শেষ করে দেয়া এবং

(ঘ) আফগানিস্তানসহ ভারত বর্ষের সন্নিহিত এলাকাসমূহ দখল।

এই চারটি লক্ষ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু বংশধরদের ভাগ্য ও তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়েই থাকবে। অবশ্য এ সবই অনেক পরের ঘটনা। সাহিত্য-সাংবাদিকতা বৃটিশ বিরোধী নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায় যখন হিন্দুদের সঙ্গে প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল তখন এই অপপ্রচারের জবাবও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামের গৌরবময় অধ্যায় এককভাবে মুসলমানরাই রচনা করেছিল এবং সে সংগ্রামে হিন্দুরা শুধু সহযোগিতা দান থেকে বিরত ছিল তাই নয়, বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের বৃটিশ উপনিবেশবাদের সহযোগী প্রতিপক্ষ হিসাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

মনীষী আবুল হাশিম তাঁর সংহতি নামক গ্রন্থে লিখেছেন—বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী আন্দোলনের গুণমুগ্ধ ভক্তরা উপমহাদেশের একশ' বছরের ইতিহাসকে মুছে ফেলতে পারলে ভারি স্বস্তিবোধ করতেন। মুসলমানরা ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত একটানা সংগ্রাম চালিয়েছিল বৃটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে—যখন আর্মস রেগুলেশনের আওতায় মুসলিম সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, হিন্দুরা এ সময় বৃটিশ উপনিবেশবাদের শক্তিকে সংহত করার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করেছিল আর সংগ্রামী মুসলমানদেরকে যাতে তারা সামাজিক-

www.pathagar.com

ভাবে দীন-দারিদ্র কাঠুরে আর তিস্তিওয়ালা হয়ে থাকতে বাধ্য হয় তারই জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলো।' মনীষী আবুল হাশিম যে সময়টাকে একশ' বছর বলে উল্লেখ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা একশ' বছরেরও বেশী। কারণ যদিও নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে তথাপি ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংগঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকি ভারতীয় হিন্দুদের উদ্যোগেও কংগ্রেস গঠিত হয়নি। বৃটিশ উপনিবেশবাদের কূটনীতি খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল যে, এদেশের হিন্দুরাই তাদের মিত্র ও সহযোগী, কাজেই বৃটিশ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রামশীল মুসলিম সম্প্রদায়ের দমনের জন্য হিন্দুদেরকেই শলাকাশীপ হিসেবে বেছে নিলো এবং সংগঠিত করলো। বৃটিশদের এই কূটনৈতিক উপলব্ধি সবই সঠিক ছিলো, অন্ততঃ তাদের স্বার্থের দিক দিয়ে তো বটেই। সুতরাং মুসলমানদের নগণ্য সংখ্যালঘুর পর্যায়ে নামিয়ে আনা ও সর্বোতোমুখী পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে হিন্দুদের সার্বিক সমর্থন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৃটিশ ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফরীন ও অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জনৈক অফিসার এ্যালেন অকটভিয়াস্ হিউম ১৮৮৫ সালে তথাকথিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠন করেন। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত (নির্বাচিত নন) হন ডব্লিউ সি. ব্যানার্জী। এরপর পাঁচজন বৃটিশকে পরপর এ সংগঠনের সভাপতি নিযুক্ত হতে দেখা যায়। ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে সেসনে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন জর্জ জুলে। ১৮৮৯ সালে বোম্বাই সেসনে স্যার ডব্লিউ ওয়েডার বার্ন, ১৮৯৪ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন আলফ্রেড ওয়েভ, ১৯০৪ সালে বোম্বাই অধিবেশনে স্যার হেনরী কটন, পুনশ্চ ১৯১০ সালের এলাহাবাদ সেসনে স্যার ওয়েডার বার্ন এবং ১৯১৭ সালের কলকাতা সেসনে কংগ্রেসের সভানেতৃত্ব করতে দেখা যায় এ্যানি বেসান্তকে। সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস যে বৃটিশ বিরোধী ছিল না—পর পর পাঁচজন ইংরাজ সন্তানের কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকরণই তার একমাত্র প্রমাণ নয়। প্রাদেশিক গভর্ণর ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদেরকেও কংগ্রেসের সভায় যোগদান করতে দেখা যেত। এ ছাড়া কলকাতায় কংগ্রেসের

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধিবেশনের সময় স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল কংগ্রেস সদস্যদের সম্মানার্থে একটি সম্বর্ধনা সভারও আয়োজন করেছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যে আদৌ বৃটিশ বিরোধী ছিল না, সে সম্পর্কে প্রখ্যাত 'বুদ্ধিজীবি" রজনী পাম দত্তের "ইণ্ডিয়া টুডে এণ্ড টুডে এণ্ড টুমরো" গ্রন্থের বক্তব্য স্মরণ করা যায়। "২০ বছরের জন্য (১৮৮৫—১৯০৫) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের নির্দেশিত পথ ধরেই বিকশিত হয়েছিলো। এই কুড়ি বছরে এমন কি স্বায়ত্তশাসনের কোন মৌলিক দাবিই উত্থাপিত হয়নি। অর্থাৎ কোন প্রকার মৌলিক দাবীই জাতীয় কংগ্রেসে প্রস্তাব করা হয়নি; কেবলমাত্র প্রশাসনে বেশী বেশী মাত্রায় ভারতীয় হিন্দু, প্রতিনিধিত্ব দাবী করা হয়েছিল" কংগ্রেসের ১৮৮৯-এর সেসনে সভাপতি আনন্দ মোহন বসু ঘোষণা করেছিলেন, শিক্ষিত ভারতীয়রা ইংল্যাণ্ডের শত্রু নয়, বরং বিশ্বস্ত মিত্র। কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বোধকরি সবচেয়ে চমৎকার বক্তব্য হাজির করেছেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী—"কংগ্রেসের আদর্শ হলো, বৃটিশ রাজের প্রতি অবিচল আনুগত্যের সংগে কাজ করে যাওয়া। ···ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত্তিকে দুর্বল না করে তাকে জাতীয় চিরন্তণ অনুরাগের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য"।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে, শতকরা একশত ভাগ বৃটিশপন্থী ছিলো তা প্রমাণ করার জন্য বোধকরি আর কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। ওয়াকিবহাল মহল জানেন, বৃটিশ সরকারের একজন এজেন্ট হিসাবে এ্যালেন অক্টোভিয়াস হিউমই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার পথ নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিনষ্টকারী "এক ভারত এক জাতি" এই তত্ত্ব ইনিই প্রথম প্রচার করেন। ১৭৫৭—১৯৪৭ পর্যন্ত ইংরেজ ও হিন্দুরা যে মুসলমানদের ক্ষতি করে আসছিলো তা অন্যায় ও বে-আইনীভাবে পাঞ্জাব-বাংলা বিভক্ত করে শেষ প্রমাণ করলো যে, এই যুক্ত শক্তি মুসলমানদের বন্ধুত্বতো নয়ই, বরং বৈরী হয়ে কাজ করে যাবে। ১৮৮৯ সালে এই তত্ত্বটি (এক ভারত, এক জাতি) প্রচারিত হয়। তৎকালীন ভারতে মোট জন সংখ্যার শতকরা ৭২ ভাগ ছিলো হিন্দু (তপসীলী ও হরিজনসহ) বাকী দেশীয় খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও মুসলমান। (এখনও যারা ভারত শাসন করছে তারা বহিরাগত বর্ণ হিন্দু। তাদের মোট-

www.pathagar.com

জনসংখ্যার শতকরা ১৮-২০ এর অধিক নয়। অধিক জনগোষ্ঠীকে তারা এখন পুড়িয়ে মারছে।

"এক ভারত এক জাতি" এই তত্ত্ব প্রচার করাতে মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত হয়ে পড়ে। কারণ, দীর্ঘদিনের একক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলো যে, বৃটিশ শাসকদের দেশীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের অশুভ আঁতাত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তেমনই নীতিগতভাবে 'সব ভারতবাসী মিলে একটি জাতি' এই তত্ত্বের রাজনৈতিক তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে এই যে, মুসলমানরা স্বাধীন জাতি হিসেবে আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

গোড়া থেকেই হিন্দুরা, বিশেষ করে বহিরাগত বর্ণবাদী হিন্দুরা বৃটিশ তোষণ নীতি কার্যকরী করতে শুরু করেছিল। বলাবাহুল্য, বৃটিশ শাসকরাও তা উপলব্ধি করতো। ১৮১৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যাবলী তদন্তের জন্য যে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়, স্যার জন ম্যালকম সেই কমিটির পূর্ণাঙ্গ সভায় স্বীকার করেন যে, 'ভারতবর্ষে' আমাদের নিরাপত্তার প্রধান উৎস হলো, ভারতীয় হিন্দুদের সহযোগিতা। কর্ণেল টমাস মুনরো ঐ কমিটির কাছে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন, অসন্তুষ্ট মুসলমানরা কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে না—যতক্ষণ হিন্দুরা আমাদের সাথে আছে।' ১৮১৩ সালের তৎকালীন বড়লাট এ্যালেন বরো ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছে লেখেন যে, মুসলমানরা আমাদের জাতশত্রু—এই সত্য আমরা উপেক্ষা করতে পারি না এবং আমাদের সঠিক নীতি হওয়া উচিৎ হিন্দুদেরকে বন্ধুভাবে লালন করা।

বৃটিশ শাসকরা উপমহাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে অবশ্য বন্ধু ভাবেই লালন করেছিলো এবং আত্ম প্রতিষ্ঠাকামী হিন্দুরাও বুঝতে পেরেছিলো, বৈষয়িক জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বৃটিশ শাসকদের সহযোগিতা করে যাওয়া সম্মানজনক না হলেও সুবিধাজনক ও নিরাপদ। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা নগরীর পত্তন করার পর আমরা দেখতে পাই, কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটি ব্যবসায়ী শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটেছে এবং কল্পনাতীত দ্রুততার সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুৎসুদ্দীগিরি করে তারা ধনশালী হয়ে উঠেছে। এই মুৎসুদ্দী ধনীক শ্রেণীর দেশপ্রেম

www.pathagar.com

নিয়ে কটাক্ষ করা নিরর্থক। কারণ মুৎসুদ্দী এই শব্দের অর্থই হল দালাল বা কলাবরেটর। কাজেই আমাদের আলোচনা থেকে বৃটিশ বণিকদের উচ্ছিষ্টজীবী এই ধনপতিদের প্রসঙ্গ বাদ দেয়াই ভাল। যদিও ভারতীয় উপমহাদেশের বিগত দু'শ বছরের বনেদী হিন্দু পরিবারগুলি বৃটিশ খ্রীষ্টান বণিকদের মুৎসুদ্দীগিরি করেই ধনার্জন করেছিলো এবং আমরা আমাদের আলোচনার সূত্রপাতে যে বিশ্ববরেণ্য আর্য্য কবির কথা বলেছি তাঁর পিতামহ ছিলেন—এ রকম একজন মুৎসুদ্দী। ইংরেজ শাসকরা পরে যাকে 'প্রিন্স' (রাজকুমার) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই মুৎসুদ্দী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে কংগ্রেসের প্রথম সিকি শতাব্দীর ভূমিকাকে যদি আমরা উপেক্ষাও করি তা হলেও আমরা দেখতে পাব, ভারতবর্ষের অনেক নাম করা হিন্দু ঐতিহাসিক, সাংবাদিক ও লেখক বৃটিশ শাসনকে এদেশের জন্য অভিশাপের বদলে আশীর্বাদ মনে করেছেন। পলাশী যুদ্ধের পর ভারতে বৃটিশ শক্তির উত্থানকে স্যার যদুনাথ সরকার পৃথিবীর ইতিহাসে নজীরবিহীন এক গৌরবময় প্রভাতের শুভ সূচনা বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এ দেশের মুসলমানরা যখন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হাতে তুলে নিয়েছে, তখন একজন অগ্রণী বিদ্বান উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনকে স্বাগত জানাচ্ছে—এই ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। আরও উপেক্ষা করা যায় না, যখন দেখা যায় যে, কোন কোন বুদ্ধিজীবি মনে করছেন যে, উপমহাদেশে বৃটিশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংগ্রাম—সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত। উদাহরণ হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর নেতৃস্থানীয় একটি সংবাদপত্রের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। "সংবাদ-প্রভাকর" (২০শে জুন ১৮৫৭) লেখে যে, "বাঙালী নাগরিকদের রাজভক্তি প্রশ্নাতীত"। তাহারা ইংল্যাণ্ডের রাণী ভারত সম্রাজ্ঞীর সর্বদা কল্যাণকামী, তাহারা কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করে যে, ভারতে বৃটিশ শাসন চিরস্থায়ী হোক।

২৯শে জুন ১৮৫৭ তারিখের বক্তব্য ঃ ভারতের যবনেরা এমনই অকাট মূর্খ যে, বিদ্রোহের সময় ভারত সরকারকে তাহারা কোন প্রকার কার্যকরী সহায়তা দেয়নি। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, তাহারা বিদ্রোহী। জ্ঞানীলোক মাত্রই বুঝবেন যে, ইহাদের মত অকৃতজ্ঞ আর মনুষ্য সমাজে

www.pathagar.com

কেহই নাই। ন্যায়পরায়ণ ও সদাশয় বৃটিশ সরকার সমুদয় ধর্মাবলম্বীর প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন। তাহার রাজদণ্ড শৃংখলার সহিত পরিচালিত হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বিদ্রোহের এলাকায় যবনেরা মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নিরাশ্রয় বৃটিশ নাগরিকদের হৃদয় বিদারক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছে (সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র ঃ বিজয় শেষ)-সংবাদ প্রভাকর। 'এই বক্তব্য আজ যত কর্ণকটুই মনে হয়—ঊনবিংশ শতাব্দীর নেতৃস্থানীয় এই পত্রিকার মতামত ছিল সাধারণভাবে উপমহাদেশের উচ্চ বর্ণের হিন্দুদেরই মতামত এবং আমরা জানি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত প্রখ্যাত "বুদ্ধিজীবী" তার পত্রিকার মারফত বাংলাদেশের তথা উপমহাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থেই প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কাজেই তার বক্তব্যকে ব্যক্তি বিশেষের মতামত বলে উপেক্ষা করার প্রশ্ন ওঠে না। আমরা তথা-কথিত সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তার রচিত নানা উপন্যাস যে সব মতামত ব্যক্ত করেছে সেগুলোকে যদি উপন্যাসের বক্তব্য বলে উপেক্ষাও করি, তা হলে তার রচিত "সিরিয়াস" গ্রন্থের বক্তব্য উপেক্ষা নাইবা করলাম। তিনি ধর্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "মুসলমানদের পর ইংরেজ রাজা হইল হিন্দু প্রজা তাহতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাই ইংরেজের হইয়া লড়িয়া—হিন্দুরা রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল। কেননা, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্ন জাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজও ইংরেজের অধীন ভারত বর্ষ অত্যন্ত প্রভু ভক্ত"।

আমরা এতক্ষণ উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের প্রতি দেশীয় হিন্দু সম্প্র-দায়ের যে অভিসন্ধি ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছি তা পুরনো সত্য এবং বহুল আলোচিত। তথাপি এই পুরনো কাসুন্দি ঘাটবার মত অপ্রিয় কাজটিতে আমরা নতুন করে কেন হাত দিয়েছি, সে সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই কিছু বলা দরকার। ১৯৭১-এ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীও তাদের প্রসাদজীবীরা এই রকম ধারণা প্রচারে খুবই মত্নবান হয়ে ওঠেন যে, উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষীয় হিন্দুর অবদান মুসলিম সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বেশী। '৭১-এর যুদ্ধে ভারতীয় কংগ্রেস সরকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে আওয়ামী-লীগকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিলো এবং এই সাহায্যের বিনিময়ে

www.pathagar.com

তারা এদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে ধন-সম্পদ, অস্ত্র, গোলা-বারুদ, সাজ, সরঞ্জাম, এমনকি কলকারখানা অফিস ও গৃহে ব্যবহৃত আসবাবপত্র লুণ্ঠন করতে মোটেই ত্রুটি করেনি। তথাপি আমাদের শাসকদের কৃতজ্ঞ হৃদয়, শুধু এই টুকুতে তৃপ্তি লাভ করতে পারেনি। তারা ভারতীয় কংগ্রেস শাসকদের হাত থেকে যা লাভ করেছিলো তার প্রতিদানে মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন পরিত্যাগ করেও তাদের কোন কুণ্ঠা ছিল না। তারা ভারতের "হিন্দু" কংগ্রেসের পদতলে অর্ঘ্য দিয়েছিলো উপমহাদেশের দুই শ'বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। হায়, আত্মবিস্মৃতির তমসার মাঝে হারিয়ে যাবার আনন্দ কি গভীর !

বাংলাদেশ হবার পর অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, 'মুসলমান' এই শব্দ-টাই হয়ে দাঁড়ালো প্রতিক্রিয়াশীল। আর খুব সামান্য এক-আধটা ব্যাতিক্রমের ঘটনা বাদে আমাদের দেশের কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকরা সব রকম প্রতিক্রিয়াশীলতা ত্যাগ করে রাতারাতি 'প্রগতিশীল' হয়ে উঠলেন। পলাশীর সেই ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর এক'শ বা দেড়'শ বছর ধরে ভারতীয় "উচ্চ" বর্ণের হিন্দুরা উপমহাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছিলো, তার সমুদয় অগৌরব ও লজ্জা মুচতে নয়টা মাসও সময় লাগলো না। বৃটিশ উপনিবেশ-বাদের একদা কলাবরেটর ভারতীয় হিন্দু কংগ্রেস স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীকে পরিণত হলো। আর মুসলমান শব্দটার তাৎপর্য দাঁড়ালো, স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈরী। পৃথিবীর কোন দেশে বা কোন যুগে ইতি-হাস বিকৃতির এমন মর্মন্তুদ ঘটনা বোধকরি আর ঘটতে দেখা যায়নি।

সত্তরের দশকে যে সব মুসলমান ছেলেরা কৈশোর উত্তীর্ন হয়ে যৌবনে পা দিয়েছে এবং এখন যারা পূর্ণ যুবক এদের মুখে যখন শুনি মুসল-মানরা কি পারে, একমাত্র পেয়াজ আর গরুর গোস্ত খাওয়া ছাড়া মুসলমানরা কি করতে পারে। তখন মনের বেদনা রাখার সত্যই জায়গা থাকে না। "মূর্খ মুসলমান নয়"। তখন ঐতিহাসিক না হয়েও—ইতি-হাস বিষয় কথা বলবার যোগ্যতা নেই জেনেও ইতিহাসের সেই বিস্মৃতি পাতাগুলো সামনে মেলে ধরতে ইচ্ছে করে, ছেলে-মেয়েদের অজ্ঞতা দূর করার নিমিত্ত বলতে ইচ্ছে করে, দেখ, মুসলমানরা ইতিহাস খুঁজতে ইরান-তুরান যাবারও দরকার নেই, এই দেশেই আছে বীরত্বপূর্ণ আত্ম-

www.pathagar.com

ত্যাগের অজস্র ঘটনা। আমি জানি, আমাদের ছেলেরা নিশ্চয় শহীদ তিতুমীরের অতিশয় তুচ্ছ এক বাঁশের কেল্লা সাশ্রয় করে বৃটিশ গোলন্দাজ ও হিন্দু জমিদারদের সংঘবদ্ধ বাহিনীর সংগে প্রতিরোধ যুদ্ধে তার অমিত বিক্রম ও বীরত্বপূর্ণ আত্ম-ত্যাগের ইতিহাস শুনেছে, কিন্তু আমার অনুমান সেই অসম যুদ্ধে এ দেশের বর্ণ হিন্দুদের বিশ্বাসঘাতকতার মর্মান্তিক কাহিনী তারা শোনেনি।

বর্তমান নিবন্ধের স্বল্প পরিসর আয়তনে সেই ইতিহাস অনুপুঙ্খ বর্ণনা করা সম্ভব নয় বলেই আমি পলাশীর বিপর্যয়ের পর থেকে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত উপমহাদেশের ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের ভূমিকা ও তার বিপরীতে এদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ সংগ্রামের ঘটনা উল্লেখ করবো। আমি আগেই বলেছি, উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায় বৃটিশ বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করে পলাশীর বিপর্যয়ের অব্যবহিত পর থেকে অন্যপক্ষে হিন্দুরা বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম শুরু করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর থেকে। ১৭৬১ সালে অর্থাৎ পলাশীর বিপর্যয়ের মাত্র চার বৎসর পর মজনু শাহের নেতৃত্বে প্রথম একদল ফকির বর্ধমান ও সঙ্গত খোলার মধ্যবর্তী নদীর তীরে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে এক সাংঘাতিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এরপর ১৭৬৪ সালে পদচ্যুত নবাব মীর কাশিমের পক্ষে ফকিরদের এক বিরাট বাহিনী বকসারে মিলিত হয়। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সর্বাধিক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেন ফকির নেতা মজনুশাহ। এই ফকির নেতার জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে দেশী-বিদেশী ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা রকম বিতর্ক আছে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, সংসার ত্যাগী স্বাধীনতাকামী এই মানুষটির কোন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা ছিল না। মজনুশাহর আসল নাম কি তাও জানা যায়নি। তবে সমকালীন সরকারী নথিপত্রে 'মজনু' নামেই তিনি পরিচিত এবং তার জন্মভূমি আলোয়ার অন্তর্গত মেওয়াতে। রংপুরে ১৭৮৭ সালের মার্চ মাসে এই মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। তিনি ভ্রমণ-ব্যপদেশে বিরাট একদল অনুচরসহ বাংলাদেশে আসেন এবং দেশের কৃষক-শ্রমিক জনসাধারণের উপর বৃটিশ-হিন্দু শাসকদের উৎপীড়ন দেখে বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

১৭৭০-৭১ এ বাংলাদেশে এক সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাংলাদেশে এক তৃতীয়াংশ মানুষ এই মন্বন্তরে প্রাণ ত্যাগ করে। অথচ বৃটিশ

www.pathagar.com

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই দুর্ভিক্ষের বছরে তুলনামূলকভাবে বেশী রাজস্ব আদায় করে। মীর কাশেম আলীর পতনের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। দেওয়ানী লাভ করার পর তারা ভূমি রাজস্ব আদায়ের এক নতুন নিয়ম চালু করে সামগ্রিকভাবে মুসলিম অভিজাত শ্রেণী ও দুই-একজন হিন্দু জমিদার এই ব্যবস্থার শিকারে পরিণত হয়। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিযুক্ত হিন্দু এজেন্টরা অমানুষিক পীড়ন ও বর্বরতার সঙ্গে কর আদায় করতো।

অযোদ্ধা ও মহীশূরের পতনের পর স্থানীয় রাজন্যবর্গ বৃটিশ রাজের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে। কিন্তু মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী দৃঢ় মনোভাব দানা বেঁধে উঠতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে বৃটিশ বিরোধী মুসলিম গণ-জাগরণ শুরু হয়। সৈয়দ আহম্মদ ছিলেন শাহ ওয়াহি-উল্লাহর দেহলবীর পুত্র শাহ আবদুল আজিজের শিষ্য। সৈয়দ আহম্মদ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর 'স্বাধীন ভারতে মুক্ত ইসলাম" এই আদর্শে অনু-প্রাণীত হন। তিনি উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়কে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য সংগঠিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ সময় হিন্দু ও শিখদের মধ্যে নানা সাহেব ও ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাই ব্যাতীত সবাই কম বেশী বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। কাজেই সৈয়দ আহম্মদের পক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য একমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পন্ন হবার আগেই তিনি হঠাৎ খবর পান যে, রনজিৎ সিংহের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে শিখেরা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করেছে। এ খবর পাবার পর তাঁর পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব হয় না। তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হন এবং শিখদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সৈয়দ আহম্মদ সারা ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই সমর্থন লাভ করেছিলেন। এমনকি সুদূর বাংলাদেশ থেকেও হাজার হাজার দলে দলে মুসলমানরা সৈয়দ আহম্মদের মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেন; ইতিহাসে সৈয়দ আহম্মদের এই আন্দোলনকে মুজাহিদ আন্দোলন বলে অভিহিত করা হয়। অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ একে ওয়া-হাবি আন্দোলন বলেও উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈয়দ আহম্মদকে পরাস্ত করা অসম্ভব বুঝে শিখেরা দুর্নীতি ও উৎকোচ প্রদানের পথ গ্রহণ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কতিপয় মুনাফেক মুসলিম গোত্রকে

www.pathagar.com

অর্থ প্রদানে বশীভূত করে সৈয়দ আহম্মদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রলুব্ধ করা হয়। সৈয়দ আহম্মদ তাঁর মুজাহিদ বাহিনীর প্রতি তাকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে তিনি একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তিনি অপ্রস্তুত অবস্থায় শিখ বাহিনী কর্তৃক বালাকোট নামক স্থানে আকস্মিকভাবে অবরুদ্ধ হন এবং শিখ বাহিনীর বিরুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে শাহাদাৎ বরণ করেন। এই যুদ্ধে তাঁর অধিকাংশ অনুসারীরা শহীদ হন। সৈয়দ আহম্মদের শাহাদাৎ বরণের সংবাদ বারুদের মত উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যরা এ সময় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বাংলাদেশ ও রোহিলা খণ্ডের মুজাহিদরা পাহাড়ের পাদদেশে সিমলা নামক একটি গ্রামে সংগঠিত হয় এবং এখান থেকেই বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর-ব্যাপী তাঁরা সশস্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যান।

এই সঙ্গে চাপাতি মুভমেন্ট, খান বাহাদুর খানের প্রতিরোধ, মৌলভী মুভমেন্ট চলতে থাকে। এই প্রতিরোধ বাংলাদেশ থেকে ভারতের উত্তর পর্যন্ত চলতে থাকে এবং এই সব বৃটিশ প্রতিরোধ মুসলমানরাই চালিয়েযায়।

উপমহাদেশের বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাসে আরও একজন যোদ্ধার নাম অমর হয়ে আছে। তিনি নেসার আলী ওরফে তিতুমীর। সৈয়দ আহম্মদ বেরেলভীর সঙ্গে মক্কায় তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং সেখান থেকেই তিনি বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভীকে যেমন বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম শুরু করার আগে মুসলমানদের উপর শিখদের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়, তীতুমীরকেও মুসলমান কৃষকদের উপর হিন্দু জমিদারদের অমানুষিক নির্যাতন ও পীড়নের প্রতিবাদে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করতে হয়।

এই যুগে মুসলমান প্রজারা দাঁড়ি রাখলে দাঁড়ির খাজনা, মসজিদের জন্য আলাদা খাজনা, ধর্মীয় উৎসবে সেলামী প্রভৃতি দিতে বাধ্য হতো। মুসলমানরা পাকা বাড়ী তৈয়ার করার পূর্বে হিন্দু জমিদারদের হুকুম নিতে হতো। জ্বালানির জন্য নিজের গাছ কাটতে হলে জমিদারদের হুকুম চাইলে হুকুম দেওয়া হতো অর্ধেক কাঠ জমিদারদের বাড়ী পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকারে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে হিন্দু জমিদাররা তিতুমীরকে ধ্বংস করার জন্য বৃটিশ শাসকদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠায়। ২৪ পরগনার কালেক্টর তিতুমীরকে দমন ও বন্দী করার জন্য ক্যালকাটা মিলিশিয়া প্রেরণ করে; কিন্তু তিতুমীরের সংগে সংগ্রামে ক্যালকাটা মিলিশিয়া পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে যায়। এ খবর কলকাতায় পৌঁছবার পর অধিকতর শক্তিশালী একটি বাহিনী প্রেরিত হয় তিতুমীরকে দমনের জন্য। এই যুদ্ধে তিতুমীর ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অধিকাংশ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদাতবরণ করেন।

www.pathagar.com

একই সময় নিম্নবঙ্গে ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহর নেতৃত্বে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়। ইতিহাসে এই সংগ্রামের নাম ফারাজী আন্দোলন। বৃটিশ অধিকৃত ভারত বর্ষকে হাজী শরীয়তুল্লাহ "দারুল হরব" বলে ঘোষণা করেন। বৃটিশ শাসকরা অবশ্য দেশীয় মোনাফেক "উলেমাদের" একটা অংশের কাছ থেকে ফারাজী আন্দোলনের বিরুদ্ধে "ফতওয়া" সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর মুজাহিদ আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ফারাজী আন্দোলনের যোগসূত্র রচিত হয় এবং মুজাহিদ আন্দোলনের পাটনা কেন্দ্রে এক সময় হাজী শরীয়তুল্লাহর অর্থ ও জনসাহায্য শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্বশেষ সশস্ত্র সংগ্রামের মুখোমুখী হতে হয় ১৮৫৭ সালে। ইতিহাসে এই যুদ্ধকে সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। পাঞ্জাবী, বেলুচী, পাঠান সিপাহীরা বাদে মুসলমানদের সঙ্গে ভারতীয় সিপাহীর প্রায় অনেকেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু নানা কারণে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ কোন সেন্ট্রাল কমাণ্ড গঠন না করেই কাজ আরম্ভ করা হয়েছিলো। এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরে উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের উপর বৃটিশ-হিন্দু যৌথ নির্যাতন সর্বকালের সীমা অতিক্রম করে। সিপাহী বিদ্রোহের এক পর্যায়ে রোহিলা খণ্ডের খান বাহাদুর খান, সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলেভীর, মুজাহিদ বাহিনীর ধ্বংসাবশেষ ও পূর্ব বঙ্গের ফারাজী যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গাজী বাহিনী গঠন করেন। এই গাজী বাহিনী বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিটি সম্মুখ যুদ্ধে আমৃত্য লড়াই করেছেন। বৃটিশ বাহিনী একজন 'গাজী' সৈনিককেও জীবিতাবস্থায় বন্দী করতে সমর্থ হয়নি। মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের তুলনায় (১৭৫৭---১৯৪৭) হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী ক্ষুদিরামের ফাঁসি' আলীপুরের বোম কেস বা কয়েকটা নেহেরুর জেলকেস অত্যন্ত নগন্য।

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে বৃটিশ শাসকদের অমানুষিক বর্বরতার হিংস্রতম ঘটনাটি ঘটে ঢাকায়। পূর্বাঞ্চলের সিপাহীরা গোপনে ঢাকায় লালবাগে মিলিত হবার সংকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু জনৈক বিশ্বাসঘাতক চামড়া ব্যবসায়ী খবরটি জানতে পেরে বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে তা ফাঁস করে দেয়। বিদ্রোহের সর্বশেষ প্রচেষ্টাকে সমূলে ধ্বংশ করার সমুদয় আয়োজন সম্পন্ন করা হয়। তারা গোপনে ঢাকায় এক বিরাট বাহিনীর সমাবেশ করে এবং আকস্মিক আক্রমণে অধিকাংশ সিপাহীকে হত্যা করে এবং অবশিষ্টদের বন্দী করে। এই ঘটনায় ৬০ জন মুসলিম সিপাহী বন্দী হয় এবং তাঁদের জীবিত অবস্থায় গাছের ডালের সঙ্গে গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে যেখানে শহীদ পার্ক (ভিক্টোরিয়া পার্ক) হয়েছে এইখানে গাছের ডালে এই ৬০ জন মুক্তিযোদ্ধার মৃতদেহ এক মাসকাল ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

www.pathagar.com

এরপর ১৮৭২ সালের অস্ত্র আইন পাশ করে উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র রাখা হয় এবং অতঃপর বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত শতবর্ষেরও অধিককালব্যাপী সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের অবসান ঘটে। এর পর মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সঙ্গত কারণেই ভিন্নরূপ গ্রহণ করে।

এখানে সেখানে দু'একটা হিংসাত্মক ঘটনা ছাড়া মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হতে থাকে। দীর্ঘকাল পরে ১৯২২ সালে মালাবারে "মাপালা" মুসলমান সম্প্রদায় বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে আর একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করে। মাপালাদের দমনের জন্য বৃটিশ সরকারকে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী সমাবেশও নিয়োগ করতে হয়। এই শক্তিশালী ত্রিমুখী আক্রমণের মুখে মাপালারা বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। হাজার হাজার মাপালা মুক্তি যোদ্ধা এই যুদ্ধে নিহত হওয়া ছাড়াও বৃটিশ বাহিনীর হাতে বন্দী হয় প্রায় ২০ হাজার মাপালা। এদের কিছু কিছু বিচার করে প্রায় কয়েক হাজারকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয় এবং অনেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

দখলদার বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের মুসলমানদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত হলো এই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের তরুণ বংশধরেরা অনেকেই আমাদের পূর্ব পুরুষদের দীর্ঘকালব্যাপী এসব বীরোচিত সংগ্রাম কাহিনী জানে না বা শেখান হয়নি। ইতিহাসে মুসলিম সম্প্রদায়ের বীরোচিত প্রতিরোধ সংগ্রামের উপর যতটা আলোকপাত করা না হয়েছে তার তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের হিন্দু সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উপর। হিন্দু মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে পরিচালিত এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশেষ ভূমিকা ছিল না। কাজেই অস্পষ্টভাবে হলেও এ রকম একটা ধারণা প্রায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের তেমন কোন অবদান নেই। পরিহাস আর কাকে বলে!

গ্রন্থপঞ্জী:

১। ইন্টিগ্রেশন—আবুল হাশিম (১৯৭৬)
২। পাকিস্তানের ইতিহাস—আই. এইচ. কোরেশী।
৩। সংস্কৃতি—ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান।
৪। দৈনিক কিষাণ—১-৭-১৯৮২ ইং।

www.pathagar.com

কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব এবং এর বাস্তবতা

বিগত ২৫শে ডিসেম্বর ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ১০৬ তম জন্ম দিবস। এই দিবসটি আদর্শগত কিছু ভক্ত ও অনুসারীরা যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করেছেন। এই দিবসটি উদ্‌যাপনের আগে প্রবক্তরা মরহুম জিন্নাহ্‌ সাহেবের ছবি সম্বলিত কিছু প্রচারপত্র বিলি করেন। প্রচার পত্রে দেশবাসীর প্রতি নিজেদের অস্তিত্বের খাতিরে মহান নেতার আদর্শের অনুসরণে মুসলিম জনমণ্ডলীর নৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানানো হয়।

কিন্তু এই আহ্‌বান ঢাকার বংশাল থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিকের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি এবং "গরীব ও সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলার একমাত্র পত্রিকা" বলে দাবীদার একটি সাপ্তাহিকেরও সহ্য হয়নি। এই দু'টি পত্রিকা মরহুম কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র জন্ম দিবস পালনকে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থান হিসাবে বিবেচনা করে গায়ের ঝাল মেটানোর কোন উপায় না পেয়ে-মাছ না পেয়ে ছিপে কামড় মেরেছেন এবং অবশেষে দেউলিয়া রাজনীতির যা স্বভাব—ইতিহাস বিকৃত করে দেশবাসীর কাছে এক মন গড়া কাল্পনিক ইতিহাস বয়ান করে মরহুম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌কে বাংলাদেশের শত্রুরূপে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস পেয়েছেন। তাদের আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু হোল দ্বি-জাতি তত্ত্ব। এই উপমহাদেশে আজকের দিনে দ্বি-জাতি তত্ত্ব সঠিক না বেঠিক সে প্রশ্ন নিশ্চয় অবান্তর, তবে ভারতবর্ষে দ্বি-জাতি তত্ত্ব একদা আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী মুসলিম জনগোষ্ঠীর দ্বারা দারুনভাবে সমর্থিত হয়েছিল। এবং সবচেয়ে বড় কথা বাংলাদেশের মুসলিম জনসাধারণ ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিমলীগকে বিপুল (৯৭%) ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত করে মুসলিম লীগ প্রবর্তিত আদর্শ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ঐতিহাসিক সঠিকতা প্রমাণ করেছিল। মিছে নয় যে, দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই বৃটিশ শাষিত ভারত বিভক্ত হয়ে বৃটিশ ভারতীয় মুসলমানদের আবাস-

www.pathagar.com

কিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সেই দিনের সংগ্রামে অন্যান্যের সংগে একদা বাঙালী জাতির (মরহুম) মুজিবুর রহমানও সংযুক্ত ছিলেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও পালন করেছিলেন।

আজ যারা দ্বি-জাতি তত্ত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করে ইতিহাসের আবর্জনা স্তূপে নিক্ষেপ করার স্পর্ধা দেখাচ্ছেন তাদের পূর্ব পুরুষেরা যদি দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার স্বীকৃতিটুকু অর্জন করতে না পারতেন তা হলে এই উপমহাদেশের অনেকেই জোয়াল কাঁধে দুই গরুর পেছনে আর এক গরু হয়ে বাপ-ভেয়েদের ভাগী জমি খুঁড়ে খুঁড়ে জীবন পাত করতে হতো। সংবাদ পত্রের পাতায় কলাম লিখে বুদ্ধিজীবি হওয়ার দুঃস্বপ্ন আর কোন কালেই দেখতে হতো না। বস্তুতঃ দ্বি-জাতি তত্ত্বকে আজ যারা বলিবাদের মত 'লাল গামছা' দেখছেন তাদের কাছে বৃটিশ ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা নিশ্চয়ই রুচিকর হবে না। তবে সত্য যে, উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে যারা ভিস্তিওয়ালা, কাঠুরিয়া, কোচম্যানের জাতি হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত এবং আগ্রহী তাদের প্রসাদজীবীদের গাত্রদাহে বিচলিত হওয়া কোন দেশপ্রেমিক মুসলমানের সাজে না। আজ সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির বাইরে "সর্বজনগণ'-এর তথাকথিত বৃহত্তর ক্ষেত্রে দ্বি-জাতিতত্ত্ব হয়তো একটা পশ্চাদপদ চিন্তা। তবে উপমহাদেশের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য বস্তুতঃ আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়স্বরূপ সেদিন যদি দ্বি-জাতিতত্ত্বের উদ্ভাবন সম্ভব না হতো তা হলে বাংলাদেশের বর্তমান ভৌগোলিক পাকা কাঠামোর আওতায় (পূঃ) পাকিস্তানের ভৌগোলিক রেখা, বাংলাদেশের অস্থিত্ব কি সম্ভব হতো? "গরীব ও সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলার একমাত্র পত্রিকাটি" কিন্তু সেই বালখিল্য দাবীটিই করেছেন। খুব সামান্যতম ইতিহাস বোধ থাকলে এই দাবিটি তারা করতেন না তা' বলাই বাহুল্য। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর তথাকথিত সর্বজনগণের সেকুলার রাষ্ট্র ভারতে কয়েক হাজার বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ার অনপনেয় কলংকের কথা যদি আমরা স্মরণ নাও করি তা হলেও একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, দ্বি-জাতি তত্ত্ব ভিত্তিতে একদা প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলার (পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান) আঞ্চলিক সীমারেখার আওতায় যে রাষ্ট্র বাংলাদেশের উদ্ভব হয়েছে তার প্রতি ইঞ্চি ভূখণ্ডের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য দেশের শতকরা ১০০ ভাগ মুসলমান জীবন বাজী রাখতে

www.pathagar.com

রাজী। কিন্তু যারা কথায় কথায় এদেশে আফগান ষ্টাইলে বিপ্লব ঘটানোর দুঃস্বপ্ন দেখে তারা কি এই অতি সহজে ও স্বাভাবিক দেশপ্রেমিকতার মনটুকু উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন?

দ্বি-জাতিতত্ত্ব বিরোধী মহোদয়েরা জিন্নাহ্ সাহেবকে বৃটিশ উপনিবেশ বাদের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু মরহুম মহান জিন্নাহ্ তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে একটি বারও বৃটিশ রাজকে উপমহাদেশের জন্য আশীর্বাদ বলে উল্লেখ করেননি যা ভারতের শাসক কংগ্রেস (কবি, সাহিত্যিক) ও হিন্দু মহাসভার অনেক গণ্যমান্য নেতাই একাধিকবার করেছেন। দ্বি-জাতিতত্ত্ব বিরোধীরা নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পাশাপাশি ভারতীয় কংগ্রেসকে যে ধোয়া তুলসী পাতা দেখেন সেটা নিছক ইতিহাস জ্ঞানের অভাব থেকে হয়নি, এর পশ্চাতে নিশ্চয় একটা রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি কাজ করে, না হলে যে ভারতীয় কংগ্রেস আদিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৃটিশ আমলা শাসকদের দ্বারা এবং প্রথম দিকের পর পর পাঁচজন সভাপতি মনোনীত হয়েছিল অভারতীয় ইংরেজ; সেই কংগ্রেসের সংগে মুসলিম লীগের দেশ প্রেমিকতার কোন তুলনা হয়? ভারতীয় বৃটিশ উপনিবেশবাদের অ-আ ক-খ জানেন এমন যে কোন ব্যক্তির কাছে এটা পানির মত পরিষ্কার।

মরহুম কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বৃটিশ উপনিবেশবাদের দালাল ছিলেন এর ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অথচ ভারতের অনেক হিন্দু 'মহান' ব্যক্তিই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতের বৃটিশ রাজ্যকে আলোকবর্তিকা বলে অভিহিত করে বক্তৃতায়, কবিতায়, গানে বিভিন্ন সময় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন তার বহু নজীর ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। এও লিপিবদ্ধ আছে ১৭৬৩—১৯৪৭ সাল অবধি মুসলমানরাই বৃটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জানমাল দিয়ে লড়ে এসেছে। আমি পেশাদার সাংবাদিক নই রাজনীতি করাও আমার ব্যসন নয়, তথাপি সাংবাদিকতার আদর্শে বিশ্বাস রাখি বলেই ভারতীয় ইতিহাসের সেই অতীত পাঁক আমি ঘাটতে চাইনে, যে কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইতিহাসের পাতা খুললেই দেখতে পাবেন ভারতের বর্তমান শাসক কংগ্রেস যারা "সর্বজনগণ"-এর রাষ্ট্রতত্ত্বে বিশ্বাস করে বলে প্রচারিত আছে সেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা তৎকালীন শাসক ইংরেজদের কাছ থেকে ভারতীয় মুৎসুদ্দি শ্রেণীর অর্থনৈতিক দর কষা-

www.pathagar.com

কষির প্রয়োজনেই বৃটিশ প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের সংগে একদিন শামিল হয়েছিল। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো ভারতের অবহেলিত ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিষ্পেষিত মুসলিম জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, পাকিস্তানকে সমূলে ধ্বংশ করার জন্য তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস নেতারা এ দেশের মুনাফেকদের সাহায্যে যে অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার কাড়ি কাড়ি প্রমাণ সমসাময়িক ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ আছে। এখন সাবেক পাকিস্তানের পূর্বাংশে যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেই বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংশ করার জন্য ভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের অপচেষ্টারও কোন বিরাম নেই। আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানি প্রবাহকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য তারা ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করেছে অথচ প্রায় তিন যুগ ধরে ফারাক্কা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে শত শত বৈঠকে মিলিত হয়েও দু'দেশের নেতারা এর একটা সহজ ও গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করতে পারেনি।

মরহুম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র দ্বি-জাতি তত্ত্ব কংগ্রেস নেতৃত্বের মানসিকতার প্রেক্ষিতে যে এখনও সঠিক, সমসাময়িক ইতিহাসই তার প্রমাণ। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই যে, দ্বি-জাতিতত্ত্ব একটি প্রগতি-বিরোধী পশ্চাদপদ চিন্তা তা হলে প্রথমেই যে প্রশ্নটা সামনে এসে দাঁড়ায় তা হলে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের ব্যাখ্যা তবে পাওয়া যাবে কোথায়? বাংলা ভাষাভাষী জনগণের যে অংশটি পশ্চিম বাংলায় বাস করে তারাই বা ভারতের অনুগত নাগরিক হিসেবে পশ্চিম বাংলা নামক অঙ্গরাজ্যে বাস করে কিভাবে?

মহান নেতা মরহুম জিন্নাহ দ্বি-জাতিতত্ত্বের মৌলিক উদ্ভাবক নন। এটা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের একটা বিদ্যমান বাস্তবতা। তিনি এই বাস্তবতার ভিত্তিতে এই উপমহাদেশের শোষিত নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র আবাস-ভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য যে সাফল্যজনক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন ইতিহাসে তারমূল্য কোনদিন মুছে যাবেনা এবং ভারতের শাসক কংগ্রেসের অর্থনীতি ও কখনও কখনও রাজনৈতিক সম্প্রসারনবাদী আকাঙ্খা যতদিন বলবৎ থাকবে উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য দ্বি-জাতিতত্ত্ব ততদিনই বিদ্যমান থাকবে একটি রক্ষা কবচ হয়ে এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের কাছে আত্ম বিক্রয়কারী মহোদয়দের তুমুল চেঁচামেঁচি সত্ত্বেও তা' থাকবে।

১২/০১/১৯৮৩ ইং

www.pathagar.com

সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে এস মুজিবউল্লাহ সাহেবের বলিষ্ঠ মতবাদের আত্মপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর নব প্রকাশিত 'বিতণ্ডা' বইটিতে।

'বিতণ্ডা' নামকরণই আমাকে আকৃষ্ট করে বইটি উল্টে পাল্টে দেখতে। তারপর বইটি পড়তে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে লেখকের অনুভূতির গভীরতা এবং প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতা আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে।

.....আন্তরিকভাবে আশা পোষণ করি যে, জনাব সৈয়দ মুজিবউল্লাহর 'বিতণ্ডা' বইখানি এ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের, বিশেষভাবে সুস্থ বুদ্ধি-সম্পন্ন তরুণ সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অধিকতর সচেতন করে তুলবে।..... ..

দৈনিক ইত্তেফাক

BITANDA or Wordy Duel written by S. Mujibullah a collection of essays on various aspects of the life of the people of Bangladesh . . . . In short the writer with his characteristic sympathy and seriousness had dealt with all the phases of lives of the nine crore people who have been dismally drifting away, towards a bottomless abyss. The writer has dealt deeply to find out causes of our frustrations and failures. He has discovered much to his apparent anguish in all segments of life a deepseated ego and utter selfishness, eating into the vitals of our once truly great nation.....

The Bangladesh Observer